কর্ণেল টডের রাজস্থান বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ, নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। কালে আর জলে ধুয়ে এর মহিমা আজও অম্লান। রাজা কনকসেন থেকে শুরু করে রাণা ভীমসিংহ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের আবর্তে অনেক উত্থান পতন অনেক পট পরিবর্তন ঘটেছে। ঘরে বাইরে কত দ্বন্দ্ব, কত হানাহানি, কত রক্তপাত, রাজ্যলিপ্সা। হীন চক্রান্ত, নারী-মাংসের জন্যে দাপাদাপি, নীচুতা, ঈর্ষা, মোহ, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা আর ক্ষমতার বড়াই সমগ্র জাতিকে ধাপে ধাপে রসাতলে তলিয়ে দিয়েছে। অনেক ধর্মপ্রাণ, উদারহৃদয় ব্যক্তির ছোঁয়াও পেয়েছে রাজস্থান। অন্যের সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের পুত্রকে বলি দিয়েছে মা। সতীধর্মের পবিত্রতা বাঁচাতে গিয়ে হাসিমুখে হাজার হাজার কুলনারী জহরব্রত করেছে। পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্যে ছোটভাইএর হাতে রাজ্য তুলে দিতে এতটুকু কুণ্ঠা জাগেনি দাদার। মাতৃভূমির আহ্বানে প্রতিটি রাজপুত ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর। হাত বাড়ালেই রাজসুখ, কিন্তু মাতৃভূমিকে সঁপে দিতে হয় অন্যের হাতে! ঘাসের রুটি খেয়ে আর ঘাসের শয্যায় শুয়ে বছরের পর বছর কাটাতে হয়েছে রাজ-পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতাকে।

এত ত্যাগ, এত নিষ্ঠা-সাধনা, এত পুণ্যের কি কোন সুফল নেই! অদৃষ্টবাদীরা বলবেন, পাপের বোঝা দিনকে দিন এত ভারি হয়ে উঠেছিল যে সব সঞ্চিত সুফল তাতে চাপা পড়ে মারা গেছে।

কবি বলেছেন, 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান'।

ইতিহাসও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে। আজকের ঘটনা কাল ইতিহাস হয়। আজ যা ঘটছে গতকাল তা ঘটেনি, আবার আগামী কাল যা ঘটবে তার সঙ্গে আজকের বা গতকালের ঘটনার কোন সাদৃশ নেই।

আজ যে ঘটনার মধ্যে আমি জর্জরিত হচ্ছি আগামী কাল তা আমি মনে রাখিনা—রাখতে পারিনা। ঐতিহাসিক সযত্নে নোট রাখে। অনেক দিন বাদে, আমারই জীবনের সেই অতীত কাহিনী শুনিয়ে সে আমাকে মুগ্ধ করে। আমার বা আমার পূর্ব পুরুষদের জটিল জীবনের সংকট মুহূর্ত-গুলো আজ আর আমাকে উৎকণ্ঠিত করে না, রসের ভিয়েন জোগায়।

মিবার

১

ভারতের আর্যরাজাদের বংশধররা রাজপুত্র নামে পরিচিত। রাজপুত নাম রাজপুত্রের অপভ্রংশ। এই রাজপুতরা যে দেশের অধিবাসী তারই নাম রাজস্থান। চলতি কথায় আমরা তাকে রাজবারা বা রায়থান বলে থাকি। ইংরেজীতে রাজস্থানকে রাজপুতানা বলা হয়।

রাজস্থানের পুরোনো সীমা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। উত্তরে শতদ্রু নদের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলময় মরু, পূর্বে বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে সিন্ধু নদ, এই হল এখানকার রাজস্থানের সীমানা।

পুরাণে আর্যরাজাদের যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তার প্রায় সবটাই কল্পনাপ্রসূত। কোন সময়ে কোন জায়গা থেকে রাজপুতরা রাজস্থানে নিজেদের বংশ বিস্তার করেছিল পৌরাণিক কাহিনী থেকে তা আর অনুমান করা সম্ভব না।

প্রাচীন কাহিনী থেকে জানা যায়, পৃথিবীর প্রায় সব জাতই সুমেরু বা তার কাছাকাছি কোন অঞ্চলকে তাদের আদিবাস দাবি করে। সূর্য ও চন্দ্রবংশধররাও ঐ সুমেরু শিখরকেই তাদের আদি বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছে। এক সময় বৈবস্বত মনুর বংশধররা সুমেরু থেকে নেমে এসে আর্যাবর্তে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। প্রথমে সূর্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকু কোশল রাজ্যে এসে সরযুর উপকূলে অযোধ্যা প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের আগে অযোধ্যার মত সমৃদ্ধ নগর ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না।

সে আমলের ধর্মনীতি, বংশানুক্রম এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায়, হিন্দু, চৈন, তাতার ও মোগল একই বংশের শাখা-প্রশাখা মাত্র। তাতারদের গোত্রপতির নাম মোগল। তার পুত্র অগ্‌জই মোগলদের আদি পুরুষ। অগ্‌জের ছটি পুত্র। তার মধ্যে প্রথম কায়ন ও

দ্বিতীয় পুত্র আয়ু। অগ্‌জের ছটি পুত্র থেকে ছটি তাতার রাজবংশের উৎপত্তি হয়েছে।

তাতাররা আয়ুকেই গোত্রপতি বলে জানে। আয়ুর পুত্র জুলদাস। জুলদাসের পুত্রের নাম 'হয়'। মহাভারতে চন্দ্র বংশের বিবরণে যে হৈহয়ের নাম পাওয়া যায়, সেই হৈহয় ও হয় যে একই ব্যক্তি তা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই হয় থেকে প্রথম চীন রাজবংশের সৃষ্টি হয়েছিল।

তাতার গোত্রপতি আয়ুর নবম বংশধর এলাখা। তার দুইপুত্র কৈয়ান ও নাগস্। কালে এদের বংশধররাই সারা তাতার প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পুরাণে আছে, নাগ এবং তক্ষক জাতের প্রতিষ্ঠাতা এই নাগস্‌ই।

পুরাণে একথাও আছে, বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা একদিন উদ্যানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় বুধ তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই উদ্যানেই তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে। বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে যে সন্তান জন্মে তার থেকেই চন্দ্রবংশের উৎপত্তি।

চীনরাজা যুর [আয়ুর] জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও এই ধরনের এক কিংবদন্তী আছে। একদিন কোন এক গ্রহ [বুধ বা ফো] ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বল প্রয়োগ করে তার সঙ্গে উপগত হয়। তারই ফলে যুর জন্ম। চীনকে নয় ভাগে বিভক্ত করে খৃষ্টের ২২০৭ বৎসর আগে য়ু রাজত্ব করেছিল। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, তাতারদের আয়ু, চৈন য়ু ও পৌরাণিক আয়ু এই তিন একই ব্যক্তি।

সেকালে স্কাণ্ডিনেভিয় ও জার্মানরাও যে বুধদেবের ধর্মনীতি অনুসরণ করত তার প্রমাণ মেলে। আর্যরা আর্যাবর্তে এসে উপনিবেশ গড়ে তোলার পর এই বুধধর্ম নানা স্থানে প্রচার করেছিল। কিন্তু পরে শক্তি-উপাসক সূর্যবংশের দাপটে ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় এধর্ম।

শক জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণ এবং আবুলগাজি যা বলেছে ডয়া-ডেরাসেরও প্রায় সেই মত। তার বিশ্বাস, আরক্ষেশতীরেই [পৌরাণিক মতে আর-ব্রহ্ম] শকরা বাস করত। অর্দ্ধেক মানবী এবং অর্দ্ধেক সর্পরূপিণী কোন এক ভূকুমারী ও জুপিটারের সহবাসে সীথেশ নামে এক পুত্র জন্মে।

এই সীথেশের নাম থেকেই নাম করণ হয়েছে এ বংশের। পুরাণেও আছে, শাকদীপবাসীরা বুধের ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। ভুজঙ্গ বুধের প্রতিকৃতি। এই জন্যেই তাদের কুলজননীর অর্দ্ধাঙ্গে বুধের দেহ যুক্ত করে ইলা ও বুধ থেকে তাদের বংশের উৎপত্তি প্রমাণ করেছে।

সীথেশের ছুই পুত্র। পলাশ ও নপাশ। মিশর দেশের নীল নদের প্রান্ত থেকে পূর্বমহাসাগর পর্যন্ত এদের বংশ বহুশাখায় ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে মসমাজিতা, শাকণ ও অরি অশ্বীয়নেরাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মসমাজিতারাই হিন্দু মতে জিৎ। অরি অশ্বীয়নাদিরা আসিরিয়া ও মিডিয়া রাজ্য জয় করে সে দেশের অধিবাসীদের আরবক্ষ-তীরে নিয়ে আসে। সেই থেকেই এই সব পরাজিতরা সৌরমিতিয়ান নামে পরিচিত।

সূর্যবংশীয় মন্থর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকু আর চন্দ্রবংশের গোত্রপতি বুধ একই সময়ে ভারতে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ইক্ষাকুর বোন ইলা বুধের স্ত্রী। বুধ বংশেই রাজা যযাতির জন্ম। পুরু যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র। পুরুর বংশ থেকে পাণ্ডব ও কৌরবদের উৎপত্তি হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যত্থ। যত্থর পাঁচ পুত্রের নাম সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক। ক্রোষ্টার বংশেই ভগবান বাস্থদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। সহস্রদের দ্বিতীয় পুত্র হৈহয়।)

মিবার, মারবার, জয়পুর বিকানীর ও রাজস্থানের অন্যান্য অঞ্চলের রাজারা শ্রীরামচন্দ্রের বংশজাত বলে নিজেদের দাবি করে। এর মধ্যে মিবারের রাণারা লব থেকে এবং মারবার ও অম্বরের রাজারা কুশ থেকে উৎপন্ন বলে পরিচয় দেয়।

ইক্ষাকু থেকে শুরু করে শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত সাতান্ন জন রাজা অযোধ্যায় রাজত্ব করেছিল। পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব থেকে শুরু করে শেষ রাজা স্থমিত্র পর্যন্ত ছাপান্ন জন রাজার উল্লেখ আছে। স্থমিত্রর পর আর কোন সূর্যবংশের রাজার বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অম্বরের রাজা শো বিজয়সিংহ স্থমিত্র থেকে কনকসেন, বিজয়সেন ও শিলাদিত্য থেকে

বাপ্পা পর্যন্ত আরও চব্বিশ জন রাজাকে এনে হাজির করেছে।

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পর ভারত শাসন করেছিল অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিত। পরীক্ষিত থেকে ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা রাজপাল পর্যন্ত চারপুরুষে রাজত্ব করেছিল ছিষট্টিজন রাজা।

একবার রাজপাল কুমায়ুনরাজ শুকবসন্তের রাজ্য আক্রমণ করে। এই যুদ্ধেই শুকবসন্তর হাতে রাজপালের মৃত্যু ঘটে। ইন্দ্রপ্রস্থ শুকবসন্তের অধিকারে চলে যায়। এর চোদ্দ বৎসর পরে এক যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের হাতে শুকবসন্তর ইহলীলা সাঙ্গ হয়। সেই থেকে বহুকাল পর্যন্ত ইন্দ্র-প্রস্থের সিংহাসন শূন্য পড়েছিল।

কালক্রমে সূর্য ও চন্দ্রবংশের সঙ্গে অগ্নিকুল নামে আর এক বংশ এসে যুক্ত হয়। এই তিন বংশের রাজারাই বহুকাল ধরে ভারত শাসন করেছিল। পরে আরও তেত্রিশটি ছোট ছোট রাজবংশ এসে এদের সঙ্গে মিশে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই রাজস্থানের ছত্রিশ রাজবংশের রাজত্বকালের মধ্যে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল।

এই ছত্রিশ রাজবংশের মধ্যে গিহ্লোট শাখার রাজারা শ্রীরামচন্দ্রের বংশ থেকে উৎপন্ন বলে নিজেদের দাবি করে। কিংবদন্তী আছে, গিহ্লোট বংশের কনকসেন ২০০ সংবতে কোশল রাজ্য ছেড়ে সৌরাষ্ট্রে এসে বিরাট নগরে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। কিছুদিন বাদে তার পুত্র বিজয়সেন বিজয়পুর নামে আর একটি নগর গড়ে তোলে সেখানে। বহুকাল ধরে বল্লভীর সিংহাসন এই বংশের রাজাদের অধিকারেই ছিল। সৌরাষ্ট্রে গজনী বা গায়নী নামে আর একটি নগর ছিল। কনকসেনের শেষ উত্তরাধিকারী শিলাদিত্য পারদ নামে এক অনার্য জাতের আক্রমণে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হয়। এর কিছুকাল পরে শিলাদিত্যর পুত্র গ্রহাদিত্য ইদরে রাজ্য গড়ে তুলেছিল। গ্রহাদিত্যর সময় থেকে শ্রীরামচন্দ্রের বংশধররা 'গিহ্লোট' নামে পরিচিত হতে লাগল। এই গিহ্লোট নামের পিছনে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। সে কাহিনী পরে বলা হয়েছে।

যযাতির অন্যান্য পুত্রের চেয়ে যদুর বংশধররাই বেশী খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণের

মৃত্যুর পর যাদবরা পঞ্চনদের .দোয়াব নামে এক জায়গায় এসে বসবাস করতে লাগল। মাত্র কয়েক মাস, তারপরেই সেখানকার বাস উঠিয়ে সিন্ধুনদের ওপারে জাবালিস্থানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে বাধ্য হল তারা। নিজেদের প্রবল পরাক্রমে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে গজনী নগর প্রতিষ্ঠা করে সমরখন্দ পর্যন্ত তাদের অধিকার বিস্তার করেছিল। এরপর কোন সময়ে যে আবার তারা বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, ইতিহাসে তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

পঞ্চনদ প্রদেশে ফিরে এসে যাদবরা শালভানপুর নামে এক জায়গায় নগর গড়ে তুলল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে মরুপ্রান্তর শতদ্রু ও গারাপারে আস্তানা গাড়তে হল তাদের। সেজায়গার জহ্লা, মোহিলা প্রভৃতি আদিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে ১২১২ সংবতে টেনোট, যশল্মীর ও দারোয়াল নামে তিনটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা। যশল্মীর গড়ে তোলার আগে সেখানকার লোদ্রর্বাপত্তনবাসীদের বিতাড়িত করে কিছুকাল রাজত্ব করেছিল যাদবরা।

জাবালীস্থান থেকে যারা বিতাড়িত হয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে ভট্টির প্রতাপই ছিল বেশী। পরে তার নাম থেকেই ভট্টিবংশের নামকরণ হয়েছে। রাঠোরদের আসার আগে ভট্টিরা গারার দক্ষিণ তীরের সমস্ত প্রদেশ অধিকার করে ভোগ দখল করেছিল।

যদুবংশের আর এক শাখার নাম জারিজা। ভট্টির মত এরাও পশ্চিমে গিয়ে বসবাস করছিল। কিন্তু তার মত আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি এরা। শম্ব নামে যে রাজা গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল সে এই যদুবংশজাত। শ্যামনগর ছিল তার রাজধানী। পরে গ্রীকরা এর নামকরণ করেছিল মীনগড়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই যাদবদের দেখতে পাওয়া যায়। মোট আটটি শাখায় বিভক্ত এরা। তার মধ্যে যদু, ভট্টি আর জারিজাই নামকরা।

তুয়ার যদুবংশের এক শাখা হলেও রাজস্থানের ছত্রিশ রাজকুলের মধ্যে বেশ উঁচু আসন পাওয়ার যোগ্য। বর্দাই রচয়িতার মতে, পাণ্ডু

থেকে এই বংশের উৎপত্তি। এ বংশের সবচেয়ে কীর্তিমান রাজা সম্রাট বিক্রমাদিত্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর প্রায় আট শতাব্দী ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন খালি থাকে। এই দীর্ঘকাল অরাজকতার পর ৭৯২ খৃষ্টাব্দে অনঙ্গপাল তুয়ারের প্রাচীন সিংহাসনে এসে বসেছিল। তারপর একে একে কুড়িজন রাজা ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করে। এদের শেষ রাজা অপুত্রক দ্বিতীয় অনঙ্গপাল ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে দৌহিত্র চৌহান পৃথ্বীরাজকে সিংহাসনে বসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। এইখানেই তুয়ার বংশের ইতি হয়ে যায়।

রাঠোর বংশের উৎপত্তির নানা রকম প্রবাদ আছে। রাঠোরদের কুল তালিকায় দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম পুত্র কুশ থেকে এরা উৎপন্ন। কিন্তু অনেকের ধারণা, সূর্যবংশীয় কশ্যপের কোন উত্তরাধিকারীর ঔরসে এক দৈত্যকুমারীর গর্ভে এদের বংশের প্রথম পুরুষের জন্ম। রাঠোরদের আদি বাস গাধীপুর, কনোজ। পাঁচ শতকের গোড়া থেকেই রাঠোরদের অভ্যুদয় হয়েছিল। মুসলমান আক্রমণে ভারতের স্বাধীনতা যখন বিপন্ন সেই সময় থেকেই দিল্লীর তুয়ার, চৌহান এবং আনহালবারার বাহ্লিক রায়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এসেছিল রাঠোররা। এই গৃহ-বিবাদই তাদের পরাজয়ের একমাত্র কারণ।

এই বিবাদে চৌহানরাজ মারা যাওয়ার পরই মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। এদিকে কনোজের রাজা জয়চাদের পতনের পর তার পুত্র শিবজী মরুস্থলীতে গিয়ে আস্তানা গাড়ল। মারবারে রাঠোর বংশের আবার প্রতিষ্ঠা করেছিল এই শিবজী। শিবজীর বংশধরদের সাহায্যেই মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল প্রায় অর্দ্ধেক ভারতে।

কুশাবহরা শ্রীরামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশএর বংশধর। কোশল রাজ্য ছেড়ে নরবরে দুর্গ তৈরি করেছিল এরা। এক সময়ে নলরাজের রাজধানী ছিল এখানে। মোগল ও তাতারদের শাসন কাল পর্যন্ত তারা নরবরে রাজত্ব করেছিল। পরে মারাঠার অত্যাচারে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় তারা। এদের মধ্যে একদল দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অনার্য মীনদের বাসস্থলীতে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। কিছুকালের মধ্যেই

মীনদের বিতাড়িত করে সেখানে অম্বর নগর গড়ে তুলেছিল তারা। আকবরের রাজত্বকাল থেকেই আর্য রাজবংশের অধঃপতন শুরু।

অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয়েছে অগ্নি থেকে। এই বংশের চার শাখা। প্রমার, পুরীহর, চালুক্য বা শোলাঙ্কি ও চৌহান।

অগ্নিকুলের মধ্যে প্রমাররাই শ্রেষ্ঠ। এদের বংশধররা পঁয়ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ জায়গাই এদের অধিকারে ছিল। যদিও বল বিক্রমের দিক থেকে শোলাঙ্কি ও চৌহান প্রমারদের চেয়ে অনেকটা শ্রেষ্ঠ তবু প্রমাররাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সব আগে। পুরীহররা বহুকাল ধরে প্রমার রাজাদের অধীনতা স্বীকার করে বসবাস করেছিল। পুরাণে আছে, মহেশ্বর নগরে প্রথম রাজধানী ছিল প্রমারদের। কিছুকালের মধ্যেই প্রমাররা সেখান থেকে চলে এসে বিন্ধ্যগিরিতে ধারা এবং মাণ্ডু নগর তৈরি করে। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীও এদেরই কীর্তি বলে জানা গেছে। প্রমার রাজাদের আধিপত্য নর্মদা পার হয়ে সুদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৭১৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রমারবংশের রাজা রামপ্রমার রাজধানী গড়ে তুলেছিল ত্রৈলঙ্গে। সামন্ত-সমিতির প্রধান ও ভারতের রাজাধিরাজ রামপ্রমার ছত্রিশটি রাজকুলের প্রত্যেককে এক একটি বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিল। কিন্তু রামপ্রমারের মৃত্যুর পরই এরা সবাই নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করল। আসলে গিহ্লোটদের চিতোর অধিকারের পর থেকেই প্রমারদের আধিপত্য কমে যেতে থাকে।

প্রমারবংশের শেষ রাজা ধাতনগরের ভোজপ্রমার। একসময়ে রাজ্যভ্রষ্ট হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিল সে। তার অমরকোট রাজধানীতে আকবরের জন্ম হয়েছিল। কালের ফেরে আজ তারা দীন দরিদ্র। প্রমারবংশ পঁচিশটি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে ডিহিল এবং মোরীই শ্রেষ্ঠ। আরাবলী পাহাড়ের কাছে চন্দ্রাবতী নগরে এদের রাজধানী ছিল। বাকী শাখাগুলোর মধ্যে অনেকেই সিন্ধু পারে উপনিবেশ গড়ে তোলে। পরে এদের অনেকেই মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের

গৌরব চুরমার করে ফেলেছে।

বিক্রমের দিক থেকে অগ্নিকুলের মধ্যে, শুধু অগ্নিকুলের মধ্যে কেন সমগ্র রাজপুতদের মধ্যে চৌহানই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র রাঠোররাই এদের প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্য হতে পারে। চৌহানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক চমৎকার প্রাচীন কাহিনী আছে।

পবিত্র আরবুধ পাহাড়ের ঋষিদের ওপর দৈত্যরা প্রায়ই হামলা করত। ঋষিরা যজ্ঞ আরম্ভ করল। সহসা অগ্নিকুণ্ড থেকে এক দিব্যমূর্তি আবির্ভূত হল। তার দেহে কোন বীরত্বের ছাপ ছিল না। ঋষিরা তাকে যজ্ঞ-স্থানের দ্বাররক্ষী করে রাখল। দেখতে দেখতে আরও দুটি মূর্তির আবির্ভাব হল। ঋষিরা এই তিনজনের পুরীহর, চালুক্য ও প্রমার নামকরণ করে প্রমারকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করল। কিন্তু দৈত্যদের পরাজিত করতে পারল না তারা। তখন মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতে থাকল। অবশেষে অসিবর্মধারী এক বীরের আবির্ভাব হল। ঋষিরা এর নামকরণ করল চৌহান আনহল। এই চৌহান আনহলের অসির আঘাতে দৈত্য-সেনারা প্রাণ হারাতে লাগল। বাকী দৈত্য-সেনারা ভয়ে পালিয়ে গেল অন্যত্র। এই চৌহান বীরের বংশেই মহাবীর পৃথ্বী-রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। চৌহানদের কুলতালিকায় দেখা যায়, আনহল চৌহান থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত উনচল্লিশজন রাজা রাজত্ব করেছিল। কিন্তু অনেকেই এই তালিকা ঠিক বিশ্বাস করে না। চৌহানরা যে কয়টি নগর গড়েছিল তার মধ্যে আজমীর এবং শম্ভর সবচেয়ে প্রাচীন। চৌহান বংশের অজপাল আজমীর নগর তৈরি করে। শম্ভর হ্রদের তীরে শম্ভর নগর, এই হ্রদে শাকম্ভরী দেবীর মূর্তি আছে। মনে হয়, দেবীর নামানুসারেই এর নাম শম্ভর হয়েছে।

চৌহানবংশের অনেক বীরই বীরত্বে অমর। কিন্তু তার মধ্যে মাণিক রায়ের বীরত্ব ও মহত্বের তুলনা মেলা ভার। গিরি-প্রাকার ভেদ করে মুসলমানরা যখন পঞ্চনদের তীরে এসে উপস্থিত হ'ল তখন মাণিক রায়ের প্রবল বিক্রমে তারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। গজনীর মহম্মদের আক্রমণও

প্রতিহত করেছিল মাণিক রায়ই।

রাজা বিশালদেবের রাজত্বকাল থেকে চৌহানদের গৌরব ম্লান হতে শুরু করে। ঐ সময় আরবীরেরা তার রাজ্য আক্রমণ করেছিল। এই যুদ্ধে বিশালদেবকে যে সব রাজা সাহায্য করেছিল তার মধ্যে উদয়জিৎ প্রমারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধে সে নিহত হয়। সবশুদ্ধ চব্বিশটি শাখায় বিভক্ত চৌহানবংশ। এদের মধ্যে হারা-বতীর বুন্দি ও কোটা সবচেয়ে বিখ্যাত। চৌহানদের গৌরব এরা বহুকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল। ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে তার বৃদ্ধ বন্দী পিতাকে উদ্ধার করার জন্যে এই বংশের ছয়টি রাজভ্রাতা যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় নি।

প্রমার ও চৌহান রাজাদের মত শোলাঙ্কিরাও খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নামকরা। এদের আদি বাসস্থান ছিল লোহকোটে।

মূলরাজ নামে এক শোলাঙ্কিবংশধর আনহলবারার সূর্য উপাসক সৌরদের সিংহাসন দখল করে। মূলরাজের বাবার নাম জয়সিংহ। ভোজরাজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর নিজের রাজ্য ছেড়ে ঘরজামাই হয়ে সে শ্বশুর বাড়িতেই বাস করত। ৯৮৭ সংবতে ভোজরাজের মৃত্যুর পত্র তার দৌহিত্র মূলরাজ সিংহাসন পেল। আটান্ন বৎসর রাজত্বের পর মূলরাজের মৃত্যুর পর তার ছেলে চাঁদরাজ রাজা হয়। চাঁদরাজের রাজত্ব কালে গজনীর মহম্মদের রোষানলে আনহলবারা প্রদেশ পুড়ে ছার-খার হয়ে যায়। সে-সময় আনহলবারা এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। লুঠতরাজ করে সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিল মহম্মদ।

মামুদ এবং তার উত্তরাধিকারীরা আনহলবারার প্রায় সমস্ত বীরকে নিহত করলেও সিদরাও জয়সিংহ নামে এক মহাপুরুষ আনহলবারাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সংবৎ ১১৫০ থেকে ১২০১ পর্যন্ত কর্ণাট থেকে হিমাচল অবধি বাইশটি রাজ্য শাসন করেছিল সে। কিন্তু তার এক উত্তরাধিকারীর অপরিণামদর্শিতার ফলে পৃথ্বীরাজের রোষানলে তার সব গৌরব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

এরপর চৌহান-রাজা কুমারপাল আনহলবারার শোলাঙ্কি সিংহাসনে বসে। কুমারপাল ও সিদ্ধরায় দুজনেই বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী ছিল। এদের সময়ে রাজ্যে স্থপতি বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কুমারপালের শেষ জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। শাহাবুদ্দিনের অত্যাচারে বৃদ্ধ বয়সে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিল সে। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে আনহলবারার কুমার পালের উত্তরাধিকারী বল্লমূলদেবের রাজত্বের অবসান ঘটে। সেই সঙ্গে চৌহান বংশেরও ইতি হয়ে গেল। বিশালদবকে সহায় করে সিদ্ধরায়ের বংশধররা আবার সেই সিংহাসন পুনরাধিকার করল। আনহলবারা আবার সমৃদ্ধশালী হয় উঠেছিল, কিন্তু সহসা আলাউদ্দিন খিলজীর আক্রমণে আবার সব চুরমার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শোলাঙ্কি বংশের গৌরবও নিভে শেষ হয়ে যায়।

তাতারদের লালসার আগুনে সৌরাষ্ট্র ও গুর্জর নগরগুলো শ্মশান হয়ে গেল। আদিনাথের মন্দির ভেঙ্গে তার ওপর তারা বসালো মসজিদ। শতশত দেববিগ্রহ মুসলমানের পায়ের তলায় দলিত হল। শোলাঙ্কিদের রাজলক্ষ্মী চিরকালের মত সৌরাষ্ট্র থেকে বিদায় নিল। শোলাঙ্কি রাজবংশধররা সিংহাসনচ্যুত হয়ে প্রায় একশো বছর ধরে নিরাশ্রয় অবস্থায় ভারতের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পরে তক্ষকবংশের এক বীর মুসলমান বাদশাহর অনুগ্রহে সৌরাষ্ট্রের সিংহাসনে বসতে পেল। কুলধর্মে কালি দিয়ে মুসলমান হতে হয়েছিল তাকে। মুসলমান হওয়ার পর তার নাম হয়েছিল উজয়-উল-টঙ্ক।

শোলাঙ্কি সবশুদ্ধ ষোলটি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে ভাগিলাই নাম করা। ভাগিলা থেকে ভাগেলখণ্ডের নামকরণ হয়েছে। কিন্তু অনেকের ধারণা, সিদ্ধরায়ের পুত্র ভাগ্যরায়ের নামানুসারে ভাগেল প্রদেশের নামকরণ হয়েছিল। সিদ্ধরায়ের বংশধররা এই প্রদেশে রাজত্ব করেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। শোলাঙ্কিদের অন্যান্য শাখার কোন হদিস পাওয়া যায় না।

পুরীহরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা নাহুর রাও। পৃথ্বীরাজের অধীনতা থেকে

মুক্ত হওয়ার জন্যে, যদিও সফল হতে পারেনি, যে অলৌকিক বীরত্ব দেখিয়েছিল নাহুর রাও, ইতিহাস তা সোনার অক্ষরে লিখে রেখেছে। পুরীহরদের অন্যান্য রাজারা আজমীরের চৌহান রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজা হিসেবে বসবাস করত। মান্দ্রাদি পুরীহরদের এক বিখ্যাত রাজধানী। এখন এর নাম মান্দাবার। এই গিরিদুর্গম দুর্গের প্রাচীরগুলোর ধ্বংসাবশেষে স্থপতিশিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মুসলমান আক্রমণে কান্যকুব্জ থেকে বিতাড়িত হয়ে রাঠোররা এই মান্দ্রাদিতে পুরীহরদের আশ্রয়ে বসবাস করেছিল। কিছুদিন বাদে ধর্মের মাথায় পা রেখে আশ্রয়দাতাকে হত্যা করে মান্দ্রাদির সিংহাসন অধিকার করল রাঠোররা। পুরীহরদের প্রতাপ ম্লান হয়ে পড়েছিল সে সময়। মিবারের রাজা পুরীহরদের পরাজিত করে কতকগুলো রাজ্যের সঙ্গে এদের রাজবংশের উপাধি 'রাণা'ও কেড়ে নিয়েছিল। সেই থেকে মিবারের রাজারা 'রাণা' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। পুরীহররা মোট বারোটি শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। রাজস্থানের কোন কোন অঞ্চলে এদের গৌরবের সামান্য ছিটেফোটা মাত্র চোখে পড়ে আজ।

সৌররা কোন বংশের শাখা-প্রশাখা জানা যায় না। কর্ণেল টডের মতে এরা শাকদ্বীপের অধিবাসী। সৌররা যে কটি নগর গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে দেববন্দরই সবচেয়ে বিখ্যাত। সোমনাথের মন্দির সৌরদের আর এক কীর্তি। কোন এক দুর্ঘটনায় দেববন্দর সমুদ্রগর্ভে ধসে গেলে সৌররাজা মিবারের রাণার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য জাতের ওপর দেববন্দর রাজের জাত-বিদ্বেষ ছিল। সমুদ্রে বণিকদের বাণিজ্য-জাহাজ দেখতে পেলেই লুঠতরাজ করে নিয়ে আসত। রাজা হয়ে সামান্য দস্যুবৃত্তি করতেও কুণ্ঠিত হত না সে। এই কারণে বরুণদেব কুপিত হয়ে দেববন্দর গ্রাস করেছিল।

দেববন্দর ধ্বংসের পর সৌররাজা আনহলবারাপত্তন প্রতিষ্ঠা করে ৮০২ সংবতে। সেই থেকে ১৮৪ বৎসর পর্যন্ত এখানেই তাদের রাজধানী

ছিল। সৌরবংশের শেষ রাজা ভোজ তার নিজের ভাগিনেয় দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার পর আনহলবারায় সৌরবংশের আধিপত্য শেষ হয়ে যায়।

প্রাচীনকালে শাকদ্বীপ থেকে নানা জাতের লোক ভারতে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। এর মধ্যে তক্ষক এবং নাগ বংশধররাই প্রধান। পৃথিবীর অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই নাগ বংশ থেকে উদ্ভূত। তৈমুর, আতিলা, চেঙ্গিস খাঁ, বাবর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বীররা তুর্ক [তক্ষক] বংশে জন্মেছে। কোন সময়ে যে তারা এসে ভারতে আস্তানা গেড়েছিল তা আর অনুমান করা যায় না। মহাভারতে আছে, অর্জুন তীর্থযাত্রা কালে উলুপী নামে এক বিধবা নাগ-কন্যাকে বিয়ে করেছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতীয়দের সঙ্গে এদের বিবাহাদিও প্রচলিত ছিল। সেকন্দর শাহ যখন ভারত আক্রমণ করে সে সময় কাবুল নদীর তীরে এক পাহাড়ে কিছু তক্ষক বাস করত। সেকন্দর শাহর সেনাপতিত্ব করেছিল এই তক্ষকদের রাজা তক্ষশীল, এই রকম অনুমান করা হয়। তক্ষকবংশের মৌরীরা চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেছিল এক সময়। পরে গিহ্লোটরা এসে এদের বিতাড়িত করে। সেই থেকে এরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। রাজস্থানের ইতিহাসে এদের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পরে এরা মুসলমান হয়ে গিয়ে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে।

আর্যরাজবীরদের কুলতালিকায় জিৎদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তারা যে রাজপুত ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। কোন রাজপুতের সঙ্গে এদের কখনও কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয়নি। এরা একেশ্বরবাদী। ডিগায়েন সাহেবের মতে এরা আগে বৌদ্ধ ছিল। জিৎরা বহুকাল ধরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব অটুট রেখেছিল, কিন্তু কালক্রমে এরাও মুসলমান হয়ে গেছে। শাইরসের রাজত্বকালে জিৎরা জাক্ষারতীশ তীরে যে রাজধানী গড়ে তোলে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তা অটুট ছিল। সিন্ধুর পশ্চিম কূলেই এদের আদিবাস। এরা যদুবংশজাত বলে নিজেদের পরিচয় দিত। কিন্তু কর্ণেল টডের মতে এরা শাকদ্বীপের অধিবাসী, তক্ষক। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে চম্বলনগরের কাছে কংস প্রদেশের এক মন্দিরে

একখানি প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে, 'মহারাজ শম্বুক শালীন্দ্রজিতের বংশে জন্মগ্রহণ করে। শম্বুকের পুত্র দিগল। যদুবংশের কন্যার সঙ্গে দিগলের বিয়ে হয়েছিল। এদের একজনের গর্ভে দিগলের বীরনরেন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে।' এ থেকে বোঝা যায়, মাতামহকুল ধরে তারা যদুবংশজাত বলে নিজ পরিচয় দেয়। সেসময় জগতের প্রায় সব জায়গাতেই এরা উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ভারতে শেষ অভিযানের পর ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ যখন দেশে ফিরে চলেছে, মুলতানের জিৎরা তাদের আক্রমণ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জিৎরা পরাজিত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। মহম্মদের সঙ্গে সেধে এই যুদ্ধই তাদের কাল হল। এদের বংশধররা এখনও অনেকে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনার উপকূলে ও সৌরাষ্ট্রে বসবাস করছে। গঙ্গা-যমুনার উপকূলে যারা বাস করছে তারা জাট, সৌরাষ্ট্রের ও বেলুচিস্থানের পূর্ব-সীমান্তবাসীরা জট, এবং পাঞ্জাবে যারা বাস করছে তারা জিট নামে পরিচিত।

রাজস্থানের ছত্রিশ জাতের মধ্যে যে কয়টি শাকদ্বীপের জাত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাদের মধ্যে হূণই শ্রেষ্ঠ। এরা যে কোন সময়ে ভারতে এসেছিল তা অনুমান করা শক্ত। তবে মনে হয়, শাকবাহন, কীর্তিমল্ল প্রভৃতি জাতরা যখন শাকদ্বীপ থেকে ভারতে এসেছিল এদের আগমনও কাছাকাছি প্রায় সেই সময়ে। মিবারের ইতিহাসে লেখা আছে, মুসলমানরা যে বার প্রথম চিতোর আক্রমণ করে, চিতোরের রাজপুতদের সঙ্গে হূণ রাজা অঙ্গুট-সিংহও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। ডিগিয়ানের মতে 'অঙ্গুট' শব্দ একশ্রেণীর চৈন সম্প্রদায়ের নাম। যে বংশে তাতার ও মোগলদের উৎপত্তি হূণরাও সেই বংশ সম্ভূত। তাতার ইতিহাসে আবুল গাজিও এই মতই ব্যক্ত করেছে। প্রাপ্ত এক প্রস্তর-ফলকের লিপি পাঠে জানা যায়, বিহারের এক হিন্দুরাজা রণযাত্রায় বেরিয়ে হূণদের প্রতাপ ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল। এর আগে হূণদের সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বহু প্রাচীনকালে, মহাভারতে উল্লেখ আছে, এদের ভারতে অবস্থিতি

সম্পর্কে প্রচুর নজির পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিগ্রহকালে সুরভিনন্দিনী রুষ্ট হয়ে যে সমস্ত সৈন্য সৃষ্টি করেছিল হূণসৈন্য তাদের অন্যতম। যাইহোক, ভারতে এসে এরা প্রথমে বারোল্লি প্রদেশে উপনিবেশের জায়গা নির্বাচন করেছিল। এর পরে সৌরাষ্ট্র ও মিবারে এসে উপনিবেশ গড়ে এরা। এক সময়ে হূণদের দাপটে সারা মেদিনী কাঁপত, আজ কিন্তু হাঙ্গেরী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তাদের সেই অমিত-বিক্রমের কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না।

২

রাজস্থানের মধ্যে মিবার এবং যশল্মীর সবচেয়ে পুরোনো। মিবার, যোধপুর, কিষানগড়, কোটা, বুন্দি, জয়পুর, যশল্মীর ও ভারতমরু এই আটটি প্রধান রাজ্যে রাজস্থানকে ভাগকরা হয়েছিল। মিবারের এখনকার নাম উদয়পুর। মারবার , বিকানীর ও অম্বরের নতুন নাম যোধপুর, কিষানগড় ও জয়পুর। কোটা ও বুন্দি এক হয়ে এখন হারাবতী নামে খ্যাত হয়েছে। মিবারে সূর্যবংশের রাজারা রাজত্ব করত। যদিও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, মিবারের রাজারা সূর্যবংশ জাত বলেই পরিচয় দিয়ে থাকে। হিন্দু-বিদ্বেষী বহু শত্রু বহুবার মিবার আক্রমণ করে গ্রামনগর ছারখার করে দিয়ে ধনরত্ন লুঠপাট করে নিয়ে গেছে।

জয়বিলাস, রাজরত্মাকর এবং রাজবিলাস গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কনকসেন। ২০০ সংবতে সৌরাষ্ট্রের প্রমার রাজাকে পরাজিত করে কনকসেন মিবার সিংহাসন অধিকার করেছিল। বীর নগর নামে আর একটি নতুন নগর গড়ে তুলেছিল সে। কনকসেনের প্রপৌত্র বিজয়সেন বিজয়নগর, বল্লভীপুর ও বিদর্ভ নামে তিনটি নতুন নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ভাওনগরের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এখনও বল্লভীপুরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রমাররাজ শাসিত সৌরাষ্ট্র এক সময় এক বর্বর জাতের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের হাতে গিয়ে পড়ে সৌরাষ্ট্রের কুলদেবতা। প্রমাররাজার একমাত্র কন্যা ছাড়া সে যুদ্ধে আর সবাই নিহত হয়েছিল। কারা বল্লভীপুর আক্রমণ করেছিল ইতিহাস সেকথা বলতে পারে না। কিংবদন্তী আছে, দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে সিন্ধুতীরে শ্যাম নগরে পারদ নামে এক অনার্য জাত বাস করত। তারাই বল্লভীপুর ধ্বংস করেছিল।

কনকসেন থেকে শুরু করে অষ্টমপুরুষে শিলাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শিলাদিত্যের জীবন-কাহিনী উপন্যাসের মত। গুর্জর রাজ্যের কৈয়র নগরে দেবাদিত্য নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করত। তার এক কন্যা, নাম সুভগা। যথাসময়েই মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, বিয়ের রাতেই সুভগার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। গুরুদেব তাকে সূর্য-উপাসনার বীজমন্ত্র শিখিয়েছিল। সুভগা একদিন অন্যমনস্কভাবে সেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতেই সূর্যদেব তার সামনে এসে হাজির হয়। কুন্তীর মত সুভগাও সূর্যের কল্যাণে গর্ভবতী হয়ে দুটি জমজ পুত্রকন্যা প্রসব করেছিল। গর্ভাবস্থায় এক দাসীর সঙ্গে তাকে বল্লভীপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাবা। সেখানেই তার পুত্র-কন্যার জন্ম হয়। সুভগার পুত্রের নাম গায়বী। গায়বী মানে গুপ্ত। পাঠশালার সহপাঠিরা তাকে ঐ নামে বিদ্রূপ করত। উপহাস করে তারা ওর বাবার নাম জিজ্ঞেস করত। কোন জবাব দিতে না পেরে মাথা হেঁট করে থাকত গুপ্ত। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি এসে মাকে প্রশ্ন করত, 'বল মা, আমার পিতার কি নাম, কোন গোত্রে জন্ম?'

সুভগা কিন্তু পুত্রের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিত না। এইভাবে কিছুদিন গেল। ক্রমে গায়বীর বোঝার বয়স হল। একদিন সে কঠিন কণ্ঠে মাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি যদি আমার পিতার নাম না বল, এই মুহূর্তেই তোমাকে আমি হত্যা করব।'

গায়বীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, সূর্যদেব তার সামনে আবির্ভূত হয়ে আদ্যপ্রান্ত সমস্ত ঘটনা খুলে বলল পুত্রকে। তারপর তার হাতে একখণ্ড শিলা দিয়ে বলল, 'এই শিলাখণ্ড যার দেহে তুমি স্পর্শ করবে, তক্ষুণি তার মৃত্যু হবে।'

সেই শিলাখণ্ডের সাহায্যে একে একে সমস্ত উপহাসকারী সহপাঠীদের হত্যা করতে লাগল গায়বী। সংবাদ রাজার কানে গেল। রাজা ডেকে পাঠালো তাকে। শিলাখণ্ডটি ফেলে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল রাজা। কিন্তু গায়বী রাজার সে আদেশ থোড়াই গ্রাহ্য করল। তার বদলে রাজার

দেহে শিলাখণ্ডটি ছুঁইয়ে তাকে হত্যা করে তার সিংহাসন অধিকার করে বসল গায়বী। সেই থেকে তার নাম শিলাদিত্য।

সে সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে এক পবিত্র কুণ্ড ছিল। রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হলে, শিলাদিত্য সেই কুণ্ডের সামনে গিয়ে সূর্যের উপাসনা করত। সূর্যের কৃপায়, সেই কুণ্ড থেকে সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র, হাতি, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তু উঠে আসত। সে-সব নিয়ে যুদ্ধে যেত শিলাদিত্য এবং নিশ্চিত ফল লাভ হত। এইভাবে রাজ্য যখন সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর চক্রান্তে, অনার্যদের সঙ্গে এক যুদ্ধে, শিলাদিত্য পরাজিত ও নিহত হয়। মন্ত্রী জানত ঐ কুণ্ড থেকে কিভাবে যুদ্ধাস্ত্র উঠে আসে। শত্রুপক্ষকে সেকথা জানিয়ে দিয়েছিল সে। গরুর রক্ত ঢেলে তারা ঐ কুণ্ড অপবিত্র করে রেখেছিল। তাই শিলাদিত্যের সকাতর আবেদনেও কোন ফল হল না। হতাশ হয়ে সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যুদ্ধে গেল। সেই যুদ্ধেই তাকে প্রাণ হারাতে হল। রাজা শিলাদিত্যের অনেকগুলো রাণী ছিল। সকলেই সহমরণে চিতায় উঠল। শুধু বেঁচে রইল একজন। তার নাম পুষ্পবতী। পুষ্পবতী এক প্রমার রাজবংশের কন্যা। গর্ভাবস্থায় যখন পিত্রালয়ে ছিল সে সেই সময় শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়। যুদ্ধ-সংবাদ শোনামাত্র রাণী স্বামীর রাজধানীর দিকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে পৌঁছনর আগেই পথের মধ্যে মালিয়া নামে এক পাহাড়ের গুহায় এক পুত্রসন্তান প্রসব করল সে। শুধুমাত্র শিশুপুত্রের জীবন রক্ষার জন্যেই পুষ্পবতী আর রাজধানী পর্যন্ত গেল না। কাছেই বীরনগর নামে এক গ্রাম। সেখানে কমলাবতী নামে এক ব্রাহ্মণীর হাতে শিশুপুত্রের লালন পালনের ভার দিয়ে পুষ্পবতী স্বামীর উদ্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করল। পুষ্পবতীর মৃত্যুর পর কমলাবতীই শিশুপুত্রের মায়ের অভাব পুরণ করেছিল। গুহায় জন্ম হয়েছিল বলে, কমলাবতী ছেলের নাম রাখল গুহ।

একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও গুহকে মনের মত মানুষ করতে পারল না কমলাবতী। লেখাপড়ায় মন নেই ছেলের। অশান্ত, অবাধ্য হয়ে সব

সময় ভীল ছেলেদের সঙ্গে হৈ হল্লা করে ঘুরে বেড়াত। মাত্র এগারো বছর বয়সের সময় তার দৌরাত্ম্য এত বেড়ে উঠেছিল যে কেউই তাকে আর শাসন করে বশে আনতে পারত না। এ সম্বন্ধে ভট্টকবি এক জায়গায় লিখেছে, রাজপুত্রের শৈশববীর্যও সূর্যের প্রখর তেজের মত অসহ্য।

মিবারের দক্ষিণ দিকে. পাহাড়ের মধ্যে ইদর নামে এক জনবসতি ছিল। মাণ্ডলিক নামে এক ভীল সেখানকার রাজা। রাজপুত্র গুহ ভীল বালক-দের সঙ্গে মিতালি করে বনে বনে শিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। শান্ত ছেলের মত ব্রাহ্মণ বালকদের সঙ্গে খেলা করতে আদৌ সে রাজী না। ভীল ছেলেরা গুহকে এত বেশী ভালবেসে ফেলেছিল যে তাকেই তারা ইদর রাজ্যের রাজা করল।

বন্য ভীলরা যে স্বর্গীয় ভালবাসার নিদর্শন দেখাল ক্ষত্রিয়কুমার গুহ কিন্তু তার এতটুকু মর্যাদা দিতে পারে নি। মাণ্ডলিক নিজের ঔরসজাত পুত্রকে বঞ্চিত করে গুহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। কিন্তু গুহ সেই সরলমতি বৃদ্ধ ভীলরাজাকে হত্যা করে তার প্রতিদান দিয়েছিল! কার প্ররোচনায় গুহ এই নৃশংস কাজে উৎসাহ পেয়েছিল তা আজও জানা যায় নি। গুহের নাম থেকেই তার বংশের নাম হল 'গিহ্লোট'। গুহের মৃত্যুর পর গিহ্লোট বংশের আট পুরুষ এ গিরি প্রদেশে রাজত্ব করেছিল। অষ্টম পুরুষের রাজা নাগাদিত্য একদিন বনের মধ্যে মৃগয়া করতে বেরিয়েছিল এমন সময় ভীলরা তাকে হত্যা করে তাদের পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়ে নেয়। স্বাধীনতা-প্রিয় ভীলরা এতকাল রাজপুতের কাছে তাদের পিতৃ-পুরুষের স্বাধীনতা গচ্ছিত রেখেছিল। কিন্তু আর না, এবার তারা সে স্বাধীন রাজ্য কেড়ে নিল।

নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর হাহাকার পড়ে গেল গিহ্লোট পরিবারে। চারদিকে ক্রুদ্ধ ভীল। তাদের থাবা থেকে রাজপুত মহিলাদের রক্ষা করবে কে? নাগাদিত্যের তিন বছরের শিশুপুত্র বাপ্পাকেই বা কী উপায়ে বাঁচানো যায়?

এই চরম দুর্দিনে কমলাবতীর বংশধররাই বাপ্পাকে নিয়ে ভাণ্ডীর দুর্গে

গিয়ে হাজির হল। সেখানে যতুবংশের এক ভীল আশ্রয় দিল তাদের। কিন্তু সে জায়গাও নিরাপদ মনে হল না। বাপ্পাকে নিয়ে পরাশর অরণ্যে ত্রিকূট পাহাড়ের কাছে নগেন্দ্র নগরে এসে উপস্থিত হল তারা। সেখানকার ব্রাহ্মণরা ভগবান শঙ্করের উপাসক। তারাই লালন পালন করতে লাগল বাপ্পাদিত্যকে।

ঝুলন-পূর্ণিমা রাজপুতদের এক প্রধান আনন্দোৎসব। নগেন্দ্র নগরে শোলাঙ্কি বংশের এক রাজা রাজত্ব করত। ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাজার মেয়ে সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জবনে গিয়েছিল খেলা করতে। ঝুলন-মঞ্চে তুলবার ইচ্ছে হল রাজকন্যার। কিন্তু দড়ির অভাবে দোলনা তৈরি করতে পারছিল না। এমন সময়ে বাপ্পা গিয়ে হাজির সেখানে। মেয়েরা এসে তাকে ঘিরে ধরল, দড়ি এনে দেবার জন্যে। বাপ্পা কৌতুক করে বলেছিল, দড়ি এনে দিতে পারি, যদি তোমরা আমাকে বিয়ে কর।

এক কথায় রাজী সব মেয়ে। খেলা-ছলে সেখানেই বিয়ে হয়ে গেল। পরিণামে কি হতে পারে তার কিছুই বুঝল না বাপ্পা।

সেদিনের লীলাবিবাহের কথা ভুলে গেল মেয়েরা। কিছুদিন পরে বিয়ের যোগ্য হল রাজকন্যা। জ্যোতিষীকে ঠিকুজী দেখতে বললে রাজা। ঠিকুজী এবং কররেখা বিচার করে অবাক হয়ে গেল জ্যোতিষী। সভয়ে রাজাকে বললে সে, মহারাজ, এ কন্যার বিবাহ এর আগেই হয়ে গেছে।

রাজা তো অবাক! কোথায়, কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সে কথা মেয়ে কিছুই বলতে পারল না। চারদিকে চর পাঠানো হ'ল। অবশেষে জানতে পারল রাজা, বাপ্পাই এ বিয়ের জন্যে দায়ী। বিপদ বুঝে পালিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়েরই এক নির্জন গুহায় আত্মগোপন করে রইল বাপ্পা। তুটি ভীল-বালক তার সঙ্গে ছিল। তাদের নাম বলীয় ও দেব। আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে, অনেক তুঃখকষ্ট সহ্য করেও তারা বাপ্পার সহচর হতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই তুই বন্ধুর সাহায্য না পেলে মিবারের কুলতালিকায় আজ হয়তো বাপ্পার নামই খুঁজে পাওয়া যেত না। এই কারণেই, বাপ্পার বংশধররা, আজও অভিষেকের সময় ভীলদের পরিয়ে দেওয়া রক্ততিলক

ধারণ করে থাকে।

ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে যখন পালিত হচ্ছিল বাপ্পা সে-সময়ে তাকে গরু চরানোর কাজে লাগানো হয়েছিল। গরুগুলোর মধ্যে একটি ছিল কামধেনু। কিন্তু কি আশ্চর্য, সারাদিন মাঠে খেয়েদেয়ে গরুগুলো যখন ফিরে আসত তখন কামধেনুটি দুয়ে এক ফোঁটাও দুধ পাওয়া যেত না। এজন্যে ব্রাহ্মণরা বাপ্পাকেই দায়ী করত। বাপ্পার মনেও এক সন্দেহ দানা বেঁধেছিল। একদিন সেই কামধেনুকে অনুসরণ করতে করতে এক পর্বত গুহার কাছে এসে বাপ্পা দেখতে পেল, এক যোগী ধ্যানে মগ্ন। সামনে শিবলিঙ্গ। কামধেনুটি শিবলিঙ্গের মাথায় অবিরল ধারায় দুধ বর্ষণ করতে শুরু করল। বাপ্পার উপস্থিতিতে অসময়ে যোগীর ধ্যান গেল ভেঙ্গে। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কৃতাঞ্জলি পুটে ঋষির সামনে দাঁড়িয়ে রইল বাপ্পা। আশঙ্কা, বুঝি কোন অভিশাপ দেবে যোগিবর! কিন্তু ঋষি সস্নেহে বাপ্পার পরিচয় জিজ্ঞেস করল শুধু। যেটুকু আত্মপরিচয় জানা ছিল অকপটে ঋষিকে নিবেদন করল বাপ্পা।

এরপর থেকে রোজ সেই আশ্রমে গিয়ে ঋষিকে সেবা করত সে। এইভাবে কিছুকাল গেল। ঋষি হারীত তুষ্ট হয়ে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দিল বাপ্পাকে। একনিষ্ঠ ভক্তিতে প্রীত হয়ে ভগবতী বাপ্পার সামনে আবির্ভূত হয়ে শূল, খড়্গ, ধনুশর, তূণীর, অসি, বর্ম প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিল। ভগবতীর হাত থেকে যে তরবারিখানা পেয়েছিল সে তার ওজন বত্রিশ সের।

যোগিবর হারীতের মহাপ্রস্থানের দিন এগিয়ে এল। যেদিন এ জগৎ ছেড়ে আনন্দলোকে যাত্রা করবে সেদিন ভোরবেলা যোগীর সঙ্গে বাপ্পার দেখা করার কথা ছিল। কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন বাপ্পা যথা সময়ে ঋষি হারীতের আশ্রমে হাজির হতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙ্গল, সময় চলে গেছে। ছুটতে ছুটতে আশ্রমে গিয়ে দেখল, আশ্রম শূন্য, ঋষি হারীত এক দীপ্তিময় রথে চড়ে ঊর্দ্ধলোকে উঠে যাচ্ছে। প্রিয় শিষ্যকে আশীর্বাদ করার জন্যে ঋষি হারীত রথের গতি শূন্য পথেই থামাল ক্ষণকাল। বাপ্পাকে

LIBRARY
40200
9-12-91
AGARTALA
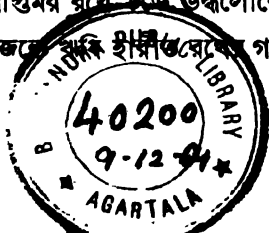
মুখ খুলে হাঁ করতে বলল যোগিবর। হাঁ করল বাপ্পা। তার মুখবিবরে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করে দিল সে। কিন্তু ঘৃণায় মুখটা নামিয়ে নিয়েছিল বাপ্পা। নিষ্ঠীবন তার পায়ের তলায় এসে পড়ল। যদি ঘৃণা না করত তবে অমরত্ব লাভ করতে পারত বাপ্পা।

ভট্ট কাব্যে, এই ধরনের বহু বিচিত্র অলৌকিক ঘটনায় বাপ্পার জীবন-কাহিনী রচিত হয়েছে।

ছোটবেলায় বাপ্পা মার কাছে শুনেছিল, চিতোরের তখনকার মৌর্য রাজা তার মামা। একদিন অরণ্যবাস ছেড়ে লোকালয়ে এল সে। এই তার প্রথম লোকালয় দর্শন। ঠিক এই সময়েই এক সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথের দেখা পায় সে। সেই মহাপুরুষ তাকে তুইদিকে ধারালো মন্ত্রপূত এক তরবারি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল। এই তরবারিখানা আজও উদয়পুরে আছে। রাণা নিজের সামন্তদলের সঙ্গে প্রতি বৎসর এই তরবারির পূজো করে থাকে।

প্রমারবংশের এক শাখা মৌর্যবংশ। এ-বংশের রাজারা এর আগে মালবের সিংহাসন অধিকার করেছিল। বাপ্পা যে-সময় চিতোরে এল সে-সময় চিতোরের অধীশ্বর ছিল মৌর্যরাজা মান। বাপ্পার পরিচয় পেয়ে মান সমাদরে ভাগিনেয়কে তার অধীনের সমস্ত সামন্ত-সমিতির অধিনায়ক নিযুক্ত করে দিল। যথাযোগ্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হল বাপ্পার জন্যে।

বাপ্পা আসার পর থেকেই মানের সন্তানদের ওপর স্নেহ ভালোবাসায় কিছু ভাঁটা পড়তে শুরু করে। বাপ্পাই সামরিক বিভাগের সর্বে-সর্বা নির্বাচিত হল। সামন্ত-রাজারা বাপ্পার এই সৌভাগ্যে জ্বলে উঠল। নানাভাবে তার অনিষ্ট করার উপায় সন্ধান করতে লাগল তারা।

এই সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত বৈদেশিক শত্রু চিতোর আক্রমণ করে। রাজা মানসিংহ তার তাঁবের সামন্ত-রাজাদের ডেকে পাঠাল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। কিন্তু এই রকম একটা সুযোগই খুঁজছিল তারা। সবাই বেঁকে দাঁড়াল একসঙ্গে। বললে, মহারাজ আমরা তো সব

অপদার্থ, আমাদের আর কেন। আপনার প্রিয় সেনাপতি বাপ্পাকে বলুন, তিনিই আপনাকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিতে পারবেন।

রাজা মানসিংহ বুঝল, সামন্তরা ক্ষুব্ধ হয়েছে, এ অবস্থায় তাদের কাছ থেকে কোন সমর-সাহায্য পাওয়া সম্ভব না। রাজা চিন্তিত, কিছু ভীত হল। কিন্তু বীর-বাপ্পা এই দর্পকে অগ্রাহ্য করে একাই শত্রুর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসাধারণ সমর-কুশলতায় শত্রুকে পরাজিত করে যখন জয়পতাকা উড়িয়ে রাজধানীতে ফিরে এল বাপ্পা তখন সবাই অবাক। সব সামন্তর মুখ কালো হয়ে গেল। রাজা মানসিংহ বুকে টেনে নিল বাপ্পাকে। সেই রণ-বেশেই গজনী নগরের দিকে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল বাপ্পা। সে-সময় একজন মুসলমান গজনীর রাজা ছিল। তার নাম সেলিম। সেলিমকে সিংহাসন-চ্যুত করে সূর্যবংশের এক সামন্তকে সিংহাসনে বসাল বাপ্পা। লোকে বলে, চিতোরে ফিরে আসার সময় সেলিমের অসামান্যা রূপবতী এক কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে এনেছিল বাপ্পা। এদিকে বাপ্পার বীরত্বে ও গৌরবে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল চিতোরের সর্দাররা। অবশেষে একদিন জোট বেঁধে চিতোর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল তারা। তাদের ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল রাজা কিন্তু তারা আর ফিরে এল না। কি করে চিতোরের সর্বনাশ ঘটানো যায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল। অনেক ভেবে উপায়ও একটা বের করল। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। সামন্তরা তাদের নাটের গুরু খাড়া করল বাপ্পাকেই। চিতোর-সিংহাসনের লোভ তাদের ছিল না। শুধু মানসিংহকে একটু শিক্ষা দেবার বাসনাতেই একাজ করেছিল তারা। কিন্তু বাপ্পার মনে রাজ্য লালসাই ছিল প্রবল। এই সুযোগে মানসিংহকে রাজ্যচ্যুত করে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করে বসল বাপ্পা। তারপরই সে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য, রাজগুরু ও সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করল।

সমস্ত সামন্তগণ তার সহায় হয়ে রইল। তাছাড়া রাজস্থানের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক বীর যোদ্ধা এসে যোগ দিল তার সঙ্গে। ফলে অন্য কোন শত্রু আর চিতোর আক্রমণে সাহস করল না। নির্বিঘ্নে কিছুকাল

রাজত্ব করল সে। কালক্রমে বাপ্পার অনেকগুলো পুত্র সন্তান জন্মে ছিল। এদের কিছু পুত্রকে সৌরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিল সে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আছে, আকবর শাহের রাজত্বের সময় বাপ্পা-বংশের পঞ্চাশ হাজার বীর নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

পরিণত বয়সে স্বদেশ ছেড়ে, খোরাসান করায়ত্বে এনে সেখানকার কতকগুলো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে বসবাস করতে থাকে বাপ্পা। কৈলাবারার রাজনিকেতনে একখানি প্রাচীন ইতিহাস আছে, তার মধ্যে অনেক অদ্ভুত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাণ, তুরান, কাফ্রিস্থান প্রভৃতি নানা দেশের রাজাকে পরাজিত করে তাদের কন্যাদের বিয়ে করেছিল বাপ্পা। সেই সব রাণীর গর্ভে বাপ্পার একশো ত্রিশটি পুত্র জন্মে। এই সব পুত্রের বংশধররা নৌসেরা-পাঠান নামে পরিচিত। হিন্দু মহিষীদের গর্ভে বাপ্পার আটানব্বইটি পুত্র জন্মেছিল। এরা সবাই সূর্যবংশীয়, অগ্নির উপাসক। ভট্টগ্রন্থে আছে, বাপ্পার মৃত্যুর পর তার দেহের সৎকারের প্রশ্ন নিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান সন্তানদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়েছিল। দুই দলে খণ্ডযুদ্ধ হয়, কিন্তু যা নিয়ে এত বিবাদ সেই মৃত-দেহই উধাও হয়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। একজন কবি লিখেছে, মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করার পর বাপ্পা সংসার আশ্রম ছেড়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুমেরু শিখরে তপস্যা করেছিল।

চিতোর অধিকারের কিছুকাল পরেই বাপ্পা সৌরাষ্ট্রের রাজা ইসফগুলের কন্যাকে বিয়ে করে সেখানকার রাজকুলদেবতা বাণমাতার মূর্তিসহ নববধূকে চিতোরে নিয়ে আসে। এখনও গিহ্লোটরা এই বাণমাতার পুজো করে থাকে। গিহ্লোটকুল চব্বিশটি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে বাপ্পা থেকেই বেশীর ভাগ শাখার উৎপত্তি হয়েছে।

ইসফগুল রাজকন্যার গর্ভে বাপ্পার এক পুত্র হয়েছিল। তার নাম অপরাজিত। দ্বারকার কাছে কালিবাওরাজ কাব্য-প্রমারের কন্যা বাপ্পার আর এক মহিষী। তার গর্ভে অশীল নামে বাপ্পার আর এক পুত্র জন্মে। চিতোরে জন্মেছিল বলে বৈমাত্রেয় ভাই অশীলকে বঞ্চিত করে চিতোরের

সিংহাসন দখল করল অপরাজিত।

একবার মুসলমানরা চিতোর আক্রমণ করে খোমনরাজের কাছে কর চাইল। খোমনরাজ ঘৃণায় সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ঘোষণা করল তাদের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বন্দী হল।

গুর্জর ও সিন্ধু রাজ্যে যে সব প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল তার বিপুল ঐশ্বর্যে লুব্ধ হয়ে বোগদাদের খলিফা ওমর একদল সৈন্য পাঠিয়েছিল রাজ্য দুটি অধিকার করার জন্যে। কিন্তু সে-যুদ্ধে ওমরের সেনাপতি আবুল আয়েসকে হত্যা করে তার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ করে দিল রাজপুত বীররা।

কিছুকাল পরে খলিফা ওসমান বোগদাদের সিংহাসনে বসে। ভারত বিজয়ের লালসা তার মনেও প্রবল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এ আশায় ছাই পড়েছিল। এর কিছুকাল পরে খলিফা আলীর সেনাপতিরা সিন্ধু দেশ অধিকার করে। কিন্তু বেশীদিন তাদের সে অধিকার টিকতে পারেনি। খলিফা আলীর মৃত্যুর পরই সেখানকার তল্পি গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা। তারপর খলিফা মেলেকপও একবার ভারত আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। ইয়াজিদ যখন খোরাসন অধিপতি তখনও একবার ভারত বিজয়ের উদ্যম করা হয়েছিল, কিন্তু কেউই সফল হতে পারেনি।

কিন্তু খলিফা ওয়ালিদের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ল। ওয়ালিদ সিন্ধু এবং আশেপাশের রাজ্যগুলো অধিকার করল। এরপর মহম্মদ বিনকাশীমের আক্রমণে সিন্ধু তীরের দাহির-রাজের পতন হয়। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধে দাহিররাজ নিহত হল। দাহির-রাজের অসাধারণ রূপবতী দুই কন্যা বিনকাশিমের হাতে পড়ে। পরে এরাই বিনকাশিমের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল।

লোকে বলে, রাজকুমারীদের রূপ-লাবণ্যের কথা খলিফা ওয়ালিদের কানে যায়। বড় মেয়েটিকে দামস্কে পাঠাবার নির্দেশ পাঠায় খলিফা। দামস্কে পৌছনর পর বড় রাজকুমারী বললে, মহারাজ, দুরাত্মা কাশিম আগেই আমাদের সতীত্ব নষ্ট করেছে। আমি কলঙ্কিনী, রাজ-পরিগ্রহের

যোগ্য নই।

এ-কথা শুনে খলিফা রেগে খুন। তখনি চামড়ার থলেতে পুরে কাশিমকে তার কাছে হাজির করতে নির্দেশ দিল। যথা ভাবেই কাশিমকে নিয়ে আসা হল দামস্কে। বন্দিনী রাজকুমারী মৃদু হেসে বললে, মহারাজ, আমার বাবার প্রাণনাশ করেছে বলেই কাশিমের আমি এই অবস্থা করলাম। আসলে কাশিম আমাকে স্পর্শ করেনি।

ওয়ালিদের পর আলমনসুর পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কোন মুসলমান অধিকারের বিবরণ ইতিহাসে দেখা যায় না। ইয়াজিদ যখন খোরাসনের শাসনকর্তা তখন সে দেশদ্রোহী বলে বোগদাদ অধিপতির কোপে পড়ে। ইয়াজিদের পুত্র পালিয়ে সিন্ধুতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর বোগদাদের সিংসাহনে যে আটজন সম্রাট রাজত্ব করে তারা মুহূর্তের জন্যেও ভারতের দিকে চোখ ফেরাতে সময় পায়নি। ইউরোপের যুদ্ধে জড়িয়েই তাদের সারাজীবন কেটে গেছে। কপাল ভাল যে, সেই সময় তুর্কিস্থানে চার্লস মালেটের আবির্ভাব হয়েছিল। তার প্রবল বিক্রমে যদি মুসলমানগর্ব সমূলে খর্ব না হত তবে ফ্রান্সের ইতিহাসই যেত বদলে। প্রতিটি ফরাসীকে কোরাণের ধর্মে দীক্ষা নিয়ে মুসলমানের পদাঘাত সহ্য করতে হত আজ।

বাপ্পারাও যখন চিতোর ছেড়ে ইরানে চলে যায় সে-সময় খলিফা আব্বাসের প্রতিনিধি আলমনসুর সিন্ধু ও ভারতের পশ্চিম দেশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত ছিল।

খলিফানের ইতিহাসে খোরাসানের সম্রাট বলে কোন মহম্মদের নাম কিন্তু রাজভবনের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অষ্টমশতাব্দীর গোড়ার দিকে খোরাসানপতি মহম্মদ একবার চিতোর আক্রমণ করেছিল। ঐ সময়ে চিতোর খোমানের অধিকারে ছিল। এরপর শবক্তগীর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত আর তারা ভারত আক্রমণ করেনি। অবশ্য সিন্ধুপ্রদেশ এর অনেক আগে থেকেই তাদের দখলে ছিল।

৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শবক্তগী সিন্ধু পার হয়ে এসে ভারত আক্রমণ করে। মুসলমান-ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে হিন্দুদের ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার

করত সে। শবক্তগীর মৃত্যুর পর গজনীর সিংহাসনে বসল তার পুত্র মহম্মদ। মহম্মদের পৈশাচিক অত্যাচার ভারতবাসী কোনদিন ভুলতে পারেনি। বারোবার ভারত আক্রমণ করেছিল এই পাষণ্ড। বহুকালের বহু রাজা-প্রজার চেষ্টায় ভারতে যে সব কীর্তি তৈরি হয়েছিল তার প্রায় সবই এই মহম্মদের তাণ্ডব লীলায় ধ্বংস হয়ে যায়।

৭৫ সংবত থেকে ৭০০ সংবত পর্যন্ত মৌর, চৌহান. গিহ্লোট ও যাদবদের রাজ্যে নানারকম উপদ্রব ও অত্যাচার চলেছিল। যত্নবংশের রাজা ভট্টিরাজ শালভানপুর নগরে রাজত্ব করত। ৭৫ সংবতে ফরিদ নামে এক শত্রুর অত্যাচারে শতদ্রুর ওপারে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তাকে আস্তানা গাড়তে হয়। আজমীরের চৌহানরাজ মাণিক রায় ঐ সময়ে এক যুদ্ধে মারা যায়। এই যুদ্ধের সময় মাণিক রায়ের শিশুপুত্র দুর্গ প্রাকারের ওপর খেলা করছিল। হঠাৎ একটি তীর এসে তাকে ধরাশায়ী করে দেয়। শিশুর পায়ে রজত-অলঙ্কার ছিল। সেই থেকে চৌহানবংশের কোন রাজা আর সে-ধরনের কোন অলঙ্কার দেহে পরে না। খীচবংশের প্রথম রাজা পঞ্চনদের দেয়ার প্রদেশ থেকে এবং হয়বংশের রাজা গোলকুণ্ডা থেকে শত্রুর অত্যাচারে অনত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অনেকে অনুমান করে, ইয়াজিদ বা খলিফার অন্য কোন সেনাপতি এই অত্যাচার উৎপীড়নের গুরুমশাই ছিল। আবার কেউ কেউ বলে, এর জন্যে দায়ী বিনকাশিম।

এই সময়ে প্রমাররাজারা কখনও চিতোর কখনও বা উজ্জয়িনী শাসন করত। টড সাহেবের মতে, গ্রীক সেলুকসের সঙ্গে মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুপ্তের মিত্রতা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়েছিল। এই সময়েই প্রমার-রাজকুলকে ভারতের সার্বভৌম সম্রাট বলে সমস্ত সামন্তরাজা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

খোমানরাজের সময় চব্বিশবার ভারত আক্রান্ত হয়। এবং প্রতিবারই প্রবল পরাক্রমে শত্রুকে বিতাড়িত করতে পেরেছিল সে। এজন্য আজও উদয়পুরের অধিবাসীরা কাউকে আশীর্বাদ করার সময় বলে থাকে, 'খোমান তোমাকে রক্ষা করুন'।

মহারাজ খোমানের ছোট ছেলে তার ও দেশের ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ব্রাহ্মণদের পরামর্শে খোমান ছোট ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে অবসর নিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই খোমানের মতিগতি বদলে গেল। উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদের হত্যা করে, পুত্রকে সিংহাসন-চ্যুত করে আবার রাজা হল সে। কিন্তু খোমানের অন্য পুত্র মঙ্গল তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে বসল। তবে পিতৃহন্তাকেও বেশী দিন রাজত্ব করতে হয়নি। সর্দাররা বিদ্রোহী হয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে। অগত্যা উত্তর-মেরুদেশে গিয়ে এক রাজ্যস্থাপন করেছিল মঙ্গল। তার বংশের নাম মঙ্গলীয় গিহ্লোট।

ভর্তৃভট্টের রাজত্বকালে চিতোরের সীমানা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। মিহি নদীর তীর থেকে আবুপাহাড় পর্যন্ত অনেকগুলো নগর গড়ে তুলেছিল সে। ভর্তৃভট্টের তেরোটি পুত্র। তাদের বংশধররা ভটীয়া গিহ্লোট নামে পরিচিত। খোমানরাজ থেকে সমরসিংহ পর্যন্ত পরপর পনের জন রাজা রাজত্ব করেছিল। এদের জীবনী থেকে জানা যায়, এরা সবাই ছিল নিরক্ষর। খালি যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। যৌবনে এরা ডাকাতি করত, পরের জীবনকে জীবন বলেই গ্রাহ্য করত না। এত বেশী যুদ্ধবাজ ছিল এরা যে, দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকলে নিজেদের মধ্যেই কলহ বাধিয়ে যুদ্ধ লালসা মেটাত। এই পনের জন গিহ্লোট রাজকুমারের রাজত্বকালে আজমীরের চৌহানদের সঙ্গে কখনও এদের যুদ্ধ আবার কখনও বন্ধুত্ব হত। গিহ্লোট-রাজা বীরসিংহ একবার এক যুদ্ধে চৌহানরাজ দুর্লভকে নিহত করে। এই ঘটনায় মনে করা যেতে পারে, গিহ্লোটদের সঙ্গে চৌহানদের স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটেছিল। আসলে কিন্তু তা হয়নি। তেজসিংহের রাজত্বকালে মুসলমানরা যখন চিতোর আক্রমণ করে তখন দুর্লভের পুত্র বিশালদেব সৈন্যসামন্ত নিয়ে চিতোর রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল।

৩
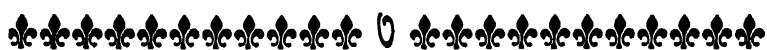
১২০৬ সংবতে সমরসিংহের জন্ম। তার রাজত্বকালে ভোলাভীম পত্তনের রাজা ছিল শোলাঙ্কি বংশের আয়াসদহের। এদিকে আবু-পাহাড়ে বাস করতো মহাবল জিৎপ্রমার। সমরসিংহের সময়ে দিল্লীর সার্বভৌম সম্রাট ছিল অনঙ্গপাল। সমরসিংহের প্রবল পরাক্রমে অনেক রাজাই বশ্যতা স্বীকার করে কর দিত তাকে।

ভট্টিরা জাবালীস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে পঞ্চনদ প্রদেশে এসে ধীরে ধীরে তান্নোট, শালিবাহনপুর, দেবরল এবং লদর্ব অধিকার করেছিল। যশল্মীর তখনও স্বল্প-পরিসরে আবদ্ধ। বহুকাল ধরে এই অপ্রশস্ত জায়গার মধ্যে ভট্টিরা বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় আরবের খলিফার সেনাপতিরা বারবার তাদের আক্রমণ করেছে। কিন্তু সব যুদ্ধেই তাদের জয় হয়েছিল। পৃথ্বিরাজের রাজত্বকালেই এদের প্রভাব, মহিমা এবং গৌরব ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। ভট্টি-রাজাদের এক ভাই অখিলেশ দিল্লী অধিপতির প্রিয় সামন্তের গৌরব পেয়েছিল।

বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উজ্জয়িনী রাজধানী হলে ইন্দ্রপ্রস্থ একেবারে অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। তারপর অনঙ্গপালই সেই শ্মশানপ্রায় জনশূন্য নগরীর সংস্কার করে আবার জনবসতিতে পূর্ণ করে। টডসাহেব এক প্রস্তর ফলক আবিষ্কার করেছিল। তা থেকে জানা যায়, বীলনদেব ঠাকুর নামে এক ক্ষত্রিয় সন্তানই পরে রাজ্যলাভ করে অনঙ্গপাল নামে পরিচিত হয়েছিল। তার বংশধররাও তাদের নামের সঙ্গে 'অনঙ্গপাল' ব্যবহার করত।

পরপর যে আঠারো জন অনঙ্গপাল দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিল তার মধ্যে শেষ অনঙ্গপাল চাঁদভট্ট বিশেষ খ্যাত। আজমীরের চৌহান রাজারাও এর অধীনে রাজত্ব করত। কিছুদিন পরে বিশালদেবের অমিত-

বিক্রমে এই অধীনতা থেকে রেহাই পেয়েছিল চৌহানরা। চাঁদভট্টের সঙ্গে যখন রাঠোরদের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় সেই সময় চৌহানরাজ সোমেশ্বর চাঁদভট্টকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিল। এই উপকার স্মরণ করে দিল্লীর সম্রাট তার কন্যাকে আজমীর-অধিপতির করে সমর্পণ করে। সে-কন্যার গর্ভে সৌমেশ্বরের যে পুত্র হয় তারই নাম পৃথ্বীরাজ। অনঙ্গপালের আর একটি কন্যার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাঠোররাজ বিজয়পালের সঙ্গে। এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হয় তার নাম জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ দুজনেই অনঙ্গ পালের দৌহিত্র। অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিল, পৃথ্বীরাজের যখন আট বৎসর বয়স তখন তাকে সিংহাসনে বসিয়ে অনঙ্গপাল দেহত্যাগ করে। মাতামহের এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল জয়চাঁদ। পৃথ্বীরাজের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন সম্রাট বলে লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগল। শুধু আনহলবারা ও মুন্দরের পুরীহর-রাজা জয়চাঁদের পক্ষে ছিল। পুরীহররাজার কন্যার সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বিয়ের সম্বন্ধ একরকম পাকাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বিয়ে বানচাল হয়ে গেল জয়চাঁদের প্ররোচনায়। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে পুরীহররাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করল পৃথ্বীরাজ। যুদ্ধে অবশ্য পৃথ্বীরাজই জয়ী হয়েছিল। কিন্তু শয়তান জয়চাঁদের অন্তর্ঘাতী নীতির দোষেই বৈদেশিক শত্রুরা ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস পেয়েছিল।

জয়চাঁদ সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তী, সম্রাট উপাধি লাভের জন্যে জয়চাঁদ একবার রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিল। সে-যজ্ঞে দেশের সব রাজাই আমন্ত্রিত হয়, শুধু পৃথ্বীরাজ আর সমরসিংহ ছাড়া। এদের দুজনের বদলে দুটো স্বর্ণপ্রতিমা নির্মাণ করে জয়চাঁদ যজ্ঞ সমাধা করল। যজ্ঞের কয়েকদিন বাদেই জয়চাঁদের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত সমস্ত রাজপুত্রদের অবাক করে দিয়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের স্বর্ণপ্রতিমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল। এই খবর পেয়ে পৃথ্বীরাজ জয়চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান করল। যুদ্ধে জয়চাঁদ পরাজিত হয়। সংযুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথ্বীরাজ দিল্লী ফিরে এল। অসাধারণ

রূপলাবণ্যবতী সংযুক্তার প্রেমে অন্ধ হয়ে পৃথ্বীরাজ তেমন ভাবে আর রাজকার্য দেখাশুনা করত না। পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ সময় রাজ অন্তঃপুরেই কাটিয়ে দিয়েছিল সে।

সমর সিংহের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বোন পৃথার বিয়ে হয়েছিল। এক সময়ে নাগরকোটের এক জায়গায় সাতকোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। পৃথ্বীরাজ এই ধনরত্ন হস্তগত করতে গেলে কনৌজরাজ ও পত্তনরাজ তাতার-সেনার সাহায্যে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে সমর সিংহের সহযোগিতায় পৃথ্বীরাজ জয়ী হয়েছিল। বিপক্ষ সেনার অধিনায়ক শাহাবুদ্দিনকে বন্দী করল পৃথ্বীরাজ। যে-সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত হয়েছিল তা সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক হিসেবে দান করে দিয়েছিল সে।

পৃথ্বীরাজ যখন সংযুক্তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে অন্তঃপুরে আটকে রয়েছে সেই সুযোগে মুসলমানরা দিল্লী আক্রমণ করল। কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে সমরসিংহ এগিয়ে এল পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করতে। এদিকে কনিষ্ঠের ওপর রাজ্যভার দেওয়ার জন্যে সমরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র চিতোর ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যবাসী আবসী বাদশাহ নিদূরের আশ্রয় গ্রহণ করল। সমরসিংহের আর এক পুত্র নেপালে গিয়ে আর একটি গিহ্লোট শাখা সৃষ্টি করেছিল।

কাজল নদীতীরে দুর্দান্ত মুসলমান শত্রুর বিরুদ্ধে তিনদিন মহা সংগ্রামের পর সমরসিংহ ও তার পুত্র কল্যাণ নিহত হয়। পৃথ্বীরাজ বিপক্ষ শত্রুর হাতে বন্দী হল। এ-যুদ্ধে সমরসিংহ যে অনন্যসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল তা প্রত্যেক রাজপুত বীরেরই আদর্শ হয়ে রইল। সমরসিংহের মৃত্যু-সংবাদ শুনে পৃথা স্বামীর সহমরণে চিতায় প্রাণ দিল। চৌহান রাজকুমার রণসিংহও অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে অবশেষে নিহত হল। দিল্লী মুসলমানদের অধিকারে এসে দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সমরসিংহের নাবালক পুত্রের পক্ষে তার মা পত্তনরাজকন্যা কর্ম দেবী সমস্ত রাজকার্য পরিচালনা করত। এক সময়ে নয়জন হিন্দু রাজা ও মাত্র এগারোজন সৈন্য নিয়ে কুতুবুদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল

সে। রাজপুতবীর বালার সঙ্গে এই যুদ্ধে কুতুবুদ্দিন পরাজিত হয়।

অনেকে বলে, কর্ণের দুই পুত্র, রাহুপ ও মাহুপ। কিন্তু তা ভুল। সূর্যমল্ল নামে সমরসিংহের এক ভাই ছিল। তার পুত্রের নাম ভরত। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণ সিংহাসনে বসলে বিপক্ষের চক্রান্তে চিতোর ত্যাগ করে ভরত সিন্ধু দেশের মুসলমান রাজার সাহায্যে আরোরনগর লাভ করে। পুগলের ভট্টিবংশের রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সেই রাণীর গর্ভে ভরতের যে পুত্র হয় তার নাম রাহুপ।

কর্ণের কন্যার সঙ্গে ঝালোরের শোণীগুরু বংশের সর্দারের বিয়ে হয়। সেই কন্যার গর্ভে রণধবল নামে এক পুত্র জন্মে। সর্দার চিতোরের গিহ্লোট বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের নিহত করে পুত্র রণধবলকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়েছিল। হীনবল মাহুপ আর কিছুতেই পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে পারল না।

এই সংবাদ শুনে ভরত সসৈন্য মিবারের দিকে এগিয়ে এল। চিতোর রাজ্যের অন্যান্য অধীনস্থ সর্দারদের সহযোগিতায় রণধবলকে যুদ্ধে পরাজিত করে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করল সে। কিছুদিন পরে ১২০১ খৃষ্টাব্দে রাহুপ চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজ্যাভিষেকের অল্পদিন পরেই নাগোর নামে এক জায়গায় মুসলমান সেনাপতি সামসুদ্দিনের সঙ্গে তার প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সামসুদ্দিনকে বন্দী করে রাহুপ জয়ী হল। এই সময় থেকেই মিবারের রাজপুরুষরা গিহ্লোটের বদলে শিশোদীয় বলে পরিচিত হতে থাকে। আশেপাশের অনেক রাজাই সামসুদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়ে তার শত্রুতা করেছিল। এদের মধ্যে মন্দুরের পুরীহররাজ মুকুল রাণাই প্রধান। যুদ্ধে রাহুপের হাতে সেও বন্দী হয়। তার অধিকৃত গদবার প্রদেশ এবং রাণা উপাধি রাহুপকে দিয়ে মুক্তিলাভ করে সে। সেই থেকে চিতোরের রাজপুরুষরা 'রাণা' উপাধিতে ভূষিত হয়ে আসছে।

ধর্মনীতি, রাজনীতি এবং রণনীতিতে অসাধারণ দক্ষ ছিল রাহুপ। তার আটত্রিশ বৎসর রাজত্বকালে চিতোর আবার তার হারানো গৌরব

ফিরে পেয়েছিল।

রাহুপের পর লক্ষ্মণ সিংহ পর্যন্ত পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে নয় জন রাজা চিতোরের সিংহাসনে বসেছিল। তার মধ্যে মুসলমান আক্রমণ থেকে গয়াধাম উদ্ধার করতে গিয়ে মহাবীর পৃথ্বীমল্ল সহ ছয়জন রাজা যুদ্ধে নিহত হয়। পৃথ্বীমল্লের অদ্ভুত ধর্মানুরাগ দেখে মুসলমানরা অবাক হয়ে যায়। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল তারা। এরপর আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুসলমানরা আর কখনও ভারত আক্রমণ করেনি।

৪

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে নাবালক লক্ষ্মণসিংহ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে। নাবালকের হয়ে কাকা ভীমসিংহ রাজকার্য দেখাশুনা করতে লাগল। সিংহলের চৌহানবংশের হামির শঙ্কের অলোকসামান্যা রূপগুণবতী কন্যা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের বিয়ে হয়। পদ্মিনীর রূপ ও গুণের তুলনা ছিল না সারা ভারতে। তার স্বর্গীয় রূপের কথা শুনে সম্রাট আলাউদ্দিনের লালসা লকলক করে উঠল। চিতোর আক্রমণ করে বহুদিন ধরে নগর অবরোধ করে রাখল সে। কিন্তু কোন ফল হলনা। শেষে ঘোষণা করে দিল, রূপবতী পদ্মিনীকে পেলেই সে ভারত ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যাবে।

একথা শুনে রাজপুত বীরদের রক্ত টগবগ করে উঠল। আলাউদ্দিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, অথচ পদ্মিনীর আশাও সে ত্যাগ করতে পারে না। অবশেষে নতুন এক চাল শুরু করল। শুধু একবার মাত্র সেই ভুবন-মোহিনীর রূপ আয়নার ভিতরে দেখতে পেলেই সে দেশে ফিরে যাবে।

ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে রাজী হল। রাজপুতের মুখ দিয়ে একবার যে কথা বের হয় প্রাণান্তেও সে-কথার খেলাপ হয় না। এবং আততায়ীও

যদি রাজপুতের অতিথি হয়, যথাযোগ্য সমাদর ও সম্মান করতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না তারা, একথা আলাউদ্দিনেরও জানা ছিল। তাই কয়েকজন মাত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে অগণিত সৈন্য পরিবেষ্টিত রাজপুত শিবিরে উপস্থিত হল সে। সসম্মানে অতিথি সৎকার করে আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখাল ভীমসিংহ। নিজের কৃতকর্মের জন্যে ভীমসিংহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের শিবিরে যাত্রা করল আলাউদ্দিন। সরল-হৃদয় ভীমসিংহও দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এসেছিল। এমন সময় বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দিনের গুপ্ত-সেনারা অতর্কিতে বেরিয়ে এসে ভীমসিংহকে বন্দী করে তাদের শিবিরে নিয়ে চলে গেল। প্রতারক আলাউদ্দিনের আদেশে ফরমান জারি করা হল, একমাত্র পদ্মিনীর বিনিময়েই ভীমসিংহর মুক্তি হতে পারে।

এই দুঃসংবাদ চিতোরে পৌছন মাত্র শোকের ছায়া নেমে এল। কি উপায়ে ভীমসিংহর মুক্তি হবে, কিভাবেই বা এ অশুভ সংবাদ পদ্মিনীকে দেওয়া যায় কেউ কিছু ঠিক করতে পারল না।

এদিকে লোক-পরম্পরায় সমস্ত সংবাদই পদ্মিনীর কানে গেল। ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, স্বামীকে উদ্ধার করার জন্যে প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান পবিত্র সতীত্বধর্ম মুসলমানের হাতে সঁপে দিতে কুণ্ঠিত নয় সে।

একথা শুনে নগরবাসী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল।

গোরা ও বাদল নামে পিতৃ-রাজ্যের দুই দেহরক্ষীকে ডেকে পাঠাল পদ্মিনী। কি কৌশলে স্বামীকে আবার চিতোর দুর্গে ফিরিয়ে আনা যায় তারই গোপন পরামর্শ করল। আলাউদ্দিনের কাছে খবর পাঠানো হল, পদ্মিনী রাজবংশের কন্যা, এখন সম্রাজ্ঞী। উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে আলাউদ্দিনের শিবিরে যেতে সম্মত আছে সে। যখন রাজমহিষী-পদ্মিনী আলাউদ্দিনের শিবিরে উপস্থিত হবে তখন তার চিরসহচরীরা তার সঙ্গে থাকবে। এ ছাড়া যে-সমস্ত রাজপুত রমণীরা তাকে স্নেহের চোখে দেখে তারা তাকে চিরবিদায় জানাবার জন্যে শিবির পর্যন্ত তার সঙ্গে যাবে। তাদের সম্মানের যেন কোনরকম ত্রুটী না হয়। এবং কেউ যেন তাদের কাছে গিয়ে মর্যাদা

নষ্ট না করে। এই সকল মহিলারা শেষ বিদায় নিয়ে আবার চিতোরে ফিরে আসবে। এই সব সর্তে যেদিন সম্রাট অবোরধকারী সৈন্যদের দূরে গিয়ে শিবির স্থাপন করতে নির্দেশ দেবে সে-দিনই তার কাছে উপস্থিত হবে পদ্মিনী।

পদ্মিনীর এই প্রস্তাবে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল আলাউদ্দিন। অবরোধকারী সৈন্যদের উঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার দিনও ঠিক হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে প্রায় সাত শো শিবিকা চিতোর থেকে আলাউদ্দিনের শিবিরের দিকে রওনা হল। প্রত্যেক শিবিকার মধ্যে রণসজ্জায় সজ্জিত চিতোরের এক একজন মহাবীর। প্রত্যেক শিবিকাই গুপ্তাস্ত্রে সজ্জিত ছ'জন রাজপুত বয়ে নিয়ে চলেছে। একে একে প্রায় সাত শো শিবিকা মুসলমান শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করল।

প্রিয়তমা পদ্মিনীর সঙ্গে জীবনের মত সাক্ষাৎ করার জন্যে ভীমসিংহকে আধঘণ্টার সময় দিয়েছিল আলাউদ্দিন। পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে শিবিকার কাছে আসতেই কৌশলে ভীমসিংহকে তুলে নিয়ে একটি শিবিকা চিতোরের দিকে পাড়ি দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলো শিবিকা তার পিছনে পিছনে যেতে লাগল। আলাউদ্দিনের আসার অপেক্ষায় বাকী গুলো শিবিরের মধ্যেই অপেক্ষা করতে থাকল। কিছু শিবিকা চিতোরের দিকে চলে যাচ্ছিল দেখে আলাউদ্দিন ভাবল, পদ্মিনীর শুভানুধ্যায়ী রাজপুত মহিলারা বিদায় নিল। বাকী গুলোতে পদ্মিনীর চির-সহচরীরাই আছে।

আধঘণ্টারও বেশী। পদ্মিনীর কাছ থেকে ভীমসিংহ ফিরে আসছে না দেখে আলাউদ্দিন আর সহ্য করতে পারল না। ঈর্ষায় তার অন্তরাত্মা জ্বলে যাচ্ছিল। আরও কিছুক্ষণ। তখন আর ঈর্ষা নয়, বিষম সন্দেহ তাকে ব্যাকুল করে তুলল। শিবিকার আবরণ তুলে ফেলতে বলা হল।

চমকে উঠল আলাউদ্দিন। বিস্ময়ে কণ্ঠ তার রুদ্ধ। শিবিকায় ভীমসিংহ নেই। ভীম সিংহ নেই, পদ্মিনীও নেই। পদ্মিনীর সহচরীরাই বা কোথায়? তার বদলে প্রত্যেক শিবিকা থেকে সশস্ত্র রাজপুত বীররা

বেরিয়ে এসে আলাউদ্দিনের সৈন্যদের সঙ্গে প্রবলভাবে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করল।

ক্রোধে জ্বলে উঠল শঠ আলাউদ্দিন। ভীমসিংহকে নিয়ে যারা পালিয়ে গেছে তাদের ধরে আনবার জন্যে সৈন্য পাঠান হল। কিন্তু আর কোথায় পাবে তারা ভীমসিংহ আর পদ্মিনীকে! ততক্ষণে চিতোর দুর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে পোঁছে গেছে তারা।

আলাউদ্দিনের সব স্বপ্ন, সব সাধ ধুয়ে গেল। ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে গেল সে কয়েকদিন বাদেই।

নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে গোরা এবং বাদল এই যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখিয়ে ছিল ইতিহাসে তা সোনার অক্ষরে লেখা আছে। এ-যুদ্ধ থেকে জনকয়েক মাত্র রাজপুতবীর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল। তার মধ্যে বালক বীর বাদল একজন। বাদলের বয়স তখন মাত্র বারো বৎসর। খুব অল্প বয়সেই অসাধারণ যুদ্ধকৌশল আয়ত্ব করেছিল এই বীর বালক।

দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করল ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে। এবার আর চিতোরকে রক্ষা করতে পারল না ভীমসিংহ। আলাউদ্দিনের সঙ্গে আগের যুদ্ধেই চিতোরের বেশীর ভাগ যোদ্ধা বলি হয়েছিল। সে যুদ্ধে যারা বেঁচে ছিল তারাই এ যুদ্ধের আহুতি হল। দিন যায়, মাস যায়, মুসলমান সেনার অবরোধ থেকে চিতোরকে রক্ষা করার ক্ষীণ আশাও প্রায় নিভে এল। বীর শূন্য চিতোর দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ঘরে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণ সিংহ। শেষ পযন্ত কি গিহ্লোট বংশে বাতি জ্বালাবার জন্যেও কেউ বেঁচে থাকবে না! প্রবল পরাক্রান্ত বীর রাজপুত রাজার চোখ আজ জলে ভরে গেল। ভীমসদৃশ বর্মকঠিন বুক ঠেলে কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। এমন সময় সামনের অন্ধকার থেকে এক ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল রাণা।

'—ম্যয় ভূখাহু।'

কে? এ কার কণ্ঠস্বর! এ যে চিতোরের কুলদেবতা!

—'আমি বড় ক্ষুধার্ত।'

লুটিয়ে পড়ল লক্ষ্মণ সিংহ, এত খেয়েও কি তোমার সাধ মেটেনি মা,

আরও খেতে চাও?

দৈববাণী শোনা গেল, 'তোমার বারোটি পুত্রকে না পাওয়া পর্যন্ত আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না।'

পরদিন সকালে রাজসভায় সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল রাণা। সে-কথা শুনে সৈন্যরা তেমন বিচলিত হল না। ভাবল, যুদ্ধচিন্তায় রাজার মাথার ঠিক নাই। নানারকম আজগুবি স্বপ্ন দেখেছে হয়তো বা। অগত্যা সেদিন রাতে সৈন্যদের নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল লক্ষ্মণসিংহ। আগের রাতের মতই দেবীর আবির্ভাব হল। সেই কণ্ঠস্বর, 'হাজার হাজার মুসলমানের রক্তেও আমার পিপাসা মিটবে না। প্রতিটি রাজকুমার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনদিন রাজত্ব করার পর চতুর্থ দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করবে। এইভাবে বারোটি পুত্রের জীবন আহুতি দিলে তবেই চিতোরের বিপদ কেটে যাবে।'

এই বলে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। জন্মভূমির জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে কোন রাজপুত বীর কুণ্ঠিত না। প্রথমে প্রথম পুত্র অরিসিংহ তিনদিন সিংহাসনে বসে চতুর্থ দিনে যুদ্ধে গিয়ে মহাবিক্রম দেখিয়ে অবশেষে শত্রুসেনার হাতে প্রাণ দিল। দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ। একেই সবচেয়ে বেশী স্নেহ করত ভীমসিংহ। গিহ্লোট বংশ রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে অজয়সিংহকে নির্বাচন করা হল। তাকে যুদ্ধে যেতে দিল না ভীমসিংহ। অবশিষ্ট দশ পুত্র একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের জীবন উৎসর্গ করে দেশপ্রেমের এক নতুন ইতিহাস তৈরি করে রাখল।

বিজাতীয় শত্রুর অত্যাচার থেকে স্বধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে পূর্ব-প্রথা অনুসারে জহরব্রতের আয়োজন করা হল। শত্রুর হাত থেকে দেশকে যখন আর রক্ষা করার কোন উপায় থাকত না, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করে তখন এই ভয়ঙ্কর ব্রতের অনুষ্ঠান করা হত।

রাজপুরীর ভিতরে অসূর্যম্পস্য স্থানে এক বিশাল কূপ ছিল। তার মধ্যে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের চিতা জ্বালানো থাকত। অন্তঃপুরের অসংখ্য

রাজপুত মহিলা প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে সেই কূপের কাছে এগিয়ে এল। উর্বশীনিন্দিত রূপলাবণ্যবতী পদ্মিনীও জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হল। একে একে সবাই অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নেমে গেল নিচে। বিশাল গহ্বরের অভেদ্য লৌহকপাট অবরুদ্ধ হয়ে গেল। সেদিন চিতোর রাজ-অন্তঃপুরে যে নির্মম শোকের অভিনয় হয়েছিল সে কথা চিন্তা করতেও অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে। চিতোরের কুললক্ষ্মীরা চিরবিদায় নিল। হায়, কোথায় সেই পদ্মিনী, যার লোভে লোলুপ হয়ে সারা চিতোর ছারখার করে দিল আলাউদ্দিন। কোথায় সেই রূপ, যৌবন। কোথায় সেই নন্দন কানন বাসিনী নিন্দিত পদ্মিনীর নশ্বর দেহ। দাবানলের প্রচণ্ড উত্তাপে নিমিষে সব ছাই হয়ে গেল।

সেই থেকে এই কূপ রাজপুতদের কাছে প্রিয় পবিত্র ক্ষেত্র। কিংবদন্তী আছে, এক বিরাট অজগর সাপ রক্ষক হয়ে এই কূপের মধ্যে বাস করে। কেহ দীপ হাতে নিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে কালসাপের বিষাক্ত নিশ্বাসে নিভে যায় সে দীপ।

শুধু লক্ষ্মণসিংহ আর তার দ্বিতীয় পুত্র অজয়সিংহ তখন জীবিত। জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নিজে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে তৈরি হল রাণা। পিতার আদেশে সামান্য কয়েকজন মাত্র সৈন্য নিয়ে শত্রুশিবির অতিক্রম করে কৈলাবার প্রদেশে চলে গেল অজয়সিংহ। বারোটি পুত্রের মধ্যে একমাত্র শিবরাত্রির সলতে এই অজয়সিংহ সেখানে গিয়ে দীন ভাবে জীবন যাপন করতে থাকল।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে চিতোর মুসলমান অধিকারে চলে গেল। রক্ত নদীর ধারায় লাল হয়ে গেল চিতোরের পথ ঘাট। ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা মর্তের অমরাবতী সেদিন শ্মশান হয়ে গেল রাজপুত বীরের মৃতদেহে।

চিতোর অধিকার করে প্রচলিত মুদ্রায় 'সেকন্দর শাহ' উপাধি এঁকে দিল আলাউদ্দিন। অনেকের ধারণা, শঠতার দিক থেকে ঔরঙ্গজীবের চেয়ে আলাউদ্দিন আরও কিছু নিচু স্তরের জীব। তার মত হিন্দু বিদ্বেষী আর দ্বিতীয় নেই। চিতোরের সব শোভা, সমৃদ্ধি এবং গৌরব চূর্ণ বিচূর্ণ করে

দিয়েছিল এই পাষণ্ড। একমাত্র ভীমসিংহ-পদ্মিনীর বাস ভবনটির কোন ক্ষতি করেনি সে। শুধু চিতোর কেন, অবন্তী, সুন্দর, দেবগড়, আনহলবারা প্রভৃতি জায়গার সমস্ত গৌরবের চিহ্নও সে নির্মমভাবে মুছে দিয়েছিল।

এই সময়ে রাঠোর ও অম্বরের কচ্ছবাহরা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। রাঠোররা তখন পুরীহরদের সামন্ত-রাজা।

মিবারের পূর্ব দিকে আরাবল্লি পাহাড়ের মাঝখানে শিরো নামে এক উপতাকা প্রদেশ। তারই মাথার ওপরে কৈলাবারে বসবাসকালে অজয় সিংহ চিতোর উদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি। তবে কিছুকাল পরে অজয়সিংহর অগ্রজ অরিসিংহর জ্যেষ্ঠ পুত্র হামির মুসলমান কবল থেকে চিতোর উদ্ধার করে নিয়েছিল। হামিরের জন্ম ও শৈশবলীলা সম্বন্ধে এক কিংবন্তী আছে।

একদিন অরিসিংহ সদলবলে মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি বরাহকে লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে এক জনার খেতের ভিতরে ঢুকে দেখতে পেল, অপরূপ এক কালো মেয়ে খেতের মধ্যে এক উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে পশুপাখি তাড়াচ্ছে। সামনে আসতেই মেয়েটি রাজাকে বললে, 'আমি ঐ বরাহ ধরে দিতে পারি।'

মেয়েটির কথায় বিস্মিত হল রাণা। একটি জনারের গাছ উপড়ে নিয়ে, ছুরি দিয়ে তার ডগাটা বর্শার মত তীক্ষ্ণ করে বরাহটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে গেঁথে ফেলল মেয়েটি। তার এই অসাধারণ দক্ষতায় হতবাক হয়ে গেল অরিসিংহ।

মৃগয়া শেষ করে জনার ক্ষেত থেকে অনেকটা দূরে বনের মধ্যে এক জলাশয়ের ধারে বিশ্রাম করছিল রাজা অরিসিংহ। হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড মাটির ঢেলা এসে আঘাত করল অরিসিংহের ঘোড়ার পায়ে। চমকে উঠল সবাই। এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল সেই কালো মেয়েটি। বিনীত ভাবে ক্ষমা চেয়ে বললে, পাখি তাড়াতে গিয়ে মাটির ঢেলাটা ছুঁড়েছিল সে। ঐ রকম বড় একটা মাটির ঢেলা অতদূর থেকে কি করে এতদূর পর্যন্ত ছুঁড়ে পাঠানো যেতে পারে ভেবে পেল না তারা।

বিশ্রামের পর অরিসিংহ এবং তার সহচররা যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, দেখা গেল, সেই কৃষ্ণকন্যাটি মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড দুধের হাড়ি চাপিয়ে দুটো মোষকে অনায়াসে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। রাণার সহচরদের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠল। দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে এসে কালো-মেয়ের দেহে ধাক্কা দিল একজন। মেয়েটি বুঝল, তার সঙ্গে কৌতুক করছে রাজসহচর। মোষের দড়ি তার ঘোড়ার পায়ে এমনভাবে জড়িয়ে দিল যে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া শুদ্ধ রাজ-বয়স্য কুপকাৎ। হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

খবর নিয়ে অরিসিংহ জানল, সেই বীর্যবতী চৌহান শাখা চন্দানো বংশের এক দরিদ্র রাজপুত কৃষক দুহিতা। পরদিন অরিসিংহ আবার এল মেয়েটির কাছে। তার বাবাকে ডাকিয়ে এনে তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করল সে। বৃদ্ধ কিন্তু রাজী হল না। বিমর্ষ হয়ে ফিরে এল অরিসিংহ।

এদিকে বৃদ্ধ পিতার এই প্রত্যাখ্যান শুনে মেয়ের মা মাথায় হাত দিল। মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে অরিসিংহের হাতে সঁপে দিল তারা। এই কন্যার গর্ভেই অরিসিংহের পুত্র হামিরের জন্ম হয়।

যে সময়ে আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করে, হামির তখন মাতামহর কাছে বাস করছিল। হামিরের বয়স তখন মাত্র বারো বৎসর। চিতোর পুনরাধিকার অভিযানে অজয়সিংহ ব্যর্থ হল। তার প্রধান কারণ পার্বত্য সর্দাররা অজয়সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এদের মধ্যে মুঞ্জ নামে এক দুর্দ্ধর্ষ সর্দারের সঙ্গে যুদ্ধকালে অজয়সিংহ মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিল। অজয়সিংহের দুই নাবালক পুত্র আজিম ও সুজন পিতার এই বিপদে কোন সাহায্য করতে পারেনি। কিন্তু হামির ছুটে এল কাকার কাছে। শপথ করল, 'যদি মুঞ্জর মাথা কেটে এনে কাকার পায়ের তলায় ফেলতে না পারি তবে আর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসব না আমি।'

রাজপুত বীর-কুমার অসাধারণ বিক্রমে মুঞ্জকে নিহত করে তার মাথা কেটে এনে কাকাকে নিবেদন করল। হামিরের ললাটে ছিন্নমস্তকের রক্ত

তিলক পরিয়ে দিল অজয়সিংহ। নিজের পুত্রদের রাজ্যলাভের সব সম্ভাবনা এখানেই শেষ হয়ে গেল। দুশ্চিন্তায় আজিম দেহত্যাগ করল। গৃহ বিবাদ এড়াবার জন্যেই সুজন দাক্ষিণাত্যে গিয়ে এক নতুন রাজ্য গড়ে তুলল। কালে তার বংশধররা এত বিক্রমশালী হয়ে উঠেছিল যে তাদের প্রবল পরাক্রমে এক সময়ে সারা ভারত তথা দিল্লীর মসনদ পর্যন্ত থরথর করে কাঁপত। মুসলমান নিধন যজ্ঞের হোতা শিবাজীর জন্ম এই বংশে।

প্রাচীন কাল থেকেই রাজপুত রাজাদের মধ্যে টীকাডোর প্রথা প্রচলিত ছিল। অভিষেকের দিন রাজতিলক ললাটে ধারণ করে নতুন রাজা কাছাকাছি কোন এক শত্রুরাজ্য আক্রমণ করে সর্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে আসত। কাছে কোন শত্রু না থাকলেও কৌতুক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এই প্রথা সম্পন্ন করা হত। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে হামির সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে টীকাডোর ব্রতের অনুষ্ঠান করেছিল। হামিরের ৬৪ বৎসর রাজত্ব কালে শত্রু হাতে যে সব ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল তার প্রায় সবই সে পূরণ করেছিল।

হামির যখন চিতোর উদ্ধারে ব্রতী হয়েছে, মুসলমানরা তখন মালদেবকে চিতোরের সিংহাসনে বসিয়েছিল। হামিরের সেনাবল সামান্য, সুতরাং নগরগুলো আক্রমণ না করে প্রথমে সে প্রজাদের মধ্যে প্রচার কার্য শুরু করল। যারা তার প্রভুত্ব চায় তাদের পশ্চিম দিকের পার্বত্য প্রদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিল সে। হামিরের আদেশে প্রজারা কৈলাবার পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল। কৈলাবার নগরে রাজধানী স্থাপন করল হামির। এই জায়গাটি সমতল ভূমি থেকে বার শো ফুট এবং সমুদ্রতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। খুব কম করে হলেও প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী এর আয়তন। যারা সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল হামিরকে তারা প্রায় সকলেই ভীল। কৈলাবার নগরে এক প্রকাণ্ড সরোবর এবং তার তীরে এক প্রকাণ্ড উঁচু দেবীমন্দির তৈরি করেছিল হামির। আজও সেই সরোবরটি 'হামির তালাও' নামে খ্যাত হয়ে আছে। পরে হামিরের বংশধররা এই পাহাড়ের মাথায় কমলমীর নামে আর একটি নগর গড়ে তুলেছিল।

যখন চিতোর উদ্ধারের চিন্তায় হামির মগ্ন সেই সময় হঠাৎ মালদেব তার কন্যার সঙ্গে হামিরের বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠাল। শত্রু-করে কন্যা সম্প্রদান বিস্ময়কর। তবুও এক কথায় রাজী হয়ে গেল হামির মালদেবের প্রস্তাবে।

মাত্র পাঁচ শো অশ্বারোহী নিয়ে বরযাত্রীদের সঙ্গে রাণা এসে উপস্থিত হল বিবাহ-বাসর চিতোরে। হামিরের মনে সন্দেহের ঝড় উঠল। রাজপুত প্রথামত বিবাহতোরণ সাজানো হয়নি। কিন্তু কেন? যাইহোক, তার মনের চাঞ্চল্য কাউকে বুঝতে দিল না সে।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে পেঁ ছিনমাত্র মালদেব, রণবীর এবং অন্যান্য রাজপুত-বীররা করযোড়ে স্বাগত জানাল হামিরকে। যথাকালে এক দীন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিয়ের ব্যাপার চুকে গেল। সন্দেহের কালোছায়া ভীষণ পীড়িত করে তুলল হামিরকে। বাসর ঘরে স্ত্রীর মুখ থেকে জানতে পারল, নববধূ বালবিধবা। বাল্যকালে ভট্টিবংশের এক সৈন্যর সঙ্গে তার নাকি বিয়ে হয়েছিল। আজ সেকথা তার আদৌ স্মরণ নেই। এই কারণে তার বাবা গোপনে আবার তার বিয়ে দিল। এবং শুধু এই জন্যেই কোন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ বা সমারোহ করা হয়নি।

নববধূর সরলতা এবং অনুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ-বাসরে কোন অনর্থ বাধাল না হামির। স্ত্রীর পরামর্শ মত যথাসময়ে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সেদিন চুপ করে রইল সে।

মেহতা বংশের জাল নামে এক বিচক্ষণ কর্মচারী ছিল চিতোরে। স্ত্রীর পরামর্শে ঐ কর্মচারীটিকে চেয়ে নিল মালদেবের কাছ থেকে।

মালদেবের কন্যার গর্ভে হামিরের পুত্র ক্ষেত্রসিংহর জন্ম হয়। দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে মালদেব তার অধিকৃত সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ হামিরকে যৌতুক দিয়ে দিল। ক্ষেত্রসিংহর যখন দু'বৎসর বয়স তখন গণকরা বললে, 'রাজকুমারের ওপর অধিষ্ঠাতৃ-দেব ক্ষেত্রপালের রোষদৃষ্টি পড়েছে। পুত্রের জীবন-সংশয় বিপদ। দেবতার ক্রোধ প্রশমিত না হলে কুমারের মঙ্গল নেই।' চিতোরে ক্ষেত্রপালদেব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সপুত্র

চিতোরে ত্রসে দেবতার আরাধনা করার ইচ্ছা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মালদেব কন্যা ও দৌহিত্রকে সসম্মানে চিতোরে নিয়ে এল। চিতোরে এসে মালদেবকন্যা জানতে পারল, মাদেরিয়ায় মীনদের বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে গেছে তার বাবা। জাল তার সঙ্গেই ছিল। তার পরামর্শে চিতোরের বীরদের বশীভূত করে ফেলল সে। এদিকে হামিরও সসৈন্য আক্রমণ করল চিতোর। সামান্য কিছু মালদেবের দলের যোদ্ধা তার পথ অবশ্য ক্ষণকালের জন্যে রোধ করেছিল, কিন্তু হামিরের প্রবল বিক্রম বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেনি তারা। পৈত্রিক সিংহাসন অধিকার করে বসল হামির। মালদেব ফিরে, এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে দিল্লীতে রওনা হল, আলাউদ্দিনকে খবর দেবার জন্যে। মালদেবের কাছে খবর পাওয়া-মাত্র মহম্মদ খিলজী চিতোর আক্রমণের জন্যে সসৈন্য অভিযান করল। কিন্তু যে-পথ দিয়ে মহম্মদ মিবারে প্রবেশ করেছিল তা ভয়ঙ্কর দুর্গম গিরিপথ। সৈন্যরা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। শিঙ্গোলি নামে এক জায়গায় তাবু গাড়ল তারা। সুযোগ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আক্রমণ করল হামির। রণবীরের ছোট ভাই হরিসিংহ হামিরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে নিহত হল। এরপর মহম্মদও হামিরের মহাবিক্রম সহ্য করতে পারল না। প্রায় বেশীর ভাগ মুসলমান সেনাই নিহত হল, বাকী কিছু পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। মহম্মদকে বন্দী করে চিতোরের কারাগারে রাখা হল। তিন মাস কেটে গেল। শপথ করল মহম্মদ, যতদিন সে জীবিত থাকবে, চিতোর দুর্গ আক্রমণ দূরে থাক তার আশেপাশের রাজ্যেরও ছায়া মাড়াবে না সে। নজরানা হিসেবে আজমীর, রন্থনবোর, নাগোর ও শুবোপুর রাজ্য এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও একশ হাতী দিল সে হামিরকে।

এদিকে মারবার, জয়পুর, বুন্দি, গোয়ালিয়র, শিক্রি, অর্বুদ, কল্পি, চন্দেরি, বৈঘিণি প্রভৃতি রাজ্য গুলোও চিতোর রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নিল। মোটকথা, সে সময় ভারতে হামিরের সমকক্ষ রাজা আর দ্বিতীয় ছিল না। মিবারের আগেকারে স্বাধীনতা এবং গৌরব আবার ফিরিয়ে আনল হামির।

মালদেবের সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন তার পুত্র বনবীর এসে হামিরের শরণাপন্ন হয়েছিল। শ্বশুরকুলের গৌরব ও সম্মান যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে বনবীরকে নিমচ, জীরন, রতনপুর ও কৈয়র প্রদেশের পাট্টা লিখে দিল সে।

হামিরের পর দু'শো বছর ধরে পর্যায়ক্রমে যে সব রাজারা চিতোরের সিংহাসনে রাজত্ব করেছিল তাদের সকলেই মুসলমান আক্রমণ থেকে মিবারকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

বহুদিন পরে দিল্লীর সিংহাসনলোভে খিলজী, লোদী ও শূর-বংশের মুসলমানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সুযোগে মিবারকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পেরেছিল হামির।

হামিরের মৃত্যুর পর ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ক্ষেত্রসিংহ রাজা হল। বাবার প্রায় সবগুলো সদগুণই পেয়েছিল ক্ষেত্রসিংহ। মণ্ডলগড়, দাশের ও চপ্পন প্রদেশ জয় করে চিতোরের সীমারেখা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের সঙ্গে বাকরোল নামে এক জায়গায় ক্ষেত্রসিংহর একটি ছোটখাটো যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে ক্ষেত্রসিংহরই জয় হয়। বুনোদারহার বংশের এক সামন্ত রাজার মেয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রসিংহর বিয়ের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু বিয়ে উপলক্ষে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হল তার ফলে এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অকালে ঝরে যায় ক্ষেত্রসিংহের অমূল্য জীবন।

ক্ষেত্রসিংহর মৃত্যুর পর ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে তার পুত্র লক্ষসিংহ চিতোরের সিংহাসনে বসেই মারবারের এক পার্বত্য দুর্গ বিরাটগড় অধিকার করে নিল। তার রোষে বিরাটনগর ধ্বংস হয়ে গেল। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর বেদেনার দুর্গ তৈরি করল সে। ক্ষেত্রসিংহ ভীলদের চপ্পন প্রদেশ জয় করেছিল। এখানে টিন ও রূপোর খনি আবিষ্কার করল রাণা লক্ষসিংহ। তার প্রতাপ, বিক্রম ও কীর্তি আজও মিবারের সকলের মুখে মুখে ফেরে। আলাউদ্দিনের নৃশংসতায় চিতোরের শ্রী একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাণা লক্ষসিংহই সে গুলোর সংস্কার করে আবার চিতোরকে মর্তের ইন্দ্রলোক বানিয়ে তুলেছিল।

মহম্মদশাহ লোদীর বিরুদ্ধে লক্ষসিংহ যে যুদ্ধাভিযান করেছিল তাতে রাণারই জয় হয়। অম্বরের নগরাচলবাসী রাজপুতরাও লক্ষসিংহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু গয়াভূমি উদ্ধারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষসিংহর পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধেই নিহত হয় সে।

লক্ষসিংহর মৃত্যুর পর তার ছোটছেলে মুকুল সিংহাসনে বসল! জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ড কেন রাজা হল না সে-কাহিনী পরে বলা হয়েছে। রাণা লক্ষসিংহর আরও অনেকগুলো সন্তান ছিল। ঘুনাবৎ ও তুলাবৎ সর্দারেরা তার বংশধর বলে পবিচয় দেয়। কালোরবাসী সারঙ্গদেব সর্দারেরাও লক্ষের বংশের শাখা-প্রশাখা।

৫

চণ্ডরাণা লক্ষসিংহর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ধর্মানুসারে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে। কিন্তু চণ্ডকে সিংহাসনে না বসিয়ে ছোট ছেলে মুকুলকে কেন বসানো হল সে এক অভিনব ইতিহাস।

একদিন বৃদ্ধ রাণা লক্ষসিংহ পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় বসে আছে, এমন সময় মারবার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে নারকেল ফল হাতে উপস্থিত হল রাজদূত। চণ্ড তখন রাজসভায় উপস্থিত ছিল না। সে এলে এ বিষয়ে মতামত দেবে বলে রাজদূতের সঙ্গে লঘু রসালাপ করছিল রাণা। কথা প্রসঙ্গে বললে, 'আমার মত বুড়ো রাজার জন্যে বোধ হয় কোন নারকেল ফল পাঠানো হয় নি।'

রাণার এই রসিকতায় সবাই হেসে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাজকুমার চণ্ড প্রবেশ করল রাজসভায়। পরিহাস ছলেও পিতা নিমেষের জন্যে যে সম্বন্ধ নিজের জন্যে মনে ঠাঁই দিয়েছে যে সম্বন্ধ গ্রহণ করা উপযুক্ত পুত্রের পক্ষে অসম্ভব, চণ্ড ভাবল। এ বিয়ে সে করবে না বলে প্রকাশ্য রাজসভায় রাণাকে জানিয়ে দিল। উভয় সংকটে পড়ল রাণা। নারকেল

ফল গ্রহণ না করলে মারবার রাজের অবমাননা হয়। অথচ পুত্র চণ্ডর এই প্রতিজ্ঞা। কি করেই বা গ্রহণ করা যায়, চিন্তায় বিমর্ষ হল সে। শেষে কোন উপায় না দেখে নিজেই সে-ফল গ্রহণ করল রাণা। ইচ্ছে ছিল, শেষ বয়সে পুত্রের উপর রাজ্য-ভার দিয়ে তীর্থধর্ম করে বেড়াবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আবার তাকে সংসারজালে জড়িয়ে পড়তে হল। চণ্ডকে বারবার অনুরোধ করা সত্বেও যখন তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইল তখন তার ওপর রুষ্ট হয়ে রাণা বললে, 'মারবার দুহিতার গর্ভে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান হয় তবে সেই সিংহাসনে বসবে, আর তুমি হয়ে থাকবে তার প্রধান সামন্ত, এই আমার নির্দেশ।'

চণ্ড রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করে নিল হাসি মুখে। যথা কালে মারবার-রাজকুলনারীর গর্ভে লক্ষসিংহের এক পুত্র হল। তার নাম মুকুলজী। মুকুলের বয়স যখন মাত্র পাঁচ তখন শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, চণ্ডকে তার রাজ্য দেখাশোনার দায়িত্ব চাপিয়ে লক্ষসিংহ ধর্মান্বেষণে তীর্থবাসী হল।

কিভাবে রাজ্যের উন্নতি হবে, কিভাবে কনিষ্ঠের মঙ্গল হবে সব সময় এই চিন্তায় চণ্ড মগ্ন। দেশের প্রজারা চণ্ডর ত্যাগ ও মহত্ব দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

সাধারণত নাবালক পুত্র সিংহাসনে বসলে তার জননীই রাজকার্য পরিচালনার দাযিত্ব গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষসিংহ সে-দায়িত্ব চণ্ডকে দিয়ে যাওয়ায় রাজমাতা ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল। কি করে চণ্ডকে এ পদ থেকে সরানো যায় সেই চিন্তায়, সব সময় তার দোষত্রুটি ধরার জন্যে, উন্মুখ হয়ে রইল সে। সবই বুঝতে পারল চণ্ড। কুচক্রী নারীর চক্রান্তের শেষ নাই। কে জানে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জঘন্যতম উপায়ও সে অবলম্বন করতে পারে! তার চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্কের কালিও হয়তো সে লেপে দিতে দ্বিধা করবে না, এই আশঙ্কায় চণ্ড চিতোর ত্যাগ করে মান্দুরাজ্যে চলে গেল। বিমাতাকে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় দুটিমাত্র কথা তাকে বলে গিয়েছিল সে। 'শিশোদীয় বংশের মর্যাদা যেন নষ্ট না হয়, এবং কোন কাজ শুরু করার আগেই যেন তার পরিণাম চিন্তা করা হয়।'

মুকুলের শুভ কামনা করে সজল নয়নে চণ্ড বললে, 'আজ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, হয়তো এমন একদিন খুব শিগ্রই আসবে যেদিন এই চণ্ডর জন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।'

চণ্ডর বীরত্ব ও অন্যান্য গুণে মুগ্ধ হয়ে মান্দুরাজ তাকে হল্লার প্রদেশ দান করে দিল বৃত্তি হিসেবে।

মুকুলজননীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। সে চেয়েছিল, চণ্ডকে চিতোর থেকে সরিয়ে, তার বাপের বাড়ির আত্মীয় স্বজন এনে চিতোরপুরী ভরে ফেলবে। তার একাধিপত্যে চিতোর শাসিত হবে। মুকুলের মাতামহ রণমল্ল, মাতুল যোধ এবং অসংখ্য মুন্দরবাসী আত্মীয়েরা নিজেদের রাজ্য ছেড়ে চিতোরে এসে রাজজননীকে ঘিরে বসল।

নিজের রাজ্য ছেড়ে কেন এসে চিতোরে গেড়ে বসল রাজা রণমল্ল, সে কথা চিতোরের এক প্রাচীন ধাত্রী ছাড়া আর কেউই অনুধাবন করতে পারে নি সেদিন।

দৌহিত্রকে কোলে নিয়ে বাপ্পার সিংহাসনে আরোহণ করত রণমল্ল। খেলার নেশায় মুকুল সিংহাসন থেকে নেমে এদিক ওদিকে ছুটে বেড়াত। মিবারের রাজছত্র সে-সময় শুধু রণমল্লর মাথাতেই ধরা থাকত। রণমল্লর এই অভিসন্ধি যে কেউই বুঝতে পারত না তা না, কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলার সাহস ছিল না কারো। কিন্তু মুকুলের লালন পালন রতা বৃদ্ধা ধাত্রী রণমল্লর দুষ্ট অভিসন্ধির কথা মুকুল জননীকে জানাতে দ্বিধা করল না।

রণমল্ল পিতা। পিতা হয়ে কন্যার সর্বনাশ করবে একথা কোন কন্যা বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু বিশ্বাস না করলেও গোপনে গোপনে পিতা রণমল্লর আচার আচরণ লক্ষ্য করতে লাগল সে। শেষে রাজমাতা গুপ্ত তথ্য জানতে পারল। রণমল্ল রাজকুমারকে হত্যা করে চিতোর সিংহাসন অধিকার করার ষড়যন্ত্র করছে। তখন যারা চিতোরের দায়িত্বশীল পদে সবাই তারা রণমল্লর দলের। এদের চক্রান্ত থেকে মুকুলকে এবং চিতোরকে কি উপায়ে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়ল রাজজননী। সারা চিতোরে এমন একজন পরামর্শদাতাও সে খুঁজে পেল না

যে মুকুলের জীবন রক্ষার জন্যে কোন পথ বাতলে দিতে পারে।

এদিকে আর এক দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। চণ্ডর অন্য এক সহোদর রঘুদেব কৈলাবারায় বাস করছিল। রণমল্লর চক্রান্তে একদিন নিহত হল সে। রূপে, গুণে, ধর্মে, বীরত্বে রঘুদেবের তুল্য ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। লোকে তাকে এত ভালবাসত যে, মৃত্যুর পর তার প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঘরে ঘরে পুজো হতে লাগল। সেই থেকে আজও রাজপুতানা বাসীরা দেব সম্ভ্রমে রঘুনাথদেবের পুজো করে আসছে।

কোন উপায় ঠিক করতে না পেরে মুকুলজননী চণ্ডর কাছে খবর পাঠাল। শিশোদীয় বংশের মর্যাদা ও মুকুলের প্রাণ-রক্ষার ডাকে চণ্ড সাড়া না দিয়ে পারল না।

চিতোর থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় চণ্ডর সঙ্গে দুশো ভীল রক্ষক এসেছিল। তাদের আত্মীয় স্বজনরা ছিল চিতোরেই। তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ছলে আবার তাদের চিতোরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল চণ্ড। রাজজননীকে জানাল, এদের সকলকে যেন দ্বাররক্ষীদের পরিচর্যার কাজে নিযুক্ত করা হয়। এবং আরও জানাল, চিতোরের কাছাকাছি গ্রামবাসীদের অন্নদানের উদ্দেশ্যে মুকুল যেন প্রতিদিন এক একটি গ্রামে গিয়ে অন্নদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। এই ভাবে দেয়ালীর দিন গোসুন্দ নগরে উপস্থিত হলেই মুকুলের বিপদ কেটে যাবে।

নির্দিষ্ট দিনে মুকুল কতকগুলো বিশ্বস্ত রক্ষী সহ গোসুন্দ নগরে উপস্থিত হল। সেদিন গ্রামবাসীদের অন্নদানের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবেই সারা হল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, কিন্তু চণ্ডর দেখা নেই।

অবশেষে হতাশ হয়ে তারা আবার চিতোরে ফিরে আসতে লাগল। কিছুদূর আসার পর এক দল অশ্বরোহী এসে মুকুলের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হল। দ্বাররক্ষীরা পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল, 'আমরা এখানেই বাস করি, চিতোর রাজ্যের অধীনস্থ সর্দার। গোসুন্দের মহোৎসবে এসে ছিলাম। রাত্রি হয়েছে, রাজকুমারকে প্রাসাদে এগিয়ে দেবার জন্যে তার সঙ্গে এসেছি।'

সে কথায় কেউই সন্দেহ করল না। অবাধে অশ্বারোহীরা নগর মধ্যে প্রবেশ করল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মহাবিক্রমশালী চণ্ড শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে ছদ্মবেশী ভীলরাও দ্বাররক্ষীদের হত্যা করতে শুরু করল। যুদ্ধে চণ্ডর প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করার মত বীর চিতোরে দ্বিতীয় ছিলনা। তার সামনে যে আসতে লাগল সেই নিহত হল।

এদিকে যে রণমল্লর সাঙ্গপাঙ্গ-নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে সে কথা নারী-মাংস লোভী, মাতাল রণমল্লর কানে পৌঁছল না তখন। মুকুল জননীর পরমরূপবতী এক সহচরী ছিল। পাষণ্ড রণমল্ল জৈব ক্ষুধার তাড়নায় মত্তাবস্থায় সেই রূপসীকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে তখন সুখ সম্ভোগে মত্ত ছিল। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই চণ্ডর অনুচরেরা সে ঘরে প্রবেশ করে দুরাচার রণমল্লকে হত্যা করল। রণমল্লর পুত্র যোধরাও নগরের অন্যদিকে বাস করছিল, পিতার মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে অন্যত্র পালিয়ে আত্ম-রক্ষা করল। তাকে ধরার জন্যে মুন্দরে ধাওয়া করল চণ্ড। নিরুপায় হয়ে যোধরাও মুন্দর ছেড়ে পালিয়ে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রইল। মুন্দর অধিকার করে চণ্ডর পুত্র কণ্ঠজী ও মুঞ্জজীকে শাসন ভার দেওয়া হল।

রাজপুতানার এক প্রান্তে সদাব্রত সম্প্রদায়ের হরবাশঙ্কল নামে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয় নিল যোধরাও। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা আশ্রয় প্রার্থী পরম শত্রুকেও সাদরে আশ্রয় দিয়ে থাকে। শুধু তাই না, নিজের জীবন উৎসর্গ করেও তাকে রক্ষার চেষ্টা করে তারা। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে এবং যোধরাওএর অধ্যবসায়ের জোরে যোধপুর নগরের প্রতিষ্ঠা করেছিল সে। সিন্ধু-সৈকত থেকে যমুনা, শতদ্রু তীর থেকে আরাবল্লী পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করেছিল যোধরাও।

সন্ন্যাসীর চেষ্টায় মিবোরাজের কাছ থেকে একশো অশ্ব ও পবনজী নামে এক স্বাধীন সর্দারের সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যোধরাও মুন্দর আক্রমণ করল। এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না কণ্ঠজী ও মুঞ্জজী। শিশোদীয় সৈন্যরা যোধসৈন্যর কাছে টিকতে পারল না। অবশেষে প্রচণ্ড বিক্রমে কণ্ঠজী শত্রু সৈন্যর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু

কিছুক্ষণের মধ্যেই যোধ রাওএর সৈন্যর হাতে নিহত হল সে। দাদার মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র ঘোড়া ছুটিয়ে মুন্দর রাজ্যের বাইরে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল মুঞ্জজী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। যোধ সৈন্যরা তাকে গাধবার সীমার কাছে ধরে নির্মম ভাবে হত্যা করল।

মুন্দর রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেল। উপযুক্ত পুত্র দুটিও শত্রু সৈন্যর হাতে নিহত। চণ্ড নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। হীনবল যোধরাও চণ্ডর বিক্রমের সামনে কোনক্রমেই টিকতে পারবে না ভেবে এক সন্ধি প্রার্থনা করল চণ্ডর কাছে। এ প্রস্তাবে রাজি হল চণ্ড। সন্ধির সর্তে ঠিক হল, যে জায়গায় মুঞ্জজীর মৃত্যু হয়েছে, ভবিষ্যতে মিবার এবং মারবারের সীমারেখা হবে সেখানে। এ ছাড়া চণ্ডকে মুণ্ডকাটি দিল যোধ। সন্ধির সময় হত্যাকারী নিহতের পক্ষকে ক্ষতিপূরণ সরূপ যে ভূমি বা ধনরত্নাদি দিয়ে আপোশ করে তাকে রাজস্থানের চলতি কথায় মুণ্ডকাটি বলে।

এই সন্ধির সর্ত অনুসারে পুরো গাধবার প্রদেশ মিবার রাজ্যের মধ্যে এসে গিয়েছিল। প্রায় এক শো বছর ধরে শিশোদীয়েরা নির্বিবাদে ভোগ-দখলও করেছিল। পরে অবশ্য রাঠোররা আবার তা অধিকার করে নেয়।

কিছুদিন বাদেই মুকুল গুপ্ত-ঘাতকের হাতে নিহত হল। এতে মাররার রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন না এই হত্যাকারীর শাস্তি হয়, এবং মুকুলের শিশুপুত্র চিতোরের সিংহাসনে বসে ততদিন মাথায় উষ্ণীষ পরবে না সে।

চণ্ডর আত্মত্যাগের জন্যে মুকুল শৈশবে সিংহাসন লাভ করেছিল। কিন্তু বেশী দিন রাজ্য ভোগের সৌভাগ্য হয় নি তার। মুকুলের রাজত্বকালে দিল্লীর সম্রাট ছিল ফিরোজ শাহর এক পৌত্র। এই সময় তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করে। তৈমুরের বিক্রম সহ্য করতে না পেরে গুর্জরের দিকে পালাতে থাকে সে। গুর্জরে যাওয়ার পথে একবার সে চিতোর আক্রমণের চেষ্টা করেছিল। গোপন সূত্রে এ সংবাদ শোনামাত্র সসৈন্যে এগিয়ে গিয়ে আরাবল্লীর কাছে রায়পুরে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করল মুকুল। সে যুদ্ধে জয় হল তারই। শম্ভর প্রদেশ ও তার লবণ হ্রদগুলো রাণার অধিকারে

চলে এল। মুকুলের পিতা লক্ষরাণা এক বিরাট প্রাসাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে মারা গিয়েছিল। পিতার এই আরব্ধ কাজ শেষ করেছিল মুকুল। চিতোরের পশ্চিমে এক পাহাড়ের রেঞ্জ আছে, তার মাঝখানে চতুর্ভুজা ভগবতীর এক মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল সে।

মুকুলের তিন পুত্র, এক কন্যা। অসামান্য রূপবতী কন্যা লালবাঈকে গাগরৌণের খীচিরাজপুত্র ধীরাজের হাতে সমর্পণ করেছিল মুকুল। কন্যা সম্প্রদানের সময় কথা দিয়েছিল সে, ধীরাজের রাজ্য আক্রান্ত হলে তাকে সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করবে। কিছুদিন বাদে মালরাজ সোহাও গাগরৌণ আক্রমণ করল। এদিকে পাহাড়ী প্রজারা বিদ্রোহ করায় মুকুল মাদেরিয়ায় থেকে প্রজাদের বিদ্রোহ দমন করছিল। এজন্যে নিজে যেতে পারল না, কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিল জামাতার সাহায্যের জন্যে। এই মাদেরিয়া থেকে মুকুল আর চিতোরে ফিরে আসতে পারেনি।

সূত্রধর বংশের এক সুন্দরী পরিচারিকার গর্ভে মুকুলের পিতামহ ক্ষেত্র সিংহর দুটি পুত্র জন্মে, চাচা ও মৈর। রাণা মুকুল এই দুই কাকাকে মাদেরিয়ার যুদ্ধে সাতশো অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিল। দাসীপুত্রদের এই উচুঁ পদ দেওয়ায় অন্যান্য সৈন্যরা ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগল। এক দিন রাণা সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে মাদেরিয়ায় এক কুঞ্জবনে বসে ছিল, এক সময় কথা প্রসঙ্গে রাণা একটি গাছকে দেখিয়ে তার নাম জানতে চাইল। রাণার পাশেই একজন চৌহান-সামন্ত ছিল। ফিসফিস করে সে বললে, 'আপনার কাকাদের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলতে পারবে! চৌহান-সামন্তর কথার ব্যঙ্গ ধরতে না পেরে রাণা চাচাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কাকা, এই গাছটির নাম কি?'

মুকুলের প্রশ্ন শোনা মাত্র চাচা ও মৈরর চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল। তারা ভাবল, সূত্রধর কন্যার গর্ভজাত বলেই রাণা তাদের উপহাস করল। রাণার কথার কোন উত্তর না দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রইল তারা। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা রাণা মুকুল যখন ধ্যানে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করছে, এমন সময় পিছন দিকথেকে এসে চাচা ও মৈর তরবারির আঘাতে মুকুলকে হত্যা করল।

শুধু মুকুলকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হলনা, তার রাজ্য অধিকার করার জন্যে চিতেরের দিকে ছুটল। কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হল না। চিতোর দুর্গে প্রবেশ করতে পারল না। সে সময় মুকুলের নাবালক পুত্র কেন যে চিতোরের তোরণ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তার কারণ জানা যায়নি। অবশেষে হতাশ হয়ে চাচা ও মৈর মাদেরিয়ার দুর্গে আশ্রয় নিল। মারবারের রাজা হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সসৈন্য মাদেরিয়ায় এসে উপস্থিত হল। প্রাণ ভয়ে পায়ী নামে এক জায়গায় পালিয়ে গেল চাচা ও মৈর। সেখানে রাতকোট নামে এক পাহাড়ের চূড়ায় এক দুর্গ তৈরি করে বাস করতে লাগল। সুজা নামে চৌহান বংশের এক ব্যক্তির কন্যাকে এরা চুরি করে এনেছিল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুজা রাতকোটের কর্মকারদের সাহায্যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সমস্ত পথ চিনে নিয়ে ফিরছে, এমন সময় রাণা কুম্ভ ও রাঠোর রাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। সুজার কাছে সমস্ত শুনে তাকে সঙ্গে নিয়ে এক রাতে রাতকোটের দুর্গে অভিযান করল তারা।

একে দুর্গম পাহাড়ী পথ, তায় ঘোর তমসাবৃত রাত্রি। খুব সন্তর্পণে একে অন্যের হাত ধরে পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল তারা। কিছুদূর যেতে না যেতেই এক ভয়ঙ্কর বাঘের জ্বলন্ত চোখের জ্যোতি এসে পড়ল তাদের ওপর। তরবারির আঘাতে বাঘটিকে হত্যা করল রাঠোর রাজ। পথের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা সুলক্ষণ বলে বিশ্বাস করে রাজপুতরা। দ্বিগুণ উৎসাহে তারা পাহাড়ের মাথায় উঠতে লাগল। যুদ্ধের সময় একজন ভট্ট-কবি সঙ্গে থাকে রাজপুত সেনার। জয় ঘোষণা করে উৎসাহ দেওয়াই তাদের কাজ। ওদের গলায় একটি ছোট ঢোলক ঝুলতে থাকে। যুদ্ধে জয় হলে ঢোলকটি বাজিয়ে বাজিয়ে সকলকে তা জানিয়ে দেয় সে। রাতকোট দুর্গে অভিযানের সময়েও এক ভট্ট-কবি সঙ্গে ছিল। অন্ধকারে বুঝতে না পেরে দুর্গের সামনে খালের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল বেচারা। অমনি তার গলার ঢোলক সশব্দে বেজে উঠল। রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে রণবাদ্য বেজে ওঠা মাত্র চাচার কন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চাচা তাকে

সান্ত্বনা দিতে লাগল, 'কোন ভয় নেই মা, ঘুমোও। বর্ষার রাত, মেঘের ডাক ছাড়া ও কিছু না। এখানে শত্রু আসবে কি করে। আমরা শত্রুর নাগালের অনেক বাইরে। তুমি ঘুমোও।'

চাচার কথা শেষ হতে না হতেই সদলবলে রাঠোর রাজকুমার ওদের দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়ল। সুজার তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল চাচার দেহ। আর মৈর প্রাণ হারাল রাঠোর রাজকুমারের হাতে।

৬

মারবার রাজের সহযোগিতায় রাণা কুম্ভ ১২১৯ খৃষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করল। তার সুশাসনে প্রজারা সুখে শান্তিতে দিন-কাটাতে লাগল। রাণা কুম্ভর অনেকগুলো কীর্তিচিহ্ন আজও মিবারে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার রাজত্ব কালে কতকগুলো বিস্ময়কর ঘটনা তাকে অন্য সব রাজা থেকে আলাদা করে রেখেছে।

খিলজী রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর প্রভাব নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। এই সুযোগে বিজয়পুর, নলখন্দ, মালব, গুর্জর, জৌনপুর, কল্পী প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। চিতোর জেগে উঠেছে দেখে মালব ও গুর্জর রাজা হিংসায় জ্বলে উঠল। ১২২০ খৃষ্টাব্দে তারা চিতোর আক্রমণ করল বটে, কিন্তু রাণা কুম্ভর বীরত্বের সামনে টিকতে পারল না। মালবের খিলজী বাদশাহ মহম্মদকে বন্দী করে চিতোরে নিয়ে আসা হল। ছয় মাস কারাবাসের পর, দয়া করে মহম্মদকে ছেড়ে দিয়েছিল রাণা কুম্ভ। পরাজিত শত্রুর ওপর দয়া দেখানো হিন্দু বীরদের এক প্রধান ধর্ম। মহম্মদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে রাণা এক কপর্দকও গ্রহণ করে নি। উপরন্তু, নানা উপহারে সম্মানিত করে তাকে তার রাজ্যে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল সে।

মহম্মদের রাজমুকুট ও কতকগুলো ব্যবহারের জিনিষ চিতোরে বহুদিন সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল। পরে রাণা সঙ্গ ঐ রাজমুকুট উপহার দিয়েছিল বাবরকে। মহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর থেকে শুরু করে এগারো বছর ধরে এক বিজয়স্তম্ভ তৈরি করেছিল রাণা কুম্ভ। এছাড়া নাগোর রাজ্য অধিকার করে কতকগুলো বহুমূল্য দরজা শুদ্ধ হনুমানের বিশাল মূর্তি এনে চিতোরের এক দরজার সামনে বসিয়েছিল সে। চিতোর দুর্গের দ্বারে আজও সে মূর্তি প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবু পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত প্রমারদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গও বীরবিক্রমে অধিকার করেছিল রাণা কুম্ভ। দুর্গমধ্যে অনেকগুলো মন্দির আছে, তার একটিতে রাণা কুম্ভ এবং তার পিতার পাষাণ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় আজও। রাজপুতরা এই দুই মূর্তিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে থাকে। আবু পাহাড়ের ওপরে কুম্ভশ্যাম নামে আর এক অপূর্ব স্থপতি শিল্পের স্বাক্ষর রেখে গেছে রাণা। আবুর গিরি-পথে বাসন্তী নামে আর একটি দুর্গ তৈরি করেছিল সে। আরাবল্লী পাহাড়ে মৈররা বাস করত। শিরোমল্ল ও দেবগড় আরাবল্লীর কাছে। মৈররা এই দুটো জায়গা যদি কখনও আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় রাণা সেখানে মাচিন নামে আর এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেছিল। মারবার এবং মিবার রাজ্যের সীমানাও নির্দ্ধারণ করেছিল রাণা কুম্ভ। এছাড়া সদ্রি নামে পর্বতের মাঝখানে এক জৈনমন্দির তৈরি করেছিল রাণা। চিতোরের এক জৈন ধর্মাবলম্বী মন্ত্রীর অনুরোধে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছিল। ঋষভদেবের পবিত্র নামে এ মন্দির উৎসর্গ করা হয়েছে। মন্দিরটি তৈরি করতে দশকোটী টাকারও বেশী খরচ হয়েছিল। মিবারে মোট ৮৪টি দুর্গ আছে, তার মধ্যে ৩২টি দুর্গই নির্মাণ করেছিল রাণা কুম্ভ। এই ৮৪টি দুর্গের মধ্যে কুম্ভমেরুই শ্রেষ্ঠ। এমনভাবে দুর্ভেদ্য গিরিপথে এই দুর্গটি তৈরি করা হয়েছে যে, এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে সহজে তার মধ্যে প্রবেশ করা কোন শত্রুর সাধ্য নয়। যেখানে এখন কুম্ভমেরু প্রতিষ্ঠিত, আগে সেখানে পার্বত্যবাসীদের এক দুর্গ ছিল। অনেকের ধারণা, চন্দ্রগুপ্ত বংশের এক রাজা দ্বিতীয় শতাব্দীতে

ঐ দুর্গটি তৈরি করেছিল।

রণচর্চায় এবং কাব্যচর্চায় সমান দক্ষ ছিল রাণা কুম্ভ। তার রচিত 'গীত গোবিন্দ'র পরিশিষ্ট এক অপূর্ব কবিত্ব শক্তির নিদর্শন। রাণার প্রধান রাণী মীরাবাঈ রূপে ও গুণে অসামান্য ছিল। মারবারের সামন্তবংশের এক রাঠোরের কন্যা মীরাবাঈ। ধর্ম ও স্বামীর প্রতি অটল ভক্তি মীরাবাঈর চরিত্রের আর এক দিক। কোন কোন মন্দ লোক মীরাবাঈর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক দেবার অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে তার মহিয়সী চরিত্র বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত হয়নি। বৃন্দাবন থেকে দ্বারকাপুরী পর্যন্ত যতগুলো তীর্থ আছে তার সবগুলোই দর্শন এবং দীন দুঃখীদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাহায্য করেছিল সে। অনেকের বিশ্বাস, মীরার কবি-প্রতিভার অনুকরণ করেই রাণা কুম্ভ মহাকবি বলে খ্যাত হয়েছিল।

ঝালাবার সর্দারের এক কন্যার সঙ্গে মারবার রাজের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক ছিল। কিন্তু রাণা কুম্ভ তাকে চুরি করে এনে কুম্ভদুর্গে আটকে রেখে দিল। রাঠোরদের সঙ্গে শিশোদীয়দের এতদিনের বন্ধুত্বে চীড় খেয়ে গেল। একটি মেয়ের জন্যে কুম্ভ এতদিনের সখ্যতা জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিল। সর্দার-কন্যা কিন্তু রাঠোর-রাজার প্রেমেই মুগ্ধ ছিল। মারবার রাজের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে-মেয়েকে কুম্ভদুর্গ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ দুর্গ থেকে মুন্দরদুর্গ বেশ স্পষ্ট দেখা যেত। রাঠোররাজ-প্রেমিকা এক অনির্বাণ দীপশিখা জ্বেলে রাখত কুম্ভমেরু দুর্গে। সেই দীপের আলো দেখে মারবাররাজ বুঝতে পারত, তার প্রেমিকা তারই পথ চেয়ে বসে দিন গুণছে।

এক সময়ে রাণা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক ব্রাহ্মণ গণনা করে বলেছিল, সে-রোগ থেকে তার নিস্তার নাই। ঐ ব্রাহ্মণই তার চিকিৎসার ভার নিয়েছিল। তার নিজের গণনা অভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যেই ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছিল ব্রাহ্মণ। রাণার ভাগ্য ভাল যে, ব্রাহ্মণের ওপর খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল তার। পরীক্ষা করে ওষুধের বিষ ধরা পড়ল। সে-যাত্রা বেঁচে গেল রাণা। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকে পদচ্যুত করা হল। তার

অর্দ্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল তাকে।

জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্লকে কোন কারণে রাজ্য থেকে বের করে দিয়েছিল রাণা কুম্ভ। ইদর রাজ্যে গিয়ে বসবাস করতে থাকে সে।

ঝুনঝুন রাজা যেদিন পরাজিত হয় সেইদিন থেকে রাণা রোজ এক অদ্ভুত কাণ্ড করত। রোজই সে কোন আসনে বসার আগে নিজের তরবারিখানা মাথার ওপরে তিনবার ঘুরিয়ে নিয়ে বসত। এর কোন কারণ বুঝতে না পেরে একদিন রাণাকে এর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করেছিল রায়মল্ল। তারই ফলে ভীষণ চটে গিয়ে পুত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছিল রাণা।

ব্রাহ্মণের বিষ থেকে আত্মরক্ষা করেও কিন্তু কুম্ভ নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ইতিহাসের কলঙ্ক, তারই পাষণ্ড পুত্র উদার ছুরির আঘাতে ঘুমন্ত অবস্থায় রাণা কুম্ভ নিহত হয়েছিল। বাবাকে হত্যা করে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন দখল করে বসল উদা। কিন্তু পাঁচ বছরের বেশী তাকে সে রাজ্য ভোগ করতে হয়নি। এই পাশবিক আচরণের কোন সমর্থনই কারো কাছ থেকে কোন দিন পায়নি উদা। শম্ভর, আজমীর এবং তার আশপাশের জায়গাগুলো যোধপুরের রাজাকে এবং আবুপাহাড়ের স্বাধীনতা দেবররাজাকে ঘুষ দিয়েও তাদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা আদায় করতে পারল না সে। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে রায়মল্ল এসে পিতার সিংহাসন দখল করে বসল। এদিকে উদা দিল্লীতে গিয়ে, নিজের মেয়েকে দিয়ে বাদশাহর জৈব ক্ষুধা মিটিয়ে কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষে চাইল। এই জঘন্য কাজের বদলে বাদশাহর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ আশ্বাস পেয়ে চিতোরের দিকে ফিরে আসছিল সে। কিন্তু পথের মধ্যেই তার সব আশা শেষ হয়ে গেল। বজ্রাঘাতে অপমৃত্যু হল উদার। দিল্লীর বাদশাহ উদার দুই পুত্র শেষমল্ল ও সূর্যমল্লকে সঙ্গে নিয়ে মিবার অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। এ খবর পেয়ে আটান্ন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রায়মল্লও প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল প্রাচীন সিয়ার নাকে এক জায়গায়। দুই দলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। শেষে দিল্লীর বাদশাহ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল নিজের রাজ্যে।

রায়মল্লর তিন পুত্র। সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। এছাড়া দুটি কন্যাও

ছিল। গার্ণারের রাজা শূরজীকে একটি এবং শিরোহীর রাজা পাভুরায়কে আর একটি কন্যা সম্প্রদান করেছিল রায়মল্ল। ছোট জামাইকে যৌতুক হিসেবে আবু প্রদেশ দান করেছিল সে। উদার পুত্র শেষমল্ল আর সূর্যমল্ল শেষ পর্যন্ত জ্যেঠামশায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করল। তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করে রাজপরিবারে আশ্রয় দিয়েছিল রায়মল্ল। মালরাজ গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে রায়মল্লর ছোটছোট যুদ্ধ হয়েছিল কয়েকবার। প্রতিবারই শেষমল্ল এবং সূর্যমল্ল অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে রায়মল্লর প্রশংসা পেয়েছিল। কোনক্রমেই গিয়াসউদ্দিন জয়লাভ করতে না পেরে অবশেষে রায়মর্ল্লর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। সব বাধা দূর হয়ে গেল। দিল্লীর বাদশাহ হীনবল, তবে লোদী বংশের রাজারা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিত। কিন্তু চিতোররাজকে সেজন্যে বিশেষ চিন্তিত হতে হয়নি কখনও।

রাজ্যলোভে রায়মল্লর তিনপুত্রের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীরাজ চৌহান পৃথ্বীরাজের মতই তেজস্বী বীর ছিল। তার বীরত্ব-কাহিনী শিশোদীয়দের গর্বের ধন। তিন ভাইএর মধ্যে কে সিংহাসন লাভ করবে এই নিয়ে সূর্যমল্লকে মধ্যস্থ করে যখন দারুণ বচসা চলছে তখন সঙ্গ এক প্রস্তাব করল। নাহরা মুগরার চারণীদেবীর সন্ন্যাসিনী যাকে নির্বাচিত করবে সেই হবে রাজা। সকলেই সম্মত হল এ প্রস্তাবে। মন্দিরে গিয়ে পৃথ্বীরাজ প্রশ্ন করল সন্ন্যাসিনীকে। কোন কথা না বলে আঙ্গুল দিয়ে সঙ্গকে দেখিয়ে দিল সে। ইশারায় জানিয়ে দিল, শুধু সঙ্গই সিংহাসন পাওয়ার যোগ্য, সূর্যমল্ল কিছু অংশ ভোগ করার অধিকারী।

সন্ন্যাসিনীর কথায় পৃথ্বীবাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তরবারি তুলে সঙ্গকে হত্যা করার জন্যে আঘাত করল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই সূর্যমল্ল তরবারি দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করল। উদ্দশ্য ব্যর্থ হলে দেখে পৃথ্বীরাজ সূর্যমল্লকেই আক্রমণ করল। রক্তের ধারায় গঙ্গা বয়ে যেতে লাগল পবিত্র দেবী মন্দিরে। সঙ্গর দেহও ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তার একটি চোখ সারাজীবনের মত নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে প্রাণরক্ষার জন্যে চতুর্ভূজা দেবীর মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল সঙ্গ। পরে সেখান থেকে শিবান্তী প্রদেশ

পার হয়ে বীদা নামে এক উদাবৎ বংশের ধনবান রাজপুতের কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল। বীদা তখন বিদেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসছিল। এমন সময় সঙ্গ গিয়ে আশ্রয় চাইল তার কাছে। সঙ্গর পিছনে পিছনে অনুসরণ করে আসছিল জয়মল্ল। জয়মল্লর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আশ্রিতের প্রাণরক্ষা করেছিল বীদা। কিছুকাল রোগ শয্যায় কাটিয়ে সঙ্গর সন্ধানে অনেকগুলো গুপ্তচর নিযুক্ত করল পৃথ্বীরাজ। রাজপুত বংশের রাজকুমার হয়ে তুচ্ছ ছাগল চরানোর কাজ করে দিন কাটাতে লাগল সঙ্গ। পরিচয় দেবার উপায় নেই কোথাও। চারদিকে পৃথ্বীরাজের চর। ছাগলের রাখালিতে এতই অপটু ছিল সঙ্গ যে, মাঝে মাঝে তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়েও দিত ওরা। সঙ্গ কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে করত না। যথা সময়ের প্রতীক্ষায় সে দিন গুণতে লাগল।

শুধুমাত্র পৃথ্বীরাজের আক্রোশেই সঙ্গ আজ নিরুদ্দেশ। কে জানে, সে জীবিত না মৃত। রাণা রায়মল্ল পৃথ্বীরাজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে মিবার রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে মাত্র পাঁচজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গাধবারে বালিয়ো নগরের দিকে যাত্রা করল পৃথ্বীরাজ। পথের মধ্যে নদালয় নগরে উপস্থিত হয়ে কিছু আহার্য কেনার জন্যে এক বণিকের কাছে তার হাতের হীরের আংটীটা বিক্রী করতে গিয়েছিল। বণিক বললে, এ আংটি আমার কাছ থেকেই কেনা হয়েছিল চিতোর-রাজকুমারের জন্যে। বণিকের সঙ্গে সৌহার্দ্য হল তার, এই আংটিকে উপলক্ষ করে। পৃথ্বীরাজের বহিষ্কারের সব বৃত্তান্ত শোনার পর তাকে যথা সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল বণিক।

নদালয়ে তখন এক রাবৎ মীনরাজা রাজত্ব করত। নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করে পৃথ্বীরাজ এবং তার অনুচররা মীনরাজার রাজধানীতে কাজে নিযুক্ত হল। পৃথ্বিরাজের পাঁচজন সঙ্গীর নাম যশ, সিনদীয়া, সঙ্গম দৈবী, অভয় ও জুহ্ন।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল। মীনরাজের রাজ্যে প্রতি বৎসর

আহেরিয়া নামে এক মহা উৎসবের আয়োজন করা হত। এ দিন রাজ্যের সমস্ত রাজকর্মীদের ছুটি দেওয়া হয়, তাদের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্যে। এই মহা সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল পৃথ্বীরাজ। খুব সহজেই নিজের অনুচরদের সহযোগিতায় মীনরাজাকে হত্যা করে নদালয়ে আগুন লাগিয়ে দিল পৃথ্বীরাজ। নদালয় শহর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল সে আগুনে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মীনরা যে যেদিকে পারল পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সমস্ত গাধবার প্রদেশ হাতের মুঠোয় করল পৃথ্বীরাজ। শুধু চৌহান অধিকারের দৈশূরী দুর্গের দিকে হাত বাড়াল না সে। গাধবাবের সদরগড়ে সর্দার নামে এক শোলাঙ্কি বাস করত। দৈশূরী দুর্গ অধিপতি চৌহান রাজার কন্যার সঙ্গে সর্দারের বিয়ে হয়েছিল। দৈশূরী দুর্গ ও আশেপাশের অঞ্চল বংশ পরম্পরায় ভোগ দখলের সত্ব ছেড়ে দিয়ে সর্দারকে হাত করে নিল পৃথ্বীরাজ।

আজমীরের কাছে শ্রীনগর গ্রাম। প্রমার বংশের করিমচাঁদ সর্দার বাস করত সেখানে। ডাকাতিই তার একমাত্র জীবিকা। সঙ্গর অনুচররা গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করত সঙ্গর সঙ্গে। তাদেরই পরামর্শে এই করিম-চাঁদের ডাকাত দলে যোগ দিল সঙ্গ। যতদিন না পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করতে পেরেছিল ততদিন এই দস্যু দলেই কাটাতে হয়েছিল সঙ্গকে।

করিমচাঁদ তার কন্যার সঙ্গে সঙ্গর বিয়ে দিয়েছিল। কি কারণে তার তাঁবের এক সামান্য দস্যুর হাতে নিজের কন্যাকে সম্প্রদান করেছিল, সে-সম্বন্ধে এক চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে। জয়সিংহ বলীয় এবং জয়সুর সিন্দিল নামে দুজন বিশ্বাসী অনুচর বিপদে আপদে সব সময় সঙ্গকে সাহায্য করত। একদিন বনের মধ্যে, এক প্রাচীন বটগাছের নিচে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সঙ্গ। অনুচররা অদূরেই রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় এক বিষধর কাল-সাপ মাথার কাছে এসে বিশাল ফণা বিস্তার করে রোদের তেজ থেকে সঙ্গর মুখ ছায়া করে রাখল। এবং একটি ছোট্ট পাখি উড়ে এসে সাপের ফণার ওপরে বসে মধুর স্বরে ডাকতে লাগল। মারু নামে এক রাখাল এ দৃশ্য দেখে লোকজন জড়ো করে আনল। অনেকেই বললে, এ ছেলে একদিন

সম্রাট হবে। এ সংবাদ করিমের কানে গেল। মুখে কিছু প্রকাশ না করে নিজের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সঙ্গকে খুব আদরযত্ন করতে লাগল করিম।

এই সময় শোলাঙ্কি বংশের রায় শূরতান তোড়াটঙ্কের রাজা ছিল। তক্ষশীলাই পরে তোড়াটঙ্ক হয়েছে। পাঠানরা শূরতানকে সিংহাসনচ্যুত করে তোড়াটঙ্ক দখল করে নিল। পাঠানদের বিতাড়িত করে তোড়াটঙ্ক উদ্ধার করে দিতে পারবে যে, তার হাতে নিজের পরমাসুন্দরী কন্যা তারা-বাঈকে সঁপে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা প্রচার করল শূরতান। সুন্দরী নারীর লালসায় জয়মল্ল তোড়াটঙ্ক জয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাধ্যে কুলায়নি। শেষে লোভ সামলাতে না পেরে তারাবাঈকে চুরি করতে গিয়েছিল জয়মল্ল। কিন্তু শূরতানের তরবারিতে নিহত হয়ে কামকাতর জয়মল্লর ইহলীলা শেষ হয়ে যায়। চুরি করতে গিয়ে পুত্র নিহত হয়েছে, এসংবাদে রায়মল্ল শোলাঙ্কি রাজার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সমগ্র বেদনোর প্রদেশ উপহার দিয়েছিল শূরতানকে।

বাবাকে নৃসংশভাবে হত্যা করে উদা কিছুদিনের জন্যে রাজা হয়েছিল। রায়মল্লর অনুগ্রহ ও আশ্রয়ে বাস করেও তার পুত্র সূর্যমল্লর মনে ঐরকম এক উপায়ে রাজ্য আত্মসাৎ করার লোভ উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এ চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরুদ্দেশ, কনিষ্ঠ নিহত। রায়মল্ল পৃথ্বীরাজকে আবার ডেকে পাঠাল চিতোরে।

চিতোরে এসেই তোড়াটঙ্ক উদ্ধারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ল পৃথ্বীরাজ। অনায়াসেই তোড়াটঙ্ক উদ্ধার এবং তারাবাঈকে বিয়ে করে চিতোরে ফিরে এল সে। তার উদ্যম, অধ্যবসায় ও অসাধারণ বীরত্বে খুশী হল রায়মল্ল।

সূর্যমল্লর ধারণা ছিল, চিতোরের সিংহাসন ভগবান তার জন্যেই নির্দিষ্ট করে রেখেছে। কিন্তু তার সব আশায় ছাই পড়ল। নিরুপায় হয়ে সরাসরি পৃথ্বীরাজের শত্রুতা শুরু করল সূর্যমল্ল। লক্ষ রাণার আর এক বংশধর সারঙ্গদেব। তাকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যমল্ল গিয়ে হাজির হল মালবের

অধিপতি মোজাফরের কাছে। তার সাহায্যে চিতোরের দক্ষিণ-সীমা আক্রমণ করল সূর্যমল্ল। সদ্রি-বাটেরা এবং পায়ী-নিমচের মাঝখানের এক বিশাল অঞ্চল অধিকার করল সে। এরপর চিতোর আক্রমণ করল সূর্যমল্ল। রায়মল্লও সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে গাভীরী নদীর তীরে শিবির স্থাপন করল। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে রাণা রায়মল্লর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। এমন সময় হাজারখানেক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হল পৃথ্বীরাজ। সারাদিন ধরে দারুণ যুদ্ধ হল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, কিন্তু কোন পক্ষেরই জয় হলনা। সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রেখে সবাই ফিরে গেল নিজ নিজ শিবিরে।

রাজপুতের চরিত্রে যে ধরনের সব অদ্ভুত গুণ দেখা যায় অন্য কারো মধ্যে তার সন্ধান মেলে না। প্রথম দিনের যুদ্ধের পর সূর্যমল্লর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে পৃথ্বীরাজ শত্রু শিবিরে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল। সূর্যমল্ল তখন ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় শুয়ে ছিল। তার অনুচররা ক্ষতগুলো সেলাই করে দিচ্ছিল। পৃথ্বীরাজকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে সব ব্যথা যন্ত্রণা ভুলে সূর্যমল্ল উঠে পৃথ্বীরাজকে বুকে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়ায় আবার ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজেরই তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ দেখে পৃথ্বীরাজের বুক ব্যথায় ভরে উঠল। আন্তরিকভাবে জানতে চাইল পৃথ্বীরাজ, 'আপনার ক্ষতগুলো কেমন আছে। যন্ত্রণা কিছু কমেছে কি?'

সূর্যমল্ল বললে, 'যাও বা কিছু ছিল, তোমাকে দেখার পর আর কোন যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছিনে।'

'আমি বাবার সঙ্গে এখনও দেখা করতে পারিনি, আগেই আপনাকে দেখতে এসেছি। বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার আছে?'

তখনি আহারের আয়োজন হল। এক সঙ্গে বসে দুজনে রাতের খাওয়া শেষ করল। এবার সূর্যমল্লর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের শিবিরে ফিরে আসার সময় বলে এল পৃথ্বীরাজ, 'আচ্ছা আজকের মত আসি, আবার কাল সকালে আমাদের দেখা হবে। কালই শেষ যুদ্ধ।'

সূর্যমল্ল সস্নেহে বললে, ‘তাই হবে পৃথ্বী, আজ শিবিরে যাও। সারা দিনের পরিশ্রমে তুমি বড় ক্লান্ত, এখানে আর বেশী দেরি ক’র না, যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে।’ পরদিন সকালে আবার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। এ যুদ্ধে সারঙ্গদেবের দেহে পঁয়ত্রিশটি আঘাত লেগেছিল। তা সত্বেও অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল সে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর পৃথ্বীরাজেরই জয় হল। বাতেরা নামে এক দুর্গম বনের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল সূর্যমল্ল। খুঁজতে খুঁজতে সেখানেও গিয়ে হানা দিল পৃথ্বীরাজ। সে সময় সারঙ্গ দেবের সঙ্গে, এক আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে তার পাশে বসে, গল্প করছিল সূর্যমল্ল। ভীমবেগে উপস্থিত হয়ে সূর্যমল্লর শির লক্ষ্য করে তরবারি দিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাত করল পৃথ্বীরাজ। কিন্তু সারঙ্গদেবের তরবারি সে আঘাত প্রতিহত করল সঙ্গে সঙ্গে।

সূর্যমল্লর অনুরোধে সে রাত্রে যুদ্ধ স্থগিত রইল। সূর্যমল্ল বললে, ‘দেখ পৃথ্বী, আমার বংশধররা রাজপুত। আমি মারা গেলে তাদের বিশেষ ক্ষতি হবে না। দেশ লুঠ করেও তারা জীবিকা সংগ্রহ করতে পারবে। কিন্তু তুমি? তুমি মরলে চিতোরের কি অবস্থা হবে? লোকে আমাকে অভিশাপ দেবে। আমার কলঙ্কের আর সীমা থাকবে না।’

এ কথা শুনে পৃথ্বীরাজ তরবারি কোষে পুরল। সূর্যমল্লকে জিজ্ঞেস করলে, ‘আপনারা এই আগুনের পাশে বসে কি করছিলেন?’

‘—খাওয়া দাওয়া সেরে এই একটু খোশগল্প করছিলাম দুজনে।

পৃথ্বীরাজ অবাক হল। বললে, ‘আমার মত এক শত্রু মাথার ওপরে, আর আপনারা নিশ্চিন্তে খোশগল্প করছিলেন! একি করে সম্ভব।’

সূর্যমল্লর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

‘—একটা কিছু তো অবলম্বন চাই, তুমি আমাকে সর্বস্বান্ত করে ফেলেছ। এখন কি করি, কোন উপায়ে সময় তো কাটাতে হবে।’

কথায় কথায় রাত গভীর হল। পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। সকালে কালিকা দেবী দর্শনে মন্দিরে যাওয়ার জন্যে সূর্যমল্লকে অনুরোধ করল পৃথ্বীরাজ। রণশ্রমে ক্লান্তির অক্ষমতা জানিয়ে সারঙ্গদেবকে পৃথ্বীরাজের

সঙ্গে পাঠাল সে।

দেবী পূজা আরম্ভ হল। পৃথ্বীরাজ একটি মহিষ বলি দান করল দেবীর চরণে। তারপর তরবারি মুক্ত করে সরঙ্গদেবকে আক্রমণ করল সে। পৃথ্বীরাজের বিক্রমের সামনে টিকতে পারল না সরঙ্গদেব। তার মুণ্ড কেটে দেবীকে নিবেদন করল পৃথ্বীরাজ। এরপর সেই রক্তাক্ত তরবারি হাতেই সে ছুটল বাতেরা দুর্গের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে বাতেরা দখল করল সে। সূর্যমল্ল রণে ভঙ্গ দিয়ে সদ্রিতে পালিয়ে গেল। সহায় নেই, সম্বল নেই, ভবিষ্যতের আশা ভরসাও শেষ। যে টুকু জমি জমা ছিল ব্রাহ্মণ আর ভট্টদের দান করে মিবারের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে কনখল মহারণ্যে প্রবেশ করল সূর্যমল্ল। কিছুদূর যেতে না যেতেই এক শুভ দৃশ্য চোখে পড়ল তার। একটি ছাগলের ছানাকে থাবা মারবার জন্যে এক বাঘিনী ওৎ পেতেছিল। কিন্তু তার মা বাচ্চাটিকে নানাভাবে আড়াল করে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। রাজপুত মতে এ ঘটনা মঙ্গলের আভাষ। সূর্যমল্লর মনে আবার আশার সঞ্চার হল। আর কোথাও না গিয়ে সেখানেই বসবাস করবে বলে ঠিক করল সে। খুব অল্প দিনের মধ্যে নিজের বাহু-বলে সেখানকার অধিবাসীদের পরাজিত করে দেবগড় নামে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করল সূর্যমল্ল। ধীরে ধীরে দেবগড়ের আশেপাশের প্রায় হাজারখানেক গ্রাম দখলে এল তার। এই সব গ্রামগুলো আজও তার বংশধরদের অধিকারে আছে।

শিরোহিররাজা পাভুরায়ের সঙ্গে এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল রায়মল্ল। পাভুরায় মাতাল, দুশ্চরিত্র। মদ খেলেই নৃশংস হয়ে পড়ত সে। এবং নিজের স্ত্রীর দেহের ওপরই তার নৃশংসতার ছাপ রেখে দিত। স্বামীর অসহ্য উৎপীড়নে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল। শেষে নিরুপায় হয়ে পৃথ্বী-রাজের কাছে চিঠি লিখল সে। চিঠি পেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শিরোহির দিকে পা বাড়াল পৃথ্বীরাজ। ভগ্নিপতিকে উপযুক্ত শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত অন্যকোন কাজ নেই তার। গভীর রাত্রে প্রাচীর ডিঙিয়ে এসে হাজির হল পাভুরায়ের শোবার ঘরে। নিজের চোখে দেখতে চায় সে, কতটা এবং কি ধরনের অত্যাচার সে পাষণ্ড করে তার বোনের ওপর। অগ্রজ

দেখল, তার আদরের বোনকে খাটের তলায় শুধু মেঝেতে শুইয়ে রেখেছে পাভুরায়। ক্রোধ সামলাতে না পেরে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে পাভুরায়ের ওপর। স্বামী দুরাচার হলেও কোন স্ত্রী তার মৃত্যু কামনা করতে পারে না। দাদার পায়ে ধরে রাজকুমারী মিনতি করতে লাগল, 'তুমি শুধু ওকে প্রাণে বাঁচতে দাও দাদা, মেরে ফেলো না।'

পাভুরায়ও ভয়ে বিনীত হয়ে ক্ষমা চাইল শ্যালকের কাছে।

পৃথ্বীরাজ হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ক্ষমা পরে হবে, আগে তোমার স্ত্রীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাও। তার জুতো মাথায় করে বল, জীবনে আর কখনও তুমি তার ওপর অত্যাচার করবে না, তার কোন অসম্মান করবে না।'

কলের পুতুলের মত তাই করল, তাই বলল পাভুরায়।

পাঁচদিন কেটে গেল। ভগ্নিপতির অনুরোধে শিবোহি রাজ্যে এ কদিন কাটাতে হল। পাভুরায়ের আন্তরিক বন্ধুত্বে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল পৃথ্বীরাজ। কিন্তু আসলে পাভুরায় যে অন্য চাল চেলেছিল তা আর বুঝতে পারেনি পৃথ্বীরাজ। চিতোরে ফিরে যাওয়ার সময় পাভুরায় তার নিজের হাতে তৈরি করা কয়েকটি মোদকের গুলি উপহার দিয়েছিল পৃথ্বীরাজকে।

কিছুদূর গিয়ে কমলমীরে এসে পিপাসার্ত হয়ে ঐ মোদকের একটা গুলি খেয়ে জল খেল পৃথ্বীরাজ। মুহূর্তের মধ্যে তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে পড়ল। বুঝতে বাকি রইল না, পাভুরায় তাকে কৌশলে বিষ খাইয়েছে। কমল-মীরের কাছেই দেবী মাতার মন্দির। কোন ক্রমে সেখানে গিয়ে ঢলে পড়ল পৃথ্বীরাজ। প্রাণাধিক পত্নী তারাবাঈকে আনবার জন্যে লোক পাঠানো হল। কিন্তু তারাবাঈর সঙ্গে আর তার দেখা হল না। কমল-মীরে চিতা জ্বালানো হল। স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল তারাবাঈ।

পুত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ, পরিণত বয়সে পুত্রশোক রায়মল্লর শেষ জীবন জর্জরিত করে ফেলল। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরেই রায়মল্লও ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেছিল।

৭

করিম চাঁদের কন্যাকে বিয়ে করে শ্রীনগরে বাস করছিল সঙ্গ। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনেই চিতোরে এসে সিংহাসন দখল করল। সুপরিকল্পিত শাসন গুণে, অল্পদিনের মধ্যেই, প্রজারা তার অনুরক্ত হয়ে উঠল। রাণা সঙ্গর চেষ্টাতেই মিবার রাজ্য উন্নতি, গৌরবের চরমে পৌছতে পেরেছিল। তার রাজত্বকালে মীবারের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তরে পীলাখাল, পূর্বে সিন্ধু নদ, দক্ষিণে মালবরাজ্য এবং পশ্চিমে দুর্ভেদ্য পর্বতমালা। সঙ্গর অন্য নাম সংগ্রামসিংহ। ভট্ট কবিরা তাকে সঙ্গ এবং মোগল ঐতিহাসিকরা তাকে পিঙ্ক নামে পরিচিত করেছে।

করিমচাঁদের উপকার ভোলেনি সংগ্রামসিংহ। সিংহাসন লাভের পর করিমচাঁদকে আজমীর প্রদেশ দান করে তার পুত্র জগমল্লকে রাও উপাধিতে ভূষিত করল সে।

ইতিহাস বলে, হিন্দু রাজাদের মধ্যে কোনকালেই একতা ছিল না। তা যদি থাকত তবে মুসলমানরা ভারতের মাটিতে খুঁটি গাড়তে পারত না কোনদিন। রাণা সংগ্রামসিংহ অন্য কোন রাজপুত রাজাকে রাজা বলেই গণ্য করত না। তার অসীম বীরত্ব, প্রবল প্রতাপ, অদ্ভুত রণকৌশলের কাছে গোয়ালিয়র, আজমীর, রায়সেনা, কল্পী, বুন্দী, রামপুর, আবু, গাগরৌণ প্রভৃতি প্রদেশের রাজারা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিল। দিল্লী এবং মালবের মুসলমান রাজারা সংগ্রাম সিংহের কাছে আঠারো বার পরাজিত হয়েছিল। শুধু তারই ভয়ে তারা কখনও মিবারের দিকে হাত বাড়াতে সাহস করেনি। বাকরোল ও ঘাটেলি নামে দুই জায়গায় দিল্লীর ইব্রাহিম-লোদীর সঙ্গে সংগ্রামসিংহর দু'বার মহাসংগ্রাম হয়। দু'বারই লোদীর সৈন্যরা দলিত ও পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

যখন সারা দেশ সংগ্রামসিংহর ভয়ে কাঁপছে ঠিক সেই সময়ে ভারতের

পশ্চিম সীমায় বাবর আক্রমণ করল। যে সব মুসলমান রাজারা সংগ্রামের প্রতাপে মাথা তুলতে পারছিল না ধূর্ত বাবর তাদের একজোটে বাঁধল। নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে উঠল তারা। তুর্কীবংশে বাবরের জন্ম। শাকদীপে জাক্ষরতীশ নদীর দুই তীরে তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এখানেই জিৎমহিষী তুমিরা বাস করত। এখান থেকে গিয়েই জিৎরা পৃথিবীর নানা রাজ্যের সর্বনাশ করেছে। বাবরের বয়স যখন মাত্র বারো বৎসর তখন সে জাক্ষরতীশ নদীর তীরে ফরগণা প্রদেশের সিংহাসন লাভ করে। কিশোর বয়সেই বাবর দুঃসাহসিক বীর। এই সময় থেকে নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পড়ে কখনও বা সে সিংহাসন লাভ করেছে আবার কখনও বা পথের ভিখারী হয়ে পথে পথে ঘুরে মরেছে। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে নিজের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে সিন্ধুনদের ধারে এসে উপস্থিত হল সে। পাঞ্জাব ও কাবুলের মাঝামাঝি এক জায়গায় আস্তানা গেড়ে কিছুদিন কাটাল।

সাত বৎসর পরে। সুযোগ বুঝে দিল্লীর ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে অভিযান করল, ইব্রাহিমকে নিহত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করল বাবর। এর এক বৎসর পরে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে মিবারের বিরুদ্ধে সে বিয়ানার কাছে কনুয়া নামে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করল। সংগ্রামসিংহর প্রচণ্ড বিক্রমের কাছে তাতার সেনা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এই নিদারুণ পরাজয়ের সংবাদ শুনে, বাবর কিন্তু একটুও দমল না। সৈন্যদের নানা-ভাবে উৎসাহিত করতে লাগল। প্রত্যেক সৈন্যকে কোরাণ স্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল সে, 'হয় জয়পতাকা উড়িয়ে ফিরে আসব, নাহলে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দেব।' এক কথায় সবাই শপথ গ্রহণ করল। এই সময় সংগ্রামসিংহ বিজয়ীর গর্বে উন্মত্ত হয়ে শত্রুশক্তিকে তুচ্ছ করে দেখে-ছিল। এর ওপর নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা বাবরের পক্ষে সোনায় সোহাগা হল।

পীলাখালের কাছে বাবর শিবির স্থাপন করেছিল। কিন্তু সংগ্রাম-সৈন্যর অবরোধ থেকে বাবর সৈন্যরা দিনদিনই নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছিল। এমন সময় বাইসিন প্রদেশের অধিপতি তুয়ারবংশের রাজা শিলাইদীর

মধ্যস্থতায় বাবর এক সন্ধি প্রস্তাব করল সংগ্রামসিংহর কাছে। ঠিক হল, দিল্লী এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলো বাবরের অধীনে থাকবে। দুই রাজ্যের সীমারেখা হবে পীলাখাল। সবই ঠিক হল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কাজে পরিণত হল না। ১৫ই মার্চ আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। বাবরের ভয়ঙ্কর কামানের গোলায় শতশত রাজপুত বীর নিহত হল। তাতেও তারা কিন্তু নিরুৎসাহ হয়নি মুহূর্তের জন্যে। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু সেনার ওপর। কিন্তু বিপুল বিক্রমে রাজপুত সৈন্য সংহার করতে করতে এগিয়ে এল বারর সৈন্যরা। ঠিক এই সময় তাল বুঝে বিশ্বাসঘাতক শিলাইদী তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে যোগ দিল বাবরের পক্ষে। যে সব বীর রাজারা সাহায্য করতে যুদ্ধে এসেছিল একে একে তারা সকলেই মুসলমান সৈন্যর হাতে প্রাণ দিল। সংগ্রামও দারুণভাবে আহত। যুদ্ধ জয়ের ক্ষীণতম আশাও নেই জেনে মিবারের পর্বতমালার মধ্যে আশ্রয় নিল সে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পাশে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়ায় জয়চিহ্ন হিসেবে কয়েকটি পিরামিড তৈরি করেছিল বাবর। এবং সেইদিন থেকেই 'গাজি' উপাধি গ্রহণ করেছিল সে। পরে তার উত্তরাধিকারীরাও এই উপাধি ধারণ করত।

সঙ্গর প্রতিজ্ঞা ছিল, যুদ্ধে জয় না হলে সে আর চিতোরে ফিরে আসবে না। তাই সে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পৃথ্বীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে একটি হাত কাটা পড়ল, কামানের গোলার আঘাতে তার একটি পাও ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুতরাং চিরজীবনের মত খঞ্জ হয়ে রইল। বাবর কিন্তু গুণের কদর জানত। তাই সে সংগ্রামকে ভয় এবং শ্রদ্ধা করেছে চিরকাল।

চিতোর উদ্ধারের আশা মনেই শুকিয়ে গেল সংগ্রামের। মিবারের বুশা নামে এক পাহাড়ে সে প্রাণত্যাগ করল অল্পদিনের মধ্যেই। জনরব, তার নিষ্ঠুর মন্ত্রীরা ষড়যন্ত্র করে হত্যা করেছিল তাকে। কিন্তু একথা সত্যি না। টড সাহেবের অন্তত বিশ্বাস তাই। যেখানে সংগ্রামের মৃত্যু হয়

সে-জায়গায় এক স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল কিছুকাল পরেই।

সংগ্রামের সাত পুত্র। তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ছোটতেই মারা যায়। তৃতীয় পুত্র রত্ন ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসল। আদর্শ রাজ-পুতের সব গুণেরই অধিকারী ছিল রত্ন। কিন্তু একটি নারীকে কেন্দ্র করে এক হঠকারিতার ফলে প্রথম যৌবনেই রত্নের জীবন শেষ হয়ে যায়।

রাজ্যলাভের অনেকদিন আগেই অম্বররাজ পৃথ্বীরাজের কন্যাকে গোপনে বিবাহ করেছিল রত্ন। কিন্তু রাজ্যলাভের পরেও রত্ন যখন সেকথা সকলের সামনে প্রকাশ করে স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে গেল না তখন অগত্যা বাবার ঠিক করা পাত্র সূর্যমল্লর সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছিল অম্বর রাজকুমারী। যেদিন নববধূকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এল সূর্যমল্ল সেইদিনই এক অনর্থ ঘটে গেল।

সূর্যমল্লর বোনের সঙ্গে রাণার বিয়ে হয়েছিল। একদিন শ্যালক সূর্যমল্লর সঙ্গে মৃগয়ায় বেরিয়েছিল রত্ন। একটি হরিণীর পিছু ধাওয়া করতে করতে দল বল পিছনে ফেলে দুজনে গভীর অরণ্যে মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাণার মনে প্রতিশোধ প্রবৃত্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল। ঐ বনের মধ্যেই দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে উঠল। এমনই দুর্ভাগ্য, পরস্পরের অসির আঘাতে দুজনেই নিহত হল সেখানে। মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর রত্নর মূল্যবান জীবন শেষ হয়ে গেল।

রত্নর অকাল মৃত্যুর পর, ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে তার ভাই বিক্রমজিৎ রাণা হল। বিক্রমের চরিত্রে রত্নর গুণের এককণাও ছিল না। যে সব সামন্ত-রাজা এবং সর্দাররা পুরুষানুক্রমে রাজদরবারে যথাযোগ্য সম্মান পেত বিক্রম তাদের যথেচ্ছভাবে অসম্মান করতেও কসুর করল না। সামরিক বিভাগে যে সব সর্দাররা এতকাল যে মর্যাদা পেয়ে আসছিল রাণা বিক্রমজিৎ তা কেড়ে নিয়ে মল্লযোদ্ধা এবং পদাতিক সৈন্যদের হাতে দিয়ে দিল। বিক্রমজিতের দুর্ব্যবহারে রাজ্যের শান্তি এবং শৃঙ্খলা গেল নষ্ট হয়ে। সুযোগ বুঝে অনার্য পাহাড়ীরা চুরি ডাকাতি শুরু করে দিল চিতোরে। পাহাড়ী দুর্বৃত্তদের দমন করার জন্যে সর্দারদের সাহায্য চাইল বিক্রমজিৎ।

কিন্তু সর্দাররা রাণার ডাকে সাড়া দিল না। তারা বললে, 'আপনার প্রিয় পদাতিক এবং মল্লযোদ্ধারা থাকতে আর আমরা কি করতে পারবো।'

মজাফরকে চিতোরের কারাগারে বন্দী করে রেখে স্থলতানবংশের মুখে চূনকালি লেপে দিয়েছিল পৃথ্বীরাজ। এর যোগ্য প্রতিফল দেবার জন্যে গুর্জরের বাহাত্বর স্থযোগের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন। এই উপযুক্ত সময়। বিপুল সৈন্য সমাবেশে চিতোর অভিযানে বেরিয়ে পড়ল সে। মান্দুরাজার সৈন্যরাও এসে যোগ দিল এই অভিযানে। রাণা বিক্রম কিন্তু ভয় পেল না। নিজের সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাহাত্বরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে এগিয়ে গেল। বুন্দির মধ্যে লৈচা নামে এক জায়গায় গিয়ে তাঁবু গাড়ল। দুই দলে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। চিতোর সৈন্যরা বাহাত্বরের সৈন্যদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না দেখে সামন্ত এবং সর্দাররা চিতোর এবং বিক্রমজিতের শিশুপুত্রকে রক্ষা করার জন্যে চিতোরে চলে এল। বিক্রমের প্রতিটি সৈন্য শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও রাণাকে রক্ষা করতে পারল না।

সামন্ত সর্দাররা রাণার ওপর ক্ষুব্ধ। এই ঘোর বিপদের দিনে কে রক্ষা করবে চিতোর? বিধর্মী মুসলমানের আক্রমণে চিতোরের সব গৌরব সব ঐতিহ্য বুঝি ধ্বংস হয়ে যায়। রাজস্থানের অন্যান্য রাজারা এ সংকট সময়ে আর চুপ করে থাকতে পারল না। মুসলমানদের হাত থেকে চিতোর রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে সবাই জীবন পণ করে বাহাত্বরের সৈন্যর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মধ্য ভারতের মুসলমানরা যত বার চিতোর আক্রমণ করেছিল তারমধ্যে বাহাত্বরের আক্রমণই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। বাহাত্বরের সৈন্যদের মধ্যে লাব্রীখাঁ নামে এক ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। তার সাহায্যে বাহাত্বর কতকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করেছিল। চিতোর হুর্গের অনতি দূরে বিক পাহাড়ের কাছে এক স্থড়ঙ্গ কেটে মাটির তলায় বারুদ পুরে আগুন লাগিয়ে দিল লাব্রী খাঁ। তার ফলে চিতোর হুর্গ প্রকারের পঁয়ত্রিশ হাত পরিমাণ জায়গা ধসে পড়ে গেল। সত্ত ও ছুছু নামে চন্দাবৎ বংশের দুজন যোদ্ধা একদল সৈন্য নিয়ে সেই ভগ্নপ্রাচীর পাহারা

দিতে লাগল। দলে দলে বাহাদুর-সৈন্য চিতোর দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল এই প্রবেশ পথ দিয়ে। চিতোর বীরসন্তানদের নির্মম তরবারির আঘাতে মুসলমান সৈন্যরা নিহত হতে লাগল। কিন্তু বাহাদুরের সৈন্য সংখ্যা অপরিমিত। একদল নিহত হওয়া মাত্র আর একদল এসে রাজপুতের তরবারির তলায় মাথা পেতে দেয়। সারা চিতোর রাজধানীতে হাজার হাজার মুসলমান সৈন্যে ছেয়ে গেল। যেদিকে তাকানো যায়, পঙ্গপালের মত শুধু মুসলমান সৈন্য। চিতোর রক্ষার আর কোন আশা নেই। অবশেষে রাজমহিষী রাঠোর কুমারী জহরবাঈ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু সৈন্যর সামনে এসে দাঁড়াল। প্রবল পরাক্রমে বহু মুসলমান সৈন্য নিহত করে সেই রণক্ষেত্রেই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করল সে।

সংগ্রামসিংহের শিশুপুত্রকে রক্ষা করার জন্যে সামন্ত ও সর্দাররা উপায় চিন্তা করতে লাগল। সকলে মিলে ঠিক করল, চিতোর সিংহাসনে অন্য একজন রাজা অভিষিক্ত হয়ে নিজেকে বলি না দেওয়া পর্যন্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রসন্ন হবে না। সূর্যমল্লর ধাইপুত্র দেবলরাজ বাঘজী 'একদিন কা সুলতান' হওয়ার লোভে দেবীর বলি হতে রাজি হয়ে গেল। সংগ্রামসিংহর শিশুপুত্র উদয়সিংহকে বুন্দির রাজা শূরতানের আশ্রয়ে রাখা হল।

এদিকে নিদারুণ শোকাবহ জহরব্রতের আয়োজন হতে লাগল। অর্জুন হারের ভগ্নী রাজমাতা কর্ণবতী চিতোর দুর্গের তের হাজার রাজপুত নারী সঙ্গে করে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।

ভাঙ্গা প্রাচীরের পথ দিয়ে পিলপিল করে শত্রুসৈন্য দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুর্গের সিংহদ্বার খুলে দেওয়া হল। বাকী রাজপুতবীরদের সঙ্গে নিয়ে দেবলরাজ বাঘজী ক্রুদ্ধ সিংহের মত লাফিয়ে পড়ল শত্রুসৈন্যের ওপর। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রক্ত-পিপাসার শান্তি হল।

চিতোরের পথঘাট শ্মশান হয়ে গেল। মানুষের মৃতদেহে মাটি দেখা যায় না। চারদিকে শুধু মর্মভেদী আর্তনাদ। এ যুদ্ধে চিতোরের বত্রিশ হাজার বীর প্রাণ উৎসর্গ করেছিল।

মিবার জয় করে মাত্র পনের দিন চিতোরে ছিল বাহাদুর। তারপর

খবর এল, হুমায়ুন গুর্জর অধিকার করার জন্য অভিযান করেছে। আর দেরি না করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে চিতোর ত্যাগ করে নিজের রাজ্য রক্ষা করতে গুর্জরে ফিরে গেল বাহাদুর।

রাণী কর্ণবতীর সঙ্গে হুমায়ুনের 'রাখীভাই' সম্বন্ধ ছিল। বিপদের সময়ে রাজপুত মেয়েরা তাদের 'রাখীভাই'কে স্মরণ করে থাকে। এবং 'রাখী ভাইরা' ধর্মভগ্নীর জীবন ও ইজ্জত রক্ষার জন্যে নিজেদের জীবনপণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। রাজপুত মেয়েরা পশমের ডোরে অথবা মূল্যবান রত্নহারে রাখি তৈরি করে রাখীভাইকে পাঠায়। আর তারা নারীর ইর্জ্জৎরক্ষার নিদর্শন হিসেবে রেশমের অথবা মনিমুক্তা খচিত সোনার তৈরি কাঁচুলী উপহার পাঠায় রাখীবোনদের। চিতোরের এই ঘোর বিপদে রাণী কর্ণবতী হুমায়ুনকে স্মরণ করেছিল। কিন্তু হুমায়ুনের কাছে সংবাদ পৌছনর আগেই বাহাদুরের সৈন্যরা চিতোর ধ্বংস করে ফেলে দিল। তাই আর চিতোরে না এসে গুর্জরের দিকে এগিয়ে গেল সসৈন্য হুমায়ুন। দিন কয়েকের মধ্যেই গুর্জর জয় করে নিল সে। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল বাহাদুর। মান্দুর রাজা বাহাদুরকে সাহায্য করেছিল। মান্দুও অধিকার করে নিল হুমায়ুন। এবং বিক্রমজিতকে বসাল মান্দুর সিংহাসনে।

হুমায়ুনের সাহায্যে চিতোরের বিপদ কেটে গেল। আবার নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে লাগল বিক্রমজিৎ। এই রকম বিপদের মধ্যে পড়েও কিন্তু বিক্রমজিতের শিক্ষা হল না। তার চরিত্রের কোন সংশোধন হল না। আবার উশৃঙ্খল হয়ে উঠল বিক্রম। আবার অত্যাচার শুরু হল সামন্ত সর্দারদের ওপর। বিপদের দিনে তার বাবা সংগ্রামসিংহকে আশ্রয় দিয়েছিল, প্রতিপালন করেছিল করিমচাঁদ। সেই করিমচাঁদকে এক তুচ্ছ কারণে রাজসভায় সকলের সামনে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করল বিক্রমজিৎ। বৃদ্ধ করিমের ওপর এই নৃশংস ব্যবহারে সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তেই ঠিক হল, বিক্রমকে সিংহাসন-চ্যুত করা হবে। চন্দাবৎ সামন্ত কানজী রাজসভায় উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললে, 'শোন বন্ধুগণ, এতদিন শুধু আমরা ফুলের গন্ধই গ্রহণ করছিলাম, কিন্তু এবার তার স্বাদ

কেমন তাই জানতে চাই।'

সর্দাররা সবাই মিলে পৃথ্বীরাজের উপপত্নীর পুত্র বনবীরকে চিতোরের সিংহাসনে বসাল।

হতভাগ্য বিক্রমজিৎ সিংহাসন-চ্যুত হয়েও চিতোরের রাজপরিবারের মধ্যেই বসবাস করতে লাগল। এই সময় সংগ্রামসিংহর শিশুপুত্র উদয় সিংহর বয়স মাত্র ছয় বৎসর। নাবালক উদয়সিংহর পক্ষে রাজকার্য দেখা শোনা করার জন্যেই বনবীরের হাতে মিবারের শাসন-দণ্ড তুলে দিয়েছিল সর্দাররা। কিন্তু নানা সদগুণের মানুষ হয়েও সিংহাসন হাতে পেয়ে মাথা ঠিক রাখতে পারল না বনবীর। লোভ এসে মাথা-চাঁড়া দিল। চিতোর রাজ্য যাতে চিরকালের জন্য তারই আয়ত্বে থাকে সেই চিন্তা কুরে খেতে লাগল তাকে। উদয়সিংহ বেঁচে থাকতে তার এ আশা ফলবে না, তাই ঠিক করল, চিরদিনের মত উদয়কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবে সে।

সেইদিনই রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, পাষণ্ড বনবীরের তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে চিতোরের অন্ধকার চিৎকার করে উঠল। রাজপুত কলঙ্ক শয়তান বনবীর ঘুমন্ত বিক্রমজিতের বুক থেকে রক্তাক্ত ছুরিটা টেনে বের করে উন্মত্তের মত ছুটল উদয়সিংহর ঘরের দিকে। রাজপুরীর মধ্যে মহা-রোল উঠল।

খাওয়াদাওয়া সেরে উদয়সিংহর ধাত্রী রাজকুমারের মাথার কাছে বসে হাওয়া করছিল। রাত্রির অন্ধকার চিরে ঐ দারুণ আর্তনাদে শিউরে উঠল সে। মুহূর্তের মধ্যেই সে বুঝে নিল, কি ঘটেছে, কি ঘটতে পারে। ও শয়তান তো শুধু বিক্রমজিতকে হত্যা করেই চুপ করে থাকবে না। তার আসল প্রতিবন্ধক তো এই উদয়। কিন্তু এখন কি উপায়? ধাত্রী পান্না এক নিমেষেই সব ঠিক করে নিল। পাশেই ছিল রাজবাড়ির নাপিত। ঘুমন্ত উদয়কে আস্তে করে তুলে একটা ফুলের ডালার মধ্যে শুইয়ে ওপরে কিছু ফুল বিছিয়ে নাপিতকে বললে, 'তুমি একে নিয়ে সোজা দুর্গের বাইরে চলে যাও। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

নাপিতকে বিদায় করে দিয়ে ধাত্রী পাশের ঘর থেকে উদয়ের সমবয়সী

তার নিজের শিশুপুত্রকে এনে উদয়ের বিছানায় শুইয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই রক্তাক্ত ছুরি হাতে বণবীর উপস্থিত হয়ে পশুর মত গর্জে উঠল।
'—উদয় কোথায় ?'

দরজার পাশে অধোবদনে দাঁড়িয়ে ধাত্রী পান্না। কি বলবে সে ? নিরুত্তর ধাত্রীর স্পর্ধায় ক্রোধে ফেটে পড়ল বনবীর। দাঁতে দাঁত চেপে ধাত্রীকে চোখের আগুনে ছাই করে দিতে চাইল সে।

'—বল, কোথায়, উদয় ?'

মুখ তুলল না, চোখ খুলল না, শুধু হাত দিয়ে বিছানাটা দেখিয়ে দিতে পারল ধাত্রী পান্না।

দু' বছরের একটা শিশুর হৃৎপিণ্ডের আর্তনাদে ধাত্রী পান্নার হৃৎপিণ্ডটাও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল বুক থেকে। কিন্তু এই বিপদের দিনে শোক করার সময় নেই। তার সামনে আরও অনেক বড় কাজ! নিজের সদ্য-মৃত শিশু-পুত্রের জন্যে প্রাণ ভরে কাঁদার চাইতে কি আরও কোন বড় কাজ কোন মায়ের কখনও থাকতে পারে ? শুধু কর্তব্য ছাড়া ধাত্রী পান্নার বুকে কি তবে মায়ের মমতা বলে কিছু ছিল না!

বনবীর বেরিয়ে যেতেই বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ধাত্রী পান্না। কিন্তু নিজের পুত্রের এই নিদারুণ মৃত্যুর মুহূর্তে চিৎকার করে কাঁদারও জো নেই। হয়তো বনবীরের মনে সন্দেহ জাগবে। হয়তো এখুনি আবার সে ফিরে এসে উদয়কে পরীক্ষা করে দেখবে! পুত্রের কপালে একটা চুমু দিয়ে উঠে দাঁড়াল পান্না। সামনের সারা দেওয়াল জুড়ে এক প্রকাণ্ড আয়না। শুধু এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে একবার নিজেকে দেখে নিল পান্না। তার চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক রকমের শান্ত, স্থির। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। না, এ তো চোখের জল নয়, এ যে বুকের রক্ত অশ্রুধারা হয়ে ঝরে পড়েছে।

চিতোরের পশ্চিম দিকে বীরা নদী। সেই নদীর তীরে উদয়কে মাথায় নিয়ে পান্নার প্রতীক্ষা করছিল নাপিত। পান্না এলে দুজনে যুক্তি করে সিংহরাও বাঘজীর পুত্র দেবলরাও সিংহরাওএর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল

তারা। কিন্তু বনবীরের ভয়ে দেবলরাজ আশ্রয় দিল না। অগত্যা রাজকুমারকে নিয়ে পান্না তুঙ্গরপুরের সামন্তরাজা ঐশকর্ণর কাছে গেল। কিন্তু সেও বনবীরের ভয়ে আশ্রয় দিতে রাজি হল না। অবশেষে বৃদ্ধা-ধাত্রী কমলমীরের কুম্ভমেরু তুর্গে গিয়ে আশা-শার কাছে আশ্রয় চাইল। সেও প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু আশা-শার মা তাকে বললে, 'প্রভুপুত্রকে আশ্রয় দিলে তোমার কোন অকল্যাণ হবে না, তুমি উদয়কে রক্ষা কর।'

এ আদেশ অমান্য করতে পারল না আশা-শা। তার ভাগিনেয় পরিচয়ে আশা-শার আশ্রয়ে বড় হতে লাগল উদয়। কিন্তু যত দিন যায়, উদয় এর শৌর্য দেখে সকলের মনেই সন্দেহ জাগতে থাকে। জৈনধর্মী আশা-শার ভাগিনেয় বলে কেউই বিশ্বাস করতে চায় না।

একদিন শোনিগুরু সর্দার কমলমীরে এসে উপস্থিত হল। রাজ-কুমারের তেজস্বিতা, মর্যাদা প্রদর্শন এবং উদার ভাব দেখে তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধল। ধীরে ধীরে সারা মিবারে ছড়িয়ে পড়ল এই গুপ্ত সংবাদ। সর্দার এবং সামন্ত-রাজারা আনন্দে মেতে উঠল। এই সুযোগে রাজকুমারের আসল পরিচয় সকলের সামনে প্রকাশ করে দিল ধাত্রী পান্না। কমলমীর তুর্গে মিবারের সমস্ত সর্দার ও সামন্তদের ডেকে এক সভা করা হল। কোতারিওর চৌহান উদয়সিংহর জীবনের সমস্ত ঘটনাই গোড়া থেকে জেনেছিল আশা-শাব কাছে। কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে এ জন্যে সেই সভার মধ্যেই চৌহান রাজা একপাত্রে কুমার উদয়এর সঙ্গে আহার করল। তখনি, কমলমীর তুর্গে, সকলের সামনে উদয়এর কপালে চিতোরের রাজটীকা পরিয়ে দিল প্রধান সামন্তরা।

যেদিন মালবরাজা বিধবা কন্যার সঙ্গে হামীরের বিয়ে দিয়ে পবিত্র শিশোদীয়বংশ কলঙ্কিত করেছিল সেইদিন থেকে শোনিগুরুর বংশের সঙ্গে কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ হবে না বলে এক বিধান করে গিয়েছিল হামীর। এতদিন সে বিধান পালিতও হয়ে আসছিল। কিন্তু শোনিগুরু রাওপ্রমার উদয়সিংহর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে এই বিধি ভেঙ্গে দিল।

এদিকে দাসীপুত্র খল বনবীরের তুরাশা ছিল, উচ্চ বংশজাত সামন্ত-

রাজারা তাকে 'রাণার' যথা যোগ্য সম্মান করবে। কিন্তু কোন সামন্তরাজার কাছ থেকেই সে ধরনের সম্মান আদায় করতে পারেনি সে।

রাজপুত রাজারা যখন খেতে বসত তখন কোন কোন যোগ্য সর্দার সেখানে উপস্থিত থাকতে পারত। রাজার খাদ্যাবশেষ থেকে কিছু খেতে পেত তারা। এই খাদ্যকে 'তুনা' বলা হয়। এক দিন বনবীর খেতে বসে এক চন্দাবৎ সর্দারকে তুনা খেতে বলে। রাগে ফেটে পড়ল চন্দাবৎ!

'—বাপ্পার পবিত্র বংশধরের তুনা পেলে মাথায় তুলে নিতাম, কিন্তু দাসীপুত্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা অসম্ভব।'

চন্দাবৎ সর্দারকে অপমান করার ফলে অন্যান্য সর্দাররাও দারুণ চটে গেল বনবীরের ওপর। কি উপায়ে বনবীরকে সিংহাসন-চ্যুত করে চিতোরের সিংহাসনে উদয়সিংহকে এনে বসানো যাবে সেই চিন্তায় সর্দাররা অধীর।

একদিন আরাবল্লী পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কমলমীরে যাচ্ছিল সর্দাররা। কিছুদূর যেতেই দেখতে পেল, প্রায় পাঁচ শো ঘোড়া ও প্রায় হাজার খানেক মোষের পীঠে বোঝাই করে বনবীরের কন্যার বিয়ের যৌতুক আসছে কচ্ছদেশ থেকে। তখনি সর্দাররা তাদের আক্রমণ করে সমস্ত যৌতুক সামগ্রী কেড়ে নিয়ে গেল কমলমীরে। উদয়সিংহর বিয়েতে এগুলোই যৌতুক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। শুধু মাহোলী ও মালজী নামে দু'জন শোলাঙ্কি সর্দার ছাড়া রাজস্থানের আর সমস্ত সামন্ত রাজা এবং সর্দাররা উপস্থিত হয়েছিল উদয়সিংহর বিয়েতে। মাহোলী ও মালজীকে প্রতিফল দেবার জন্যে সর্দারবা এগিয়ে গেল। এই দুই বন্ধুকে সাহায্য করার জন্যে বনবীর তাদের পক্ষে তরবারি ধরল, কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের প্রাণ রক্ষার দুরাশা বুকে চেপেই চিতোরে পালিয়ে আসতে হল বনবীরকে। মালজী এ যুদ্ধে প্রাণ দিল, আর মাহোলী পরাজিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে দলে এল।

আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত, নিঃসহায়, নিঃসম্বল বনবীর নিরুপায় হয়ে চিতোরের তোরণ অবরোধ করে বসে রইল। কিন্তু উদয়সিংহর এক হাজার সৈন্য চিতোর আক্রমণ করে বনবীরকে সিংহাসন-চ্যুত করল। উদয় সিংহাসনে বসল। বনবীরকে প্রাণে মারতে ইচ্ছে ছিল না কারো। নিজের

ধনসম্পত্তি এবং আত্মীয়স্বজন নিয়ে মিবার ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গেল সে। বর্তমানে নাগপুরের ভোসলারা তার বংশের এক শাখা।

উদয়সিংহর অভিষেকের সময় রাজপুত মেয়েরা যে সব গান রচনা করেছিল আজও প্রতি বছর ঈশানী পুজোর সময় সে-সব গান গাওয়া হয়ে থাকে।

১৫৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসনে বসল উদয়সিংহ। বিক্রমজিতের অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতায় যে সব অনর্থ ঘটেছিল উদয়সিংহর রাজত্বকালে তা আর ঘটবে না এই রকম আশাই করেছিল সবাই। কিন্তু দেখা গেল উদয়সিংহ বিক্রমজিতেরই আর এক সংস্করণ মাত্র। তার মত কাপুরুষ শিশোদীয়কুলে আর কেউ জন্মায়নি। যে সব গুণ রাজার অলঙ্কার তার একটিও উদয়সিংহর চরিত্রে ছিল না।

হীনবীর্য হয়েও আলস্যে ও বিলাসিতায় কোন রকমে হয়তো সারাটা জীবন কাটিয়ে যেতে পারত উদয়সিংহ, কিন্তু তাও তার ভাগ্যে ছিলনা। প্রবল প্রতাপ আকবর তাকে আর নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে দিল না।

৮

আকবরের যখন জন্ম হয়, তার পিতা হুমায়ুন তখন রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে অমরকোটের পার্বত্য অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। হুমায়ুন যখন সম্রাট, তখন তার সহোদর ভাইরা ছোট ছোট সামন্ত-রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিল। এই নিয়ে ভাইদের সঙ্গে দশ বৎসর ধরে বিবাদ চলতে থাকে তার। সেই সুযোগে শের শাহ পাঠান দিল্লী অধিকার করে হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে।

সিংহাসন-চ্যুত হওয়ার পর কি অমানুষিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল হুমায়ুনকে ইতিহাস তার সাক্ষী হয়ে আছে। কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে যেখানেই আশ্রয় নিতে গেছে সে সেখান থেকেই
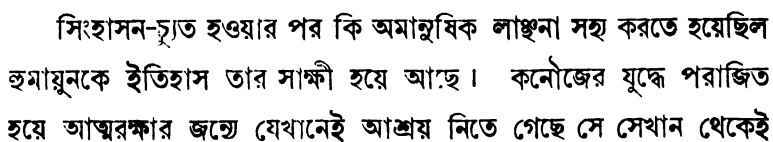
তাকে বিতাড়িত করেছে শত্রু পক্ষরা। পথশ্রান্ত পরিবারবর্গ এবং কিছু বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে পথে পথে ঘুরে যার কাছে গিয়ে আশ্রয় চাইল সে-ই ফিরিয়ে দিল তাকে। সারা ভারতের কোন রাজাই তাকে ঠাঁই দিল না। নিরাশ হয়ে, শেষে, সিন্ধুপ্রদেশে এসে হাজির হল হুমায়ুন। মুলতান থেকে সাগর সঙ্গম পর্যন্ত সিন্ধুতীরে কতকগুলো দুর্গ তৈরি করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু সে চেষ্টাও সফল হল না। যে কয়েক জন বিশ্বাসী সৈন্য এতদিন তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল শেষে তারাও বেঁকে বসল। অগত্যা তাদের ছেড়ে দিয়ে একাই অনির্দিষ্ট পথে পাড়ি দিল হুমায়ুন। চিন্তায় চিন্তায় মনের আশা মনেই শুকিয়ে যেতে থাকল। যশল্মীর, যোধপুর, ভট্টি একে একে সব দেশের রাজার কাছেই আশ্রয় চাইল সে, কিন্তু কেউই তাকে আশ্রয় দিতে ভরসা পেল না। মালদেবের কাছে গেল হুমায়ুন। ধূর্ত মালদেব আশ্রয় দেবার ছুতোয় তাকে কারারুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করল। বিচক্ষণ হুমায়ুন আঁচ করে কৌশলে সেখান থেকে সরে পড়ল। আবার মরুস্থলীর অসহ্য খর তাপ সহ্য করে দিন কাটাতে লাগল সে। মরুভূমির ভীষণ চেহারা দেখে সঙ্গের মেয়েরা মৃত্যু ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু অলৌকিক ধৈর্যের সঙ্গে সব যন্ত্রণা অতিক্রম করে, শেষে অমরকোটের সোদা-রাজের প্রাসাদে আশ্রয় পেল হুমায়ুন। মৃতপ্রায় আশা আবার মুকুলিত হতে থাকল। কিছু দিনের মধ্যেই অমরকোট ছেড়ে পারস্যের পথে পা বাড়াল সে।

দুর্ভাগ্যের ঘূর্ণিপাকে পড়ে বারোটা বছর বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল তাকে। এই সময়-কালের মধ্যে কখনও সে গান্ধার জয় করেছে, কখন বা কাশ্মীরে অধিপত্য করেছে, আবার কখনও বিতাড়িত হয়ে পূর্ব-পুরুষের ভিটে তাতারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

এই বারো বছরের মধ্যে একে একে ছ'জন পাঠান ভারত শাসন করে-ছিল। এদের মধ্যে সেকন্দর শাহই শেষ সম্রাট। সেকন্দরশাহ গৃহবিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় হুমায়ুন কাশ্মীরে বসে সবই লক্ষ্য করছিল। এই সেই সুযোগের দিন। সৈন্য সামন্ত নিয়ে সিন্ধু পার হয়ে শরহিন্দ নামে

এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল হুমায়ুন। কিছু দিনের মধ্যেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এতদিন শুধু গৃহ-বিবাদ নিয়েই শক্তি অপচয় করেছে সেকন্দর শাহ। কিন্তু আর না। সামনে শত্রু হানা দিয়েছে। এবার তাকে ঢাল তলোয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়তেই হল। এই সময় আকবরের বয়স মাত্র বারো বৎসর। এই শৈশব অবস্থাতেই যে অসাধারণ যুদ্ধকৌশল আয়ত্ব করেছিল আকবর তা অনেকেই অলৌকি মনে করে থাকে। তবে মনে হয়,রণ-বিদ্যায় তার অসাধারণ পারদর্শিতার জন্যে তার পিতা হুমায়ুনের শিক্ষকতাই একমাত্র দায়ী। সেকন্দর শাহর সঙ্গে যুদ্ধে বালক আকবরই প্রধান ভূমিকায় নেমেছিল। তার তরবারির আঘাতে শত্রুসৈন্য একপাও এগোতে পারল না। আকবরের প্রচণ্ড বিক্রমে সেকন্দর শাহর সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে কতক প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বাঁচল, আর বাকী সব তার পায়ের তলায় দলিত হল।

বীর পুত্রের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করে আবার দিল্লীর সিংহাসনে এসে বসল হুমায়ুন। যে সিংহাসনের জন্যে এত দুঃখ কষ্ট তুচ্ছ করে এই দীর্ঘ বারোটা বছর অতিক্রম করে এল সে-সিংহাসন কিন্তু বেশী দিন তার ভাগ্যে সইল না। দিল্লীর পাঠাগারের ওপরের মঞ্চ থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর আকবর ভারতের সম্রাট হল। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লী এবং আগ্রা তার হাতছাড়া হয়ে গেল। অগত্যা পঞ্চনদ প্রদেশের এক প্রান্তে গিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হল তাকে। কিন্তু খুব বেশী দিন এভাবে কাটাতে হয়নি। বৈরাম খাঁর সাহায্যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই শত্রু বিতাড়িত করে আবার দিল্লী দখল করল আকবর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার গুণে অল্প সময়ের মধ্যেই সারা ভারতে আবার আধিপত্য বিস্তার করে ফেলল সে।

এইবার প্রতিশোধের পালা। মালদেব আশ্রয়দাতার মুখোশ পরে তার নিঃসম্বল নিরাশ্রয় পিতাকে কারাগারে বন্দী করে রাখবার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ খবর শোনার পরই মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল

আকবর। প্রথমেই মারবারের সমৃদ্ধশালী নগর মৈরতা অধিকার করে বসল সে। মাত্র আঠারো বছরের এক যুবকের পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করল অম্বরের রাজা ভরমল ও তার পুত্র ভগবান দাস। এবং নিজের কন্যাকে তুলে দিল আকবরের হাতে।

এই সময় আকবরের উজবেকী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়। দৃঢ় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল আকবর। এক সময় খবর এল, মালবের পদচ্যুত রাজা ও নরবরের অধিপতি চিতোরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। চিতোরের রাণা তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্রোধে জ্বলে উঠল আকবর। এক মুহূর্তও দেরি না করে তখনি চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান করল সে।

অপদার্থ উদয়সিংহ কোন দিক দিয়ে প্রবল পরাক্রম আকবরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। জন্মের পর থেকেই দারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে আকবর জীবনকে উপলব্ধী করতে পেরেছিল। উদয়সিংহ আজীবন সুখে লালিত। জীবন সম্বন্ধে কোন বোধই তার জন্মায়নি। দিনরাত সে মেয়ে-মানুষ আর মদ নিয়ে পড়ে থাকত। শোনা যায়, এক বারবনিতার হাতেই নাকি তার ভাগ্য ছেড়ে দিয়েছিল উদয়সিংহ। এই পতিতা মেয়ে-মানুষের হাতেই মিবারের শাসনভার পলিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল সে।

আকবরের বীরত্ব সহ্য করতে পারে তেমন বীর তখন ভারতে ছিল না। ফলে অনায়াসেই চিতোর আকবরের অধিকারে এল। এর আগে আলাউদ্দিন এবং বাহাদুরের আক্রমণে চিতোর ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু আকবরের নৃশংস অত্যাচারের কোন নজির মেলে না। এর আগে দু'বার মুসলমান আক্রমণে চিতোরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আকবর শুধু ক্ষতি করে ক্ষান্ত হল না। চিতোরকে ভয়াবহ শশ্মান করে দিয়ে গেল সে। কোন জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত রইল না, বন্য জন্তু জানোয়ারের আস্তানা হয়ে দাঁড়াল মাত্র।

মুসলমান ইতিহাসে পাওয়া যায়, আকবর একবার মাত্র চিতোর

আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে আছে, সে দু'বার আক্রমণ করেছিল চিতোর। প্রথম বার উদয়সিংহর বারবনিতার বীরত্বের সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল আকবরকে। প্রথম বারে যুদ্ধ জয়ের পর সর্দার ও সামন্তদের সামনে বারবনিতার প্রশংসায় গদগদ হয়ে উদয়সিংহ বলেছিল, 'এই বীর্যবতী নারীর সাহায্য না পেলে আমি কখনই শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতাম না।'

রাণা উদয়সিংহর মুখে এক সামান্য বারবনিতার, এই ধরনের, প্রশংসা শুনে সামন্ত ও সর্দাররা অপমানে ক্রোধে সেই বারনারীকে হত্যা করল একদিন। এই মেয়েমানুষটিকে কেন্দ্র করে চিতোরে যে অন্তর্বিপ্লবের শুরু হল তারই সুযোগে আকবর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে চিতোর ধ্বংস করে।

চিতোর থেকে দশ মাইল দূরে আকবর শিবির স্থাপন করেছিল। সেই শিবিরের মধ্যে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল আকবর। তার নাম 'আকবর-কা দেওয়া'। অর্থাৎ আকবরের দীপ মন্দির। চিতোরে আজও এই দীপ মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যায়।

এই দারুণ দুর্দিনে রাজস্থানের অন্যান্য রাজারা চিতোর রক্ষার জন্যে এসে জড়ো হল। অসংখ্য চন্দাবৎ-সৈন্য নিয়ে শহিদাস চিতোরের সূর্য-তোরণ রক্ষার জন্যে জীবনপণ যুদ্ধ করতে লাগল। যতক্ষণ সে জীবিত ছিল একজন আকবর সৈন্যও সে তোরণদ্বার দিয়ে দুর্গে ঢুকতে পারে নি। ঐ তোরণদ্বারে যেখানে রক্তাক্ত দেহে প্রাণ বিসর্জন করেছিল শহিদাস, আজও এক চিতা বেদিকা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। শহিদাসের পতনের পর সঙ্গর বীর বংশধরদের নিয়ে নাদেরিয়ার রাবৎদুদা এগিয়ে এল। সঙ্গর বংশধররা চন্দাবৎ গোত্রের এক শাখা। এরা সঙ্গাবৎ নামেও পরিচিত। এদিকে বৈদলা ও কোতেরা থেকে চৌহান পৃথ্বীরাজের বংশধর দুই সামন্তরাজা, বিজলি ও সদ্রি থেকে প্রমার ঝালাপতি, বেদনোরের রাজা জয়মল্ল ও কৈলবার শাসনকর্তা পুত্ত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু সৈন্যর ওপর। এদের মধ্যে জয়মল্ল ও পুত্ত আজও রাজপুতদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। রাণা উদয়সিংহ কিন্তু এইসব যোদ্ধাদের কোন সাহায্য চেয়ে পাঠায় নি।

এরা নিজে থেকেই এগিয়ে এসেছিল সবাই। এ মহাযুদ্ধে বহু অসূর্যম্পশ্যা ক্ষত্রিয় কন্যাও রণচণ্ডী বেশে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন উৎসর্গ করেছিল।

শহিদাসের মৃত্যুর পর সূর্যতোরণ রক্ষার দায়িত্ব নিল ষোল বছরের বীর পুত্ত। চিতোর রক্ষার জন্যেই পুত্তর পিতা জীবন উৎসর্গ করেছিল। সেদিন পুত্তর বিধবা জননী নিজের হাতে সন্তানকে রণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়েছিল। শুধু পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হল না, বালিকা পুত্রবধূকেও লৌহবর্মে আবৃত করে, সঙ্গে নিয়ে, নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল পুত্তজননী। এই দুই বীরাঙ্গনার অপূর্ব বীরত্ব দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

পুত্তর জননী ও জায়ার এই বীরত্ব দেখে অন্যান্য রাজপুত নারীরাও রণমদে মত্ত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। হঠাৎ সেনাপতি জয়মল্ল শত্রুর গুলি বিদ্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার আর কোনও উপায় নেই। তখনই সেই ভয়ঙ্কর জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করা হল। চিতোরের তোরণদ্বার খুলে দেওয়া হল। আট হাজার রাজপুত যোদ্ধা আমরণ লড়াই করে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিহত করল। একত্রিশ হাজার রাজপুতবীরের রক্তে মোগল সম্রাট আকবরের পিপাসা মিটল। স্বর্গাদপী গরিয়সী চিতোর রক্ষার জন্যে সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু আকবরের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে চিতোরকে উদ্ধার করা সম্ভব হল না। অসংখ্য রাজপুত বীরের ছিন্ন-মস্তক পদদলিত করে রক্তরঞ্জিত পায়ে চিতোর দুর্গে প্রবেশ করল আকবর। ১২২৪ সংবতে (১২৬৮ খৃঃ) ১২ই চৈত্র রবিবার চিতোর জনশূন্য এক শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। পাষণ্ড আকবরের নির্দেশে চিতোরের সুন্দর সুন্দর দেবালয় ও রাজপ্রাসাদগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল। ভারত আক্রমণকারীদের মধ্যে আকবরই নৃশংসতম বলে কলঙ্কিত হয়ে আছে। যে সব রাজপুত বীর চিতোর যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল তাদের যজ্ঞপবীত ওজন করে হয়েছিল ৭৪॥০ মণ। তখনকার সময়ে চার সেরে এক মণ ধরা হত। আকবরের আদেশে সেই থেকে খামের চিঠির মুখে ৭৪॥০ লিখতে হত সকলকে। এর মানে, মালিক ছাড়া যে এই চিঠি খুলবে, সে চিতোর ধ্বংসের পাপের ভাগী হবে।

যে বন্দুকের সাহায্যে জয়মল্লকে হত্যা করেছিল আকবর সে বন্দুকটিকে 'সংগ্রাম' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। জয়মল্ল ও পুত্তর অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দিল্লীতে নিজের প্রাসাদের তোরণ-দ্বারে এই দুই বীরের পাষাণমূর্তি স্থাপন করে রেখেছে আকবর।

চিতোর ধ্বংসের অনেক আগে আরাবল্লী পাহাড়ের মাঝে গিরনবো উপত্যকায় উদয়সাগর নামে এক বিরাট সরোবর খনন করেছিল উদয়সিংহ। উদয় সাগরের পাশে এক পাহাড়ের চূড়ায় নচৌকি নামে এক প্রাসাদ তৈরি করেছিল সে। রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর এই প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিয়েছিল রাণা উদয়। অবশ্য চিতোর ছেড়ে সব আগে সে আশ্রয় নিয়েছিল রাজ-পিপ্পলীর বনের মধ্যে কয়েকজন মোহিলার কাছে। তার পরে সে এসে উপস্থিত হয় নচৌকিতে। খুব অল্প কালের মধ্যেই নচৌকির আসে পাশে আরও অনেকগুলো বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে পুরোপুরি একটি নগর গড়ে উঠল সেখানে। রাণা উদয়সিংহ এর নাম দিল উদয়পুর।

জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। কিন্তু মৃত্যুর কিছুদিন আগে জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্র জগমলকেই নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করল উদয়সিংহ। এর ফলে রাণার চব্বিশটি পুত্রের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল। রাজস্থানের নানা জায়গায় এই চব্বিশটি পুত্রের বংশধরদের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে। এরা সবাই রণবৎ নামে পরিচিত।

চিতোর ধ্বংসের চার বৎসর পরে ফাল্গুন মাসের বসন্ত পূর্ণিমার দিনে বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে গোগুণ্ডা নামে এক জায়গায় উদয়সিংহ দেহত্যাগ করে। উদয়সিংহের মৃতদেহ সৎকারের জন্যে অন্যান্য ভাইরা যখন শ্মশানে, সে-সময় জগমল উদয়পুরের সিংহাসনে চেপে বসে নিজেকে রাণা বলে জাহির করল।

শোনিগুরু বংশের ঝালোর রাজকুমারীর গর্ভে উদয়সিংহর যে পুত্র জন্মে তার নাম প্রতাপসিংহ। প্রতাপের মামা নিজের ভাগিনেয়কে উদয়-পুর সিংহাসনে বসাতে চাইল। মিবারের প্রধান সামন্ত চন্দাবৎ-কৃষ্ণও প্রতাপের মামার পক্ষে রায় দিল, 'প্রতাপ জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং সিংহাসনের

প্রকৃত উত্তরাধিকারী সেই।'

কয়েকদিনের সুলতান জগমলের রাজ্যসুখ সম্ভোগ শেষ হয়ে এসেছিল। গোয়ালিয়রের পদচ্যুত রাজা, শোনিগুরু রাজা, চন্দাবৎকৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কয়েকজন সর্দার প্রতাপকে সঙ্গে নিয়ে জগমলের কাছে উপস্থিত হয়ে গোয়ালিয়র-রাজ ও চন্দাবৎ-কৃষ্ণ জগমলকে চ্যাংদোলা করে তুলে সিংহাসন থেকে অনেক নিচে এক আসনে বসিয়ে দিল। শোনিগুরু তখন বললে, 'মহারাজ, আপনি ভুল করেছেন, এই প্রতাপসিংহ আপনার অগ্রজ, উদয়পুরের সিংহাসনে বসার অধিকারী প্রতাপ, আপনি নন।'

এই বলে তারা দেবীদত্ত তরবারি দিয়ে সাজিয়ে, তিনবার ভূমি স্পর্শ করে প্রতাপকে মিবারের রাণা বলে বরণ করে নিল। এবং উপস্থিত সমস্ত সামন্ত ও সর্দররাও এই মঙ্গলাচরণ করে প্রতাপকে অভিষিক্ত করল।

৯

প্রতাপসিংহ চিতোরের 'রাণা' হল। কিন্তু নামেই সে রাণা। প্রতাপের রাজ্য নেই। সহায় সম্বল উপায় কিছুই নেই তার। সামান্য যে কজন বিশ্বস্ত সৈন্য মুসলমানদের প্রলোভন এড়িয়ে তখনও তার অনুরক্ত ছিল তারাও অহরহ যুদ্ধ-বিগ্রহে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। প্রতাপ কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও নিরাশ হয়নি। স্বজাতির হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনার জন্যে সে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু উপায় কি। সে বড় একা। নিঃসহায় নিঃসম্বল। ওদিকে সম্রাট আকবর বিপুল সৈন্যবলে বলীয়ান। কিন্তু মনের সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে প্রতাপ। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার সে মেতে ওঠে।

পূর্ব-পুরুষদের কীর্তি গৌরব স্মরণে এনে নতুন করে প্রেরণা পায় প্রতাপ। সে জেনেছে, চিতোর কখনও অন্যের দাসত্ব স্বীকার করেনি। বরং যে সব শত্রুরা চিতোর অধিকারের লালসায় এগিয়ে এসেছিল তাদের

অনেকেই চিতোর কারাগারে দিন কাটিয়ে গেছে। প্রতাপের বিশ্বাস ছিল, চিতোরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এর আগেও বিপদ এসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় সে-সব বিপদ থেকে চিতোর রক্ষা পেয়েছে। প্রতাপ ভাবে, এ বিপদও বেশীদিন থাকবে না। আবার সে ফিরে পাবে চিতোর, ফিরে পাবে হারানো গৌরব। কিন্তু আকবরের প্রবল শত্রুতায় বিচলিত না হয়েও পারে না সে। রাজস্থানের আত্মীয়স্বজন প্রায় সকলেই মোগল সম্রাটের পায়ের কাছে মাথা মুড়িয়েছে। মারবার, অম্বর, বিকানীর এবং অন্যান্য রাজারা আকবরের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রী করে দিয়েছে। প্রতাপের সহোদর ভাই সাগরজীও আজ আকবরের কেনা গোলাম। রাজপুতরাই আজ রাজপুতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরছে। যে দিকে সে চায়, শুধু হতাশা। তবু আশায় বুক বাঁধে প্রতাপ। মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে, এই তার একমাত্র চিন্তা।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রবল প্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে গেছে প্রতাপসিংহ। কত দিক দিয়ে কত বাধা বিপদ এসে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সব তুচ্ছ করে সংগ্রাম করে গেছে সে। বনবাসের দুঃসময়ে কোনদিন হয়তো স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মুখে অন্ন দিতে পারেনি সে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করে ছেলেমেয়েরা। কান্নায় ফেটে গেছে প্রতাপের বুক। কিন্তু মাতৃভূমি উদ্ধারের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি সে কোনদিন। রাজস্থানের অনেক রাজাই তাদের বংশের গৌরব জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের মেয়ে বোনদের সঁপে দিয়েছিল আকবরের হাতে। এও এক ধরনের নজরানা। বাপ্পার পবিত্র বংশধর হয়ে একথা ভাবতেও ঘিনঘিন করে ওঠে প্রতাপের দেহমন। যারা মুসলমানকে ঘরের মেয়ে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখেনি প্রতাপ। হোক সে নিকটতম আত্মীয়, তবু।

চিতোর ধ্বংস হওয়ার পরে ভট্ট-কবিরা চিতোরকে নিরাভরণা বিধবার সঙ্গে তুলনা করেছে। পিতামাতার মৃত্যু হলে সন্তান যেমন শোকচিহ্ন ধারণ ও কৃচ্ছসাধন করে, প্রতাপ ঠিক সেই রকম কৃচ্ছসাধন করে গেছে জন্মভূমির

মুক্তির জন্যে। ঘাসের শয্যায় শয়ন করত, গাছের পাতায় আহার করত। শুধু নিজে না, বংশধরদেরও এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল প্রতাপ, যতদিন না জন্মভূমি শত্রু মুক্ত হবে ততদিন ভোগ বিলাস বিষের মত জ্ঞান করবে। আগে প্রথা ছিল, সৈন্যদলের পুরোভাগে রণডঙ্কা বাজত। কিন্তু চিতোর পতনের পর প্রতাপের আদেশে সৈন্যদলের পশ্চাতে বাজত রণডঙ্কা। সে সময় থেকে চিতোর রাণারা আজও সে আদেশ পালন করে আসছে। যারা এ নির্দেশ প্যুরাপুরি পালন করতে পারে না তারাও খাওয়ার পাত্রের নিচে একটি গাছের পাতা এবং শয্যার নিচে কয়েকটি ঘাস বিছিয়ে নিয়ে থাকে।

জন্মভূমির দুরবস্থা দেখে প্রতাপসিংহ প্রায়ই দুঃখ করে বলত, কাপুরুষ উদয় যদি না জন্মাত এ-বংশে তাহলে চিতোরকে আজ মুসলমানের পদাঘাত সহ্য করতে হত না। চিতোর ধ্বংসের আগে এক শো বছরের মধ্যে আর্যসমাজে এক অভিনব যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। গঙ্গা যমুনার তীর থেকে বিশাল ভূখণ্ড আগে শ্মশান হয়ে ছিল। এই সময় আবার তা গৌরবের পথে পা দিয়েছিল। অগণিত আর্যবীররা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল। মারবারের মরুভূমি উর্বরা হয়ে উঠছিল। মরুস্থলীর রাজা একাই শেরশাহ পাঠানের মুখোমুখি দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। চম্বল নদীর দুই তীরে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য আবার তাদের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। এই সময় এদের অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিল সংগ্রামসিংহ। তৈমুর-বংশধর বাবর এই সংগ্রামসিংহর বীরত্বের সামনে পড়ে নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করেছিল একদিন। কিন্তু সবই দুর্ভাগ্য। নাহলে সংগ্রামসিংহর মত বীরের পতন হবে কেন। নাহলে উদয়সিংহর মত অপদার্থ রাজার জন্ম হবে কেন।

সামন্তদের পরামর্শে সামরিক কাজে সাহায্য পাওয়ার জন্যে সৈন্যদের মধ্যে নতুন নতুন ভূমিবৃত্তি দান করতে লাগল প্রতাপসিংহ। এই সময় কমলমীরে প্রধান রাজপাঠ স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে গোগুণ্ডা ও অন্যান্য গিরি-দুর্গের সংস্কার করেছিল রাণা প্রতাপ। নিজের অনুরক্ত প্রজাদের

এই পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নিতে আদেশ দিয়েছিল সে। প্রতাপ জানত, প্রশস্ত ক্ষেত্রে বহু সৈন্য প্রেরণ ও পর্বতে সেনানিবেশ করলে বিপক্ষের বেশী সৈন্য ক্ষয় করা সহজ। তার আদেশ অমান্য করে যারা সেই পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নেবে না তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে বলে এক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল। অবশ্য, কোন প্রজাই তার আদেশ অমান্য করেনি। যতদিন এই সংগ্রামের শেষ না হল ততদিন আরাবল্লীর পশ্চিম দিকে বিশাল ভূখণ্ড জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছিল।

আজমীরে শিবির স্থাপন করে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যখন আকবর যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন সারা রাজস্থানের মধ্যে একমাত্র প্রতাপই এগিয়ে এসেছিল তার বোঝাপড়া করতে। মারবারের রাজা শেরশাহর প্রচণ্ড আক্রমণও প্রতিহত করেছিল কিন্তু আকবরের বীরত্বের কাছে তাকে মাথা হেট করতে হল। অম্বরের রাজাও বশ্যতা স্বীকার করল। তার পুত্র উদয়সিংহ সব বংশ-গৌরব খুইয়ে নিজের কন্যা যোধাবাঈকে মোগল সম্রাটের হাতে তুলে দিল। এর বিনিময়ে আকবরের কাছে থেকে জায়গীর পেয়েছিল সে চারটি প্রদেশ। তার বার্ষিক আয় ষোল লক্ষ টাকা। এর মধ্যে গাধবার প্রদেশ নয় লাখ টাকা, উজিন ত্ব'লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নয় শো চোদ্দ টাকা, দেবলপুর এক লাখ বিরাশী হাজার টাকা, এবং বদনাবরের আয় ছিল ত্ব' লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। মালদেবকে নিশানা খাড়া করে রাজস্থানের অন্যান্য রাজারাও গড্ডলিকা প্রবাহে গা গড়িয়ে আকবরের দরবারে গিয়ে হাত জোড় করে রইল। এইভাবে একমাত্র প্রতাপ ছাড়া এক এক করে সব রাজপুতই আকবরের পদলেহন করতে লাগল। প্রতাপ একা পড়ে গেল। প্রায় কোন রাজপুতই আর তার পাশে নেই। এমন কি রাজপুতরাই শত্রু পক্ষের সাগরেত হয়ে খাঁড়া হাতে দাঁড়াল তার বিরুদ্ধে। শুধু বুন্দি। বুন্দির রাজারা নিজেদের ইজ্জত রক্ষা করেছিল। তাই প্রতাপ এই বুন্দি ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে সামাজিক কোন সম্পর্ক রাখল না।

রাজস্থানের ওপর দিয়ে অনেক কাল ধরে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। বহু বিদেশী শত্রু আক্রমণ করেছে দেশ। এ পর্যন্ত কেউই বিজাতীয়কে

কন্যা অথবা ভগ্নী ঘুষ দিয়ে আপোশ করতে যায় নি। কিন্তু এবারে আকবরের পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাবার জন্যে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে লাগল সবাই। প্রতাপের প্রতিজ্ঞা ছিল, পতিত রাজাদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখবে না সে। তার এই প্রতিজ্ঞা সে কি ভাবে পালন করেছিল তার বহু উদাহরণ আছে ভট্ট গ্রন্থে এবং মুসলমান ইতিহাসে।

রাজা মানসিংহ অম্বরের সিংহাসনে বসার পরে নিজের বোনকে আকবরের অঙ্কশায়িনী করে তার রাজ্যের শ্রী বাড়তে লাগল দিনে দিনে। সারা রাজস্থানের মধ্যে ভগবানদাসই প্রথম ব্যক্তি যে আগে নিজের মেয়েকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে ইতিহাসের কলঙ্ক হয়েছিল। ভগ্নীপতির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে মানসিংহ জানপ্রাণ দিয়ে খেটেছিল। সেরকম আকবরও শ্যালকের ওপর তুষ্ট হয়ে যথেষ্ট সম্মান ও সমৃদ্ধি দিয়েছিল। একমাত্র মানসিংহর কল্যাণেই মোগল সম্রাট অর্ধেক ভারত করায়ত্ব করতে পেরেছিল। ককেসাসের তুষার শিখর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য মানসিংহর ক্ষুরধার তরবারির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল! একদিকে কাবুলের পর্বতপ্রাকার, আর একদিকে আরাকানের গভীর জঙ্গল, এই সীমানার মধ্যে যতগুলো রাজ্য ছিল আকবরের হয়ে সবই জয় করেছিল একা মানসিংহ। আর এই কারণেই মুসলমানের আজ্ঞাবহ নোকর হয়েও মানসিংহ ইতিহাসের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে রইল।

শোলা যুদ্ধে জয় পতাকা উড়িয়ে যখন দিল্লীর পথে ফিরে চলেছে তখন কমলমীরে এসে প্রতাপসিংহর আশ্রয়ে একটা দিন কাটিয়ে গিয়েছিল রাজা মানসিংহ। যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে তাকে নন্দিত করা হল। আহারের আয়োজন হল। অম্বররাজ মানসিংহ খাবারের জায়গায় এসে দেখল, রাণা প্রতাপসিংহর বদলে তার পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত সেখানে। প্রতাপসিংহর অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে অমরসিংহ বললে, 'বাবার বড্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, তিনি আপনার খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকতে না পেরে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

মানসিংহর মনে সন্দেহ হল। বললে, 'তুমি বল গিয়ে, তিনি যেন

একবার মাত্র দর্শন দিয়েই চলে যান।' একথা বলাতেও অন্য এক অজুহাতে এল না প্রতাপসিংহ। মানসিংহর সন্দেহ আরও কঠিন হয়ে দানা বাঁধল। প্রতাপের অনুপস্থিতিতে অন্নগ্রহণে অস্বীকার করল রাজা মান। অগত্যা, অতিথির সৎকারের জন্যে প্রতাপকে সামনে এসে দাঁড়াতে হল। এরকম আচরণের কারণ জানতে চাইল মানসিংহ। মহারাণা আর চেপে রাখতে পারল না। সদম্ভে শুনিয়ে দিল।

'—রাজপুত বংশে জন্ম নিয়ে যে লোক মুসলমানের সঙ্গে খানাপিনা করে, আর নিজের বোনকে তাদের হাতে তুলে দেয় তার সঙ্গে বসে আহার করা সূর্যবংশের রাণার সম্ভব না।'

মানসিংহর মুখে কথা নেই। সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে তার সামনে। নিজের অপমান, তখন সে বুঝল, নিজে সাধ করে ডেকে এনেছে সে। কয়েকটি মাত্র অন্ন ইষ্টদেবতাকে উৎসর্গ করেছিল মানসিংহ। সেই কটি অন্ন উষ্ণীষে গুঁজে উঠে পড়ল। আর দাঁড়াল না। নিজের ঘোড়ার পীঠে চেপে প্রতাপকে বললে, 'আপনার সম্মান গৌরব রক্ষা করার জন্যেই আমরা মোগলের হাতে মান ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ বুঝলাম, চিরকাল ঘোর বিপদের মধ্যে যুদ্ধ করতেই আপনার সাধ। ঠিক আছে, তাই হবে। আর বেশীদিন আপনাকে এ রাজ্যে বাস করতে হবে না। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, আপনার দর্প চূর্ণ না করতে পারলে আর আমি নিজেকে মানসিংহ বলে পরিচয় দিব না।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল প্রতাপ, 'আপনার কথায় ভারি আহ্লাদ হল। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আবার আমার সাক্ষাৎ হলে বড় খুশী হব।'

প্রতাপের কথা শেষ হতে না হতেই তার পাশ থেকে এক বয়স্য বলে উঠল, 'সে সময়ে তোমার ফুপা (ভগ্নীপতি) আকবরকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।'

কিন্তু এ সব ইতর বাক্যে কর্ণপাত করার মত সময় কোথায় তার। পীঠে চাবুক কষতেই তড়িৎ গতিতে ছুটে চলল মানসিংহর ঘোড়া।

যে ঘরে মানসিংহর জন্যে আহারের আয়োজন হয়েছিল সে ঘরের

সমস্ত খাবার-দাবার ঝেঁটিয়ে ফেলে দেওয়া হল। তার উপস্থিতিতে সবই যেন অপবিত্র হয়ে গেছে, প্রতাপের মনও।

মানসিংহর অপমান আকবরেরই অপমান। প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল মোগল সম্রাট। হলদিঘাটে মহাসংগ্রামের আয়োজন করা হল। প্রথমবারের যুদ্ধে সেনাপতি হল সেলিম। মন্ত্রী হিসেবে পাশে রইল মানসিংহ এবং সাগরজীর বিধর্মী পুত্র মহব্বৎ খাঁ।

মাত্র বাইশ হাজার রাজপুতবীর এবং সামান্য কিছু ভীল নিয়ে অগণিত মোগল সৈন্যর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল প্রতাপ। এ ছাড়া তার কোন সহায় নেই, সম্বল নেই। উদয়পুরের পশ্চিমে লম্বায় দশ এবং চওড়ায় দশ ক্রোশ ব্যাপী এক বিশাল ক্ষেত্র। এখানে শিবির স্থাপন করল প্রতাপ। উদয়পুরের এক পাশ দিয়ে অত্যন্ত গিরিদুর্গম পথ পেরিয়ে এ জায়গায় যেতে হয়। এই সুবিশাল প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে দিকে তাকানো যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। এই জায়গারই নাম হলদিঘাট।

বর্ষাকাল। ১২৩২ সংবতে, ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে, ৭ই শ্রাবণ মুসলমান সৈন্যরা প্রতাপের সৈন্যদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল। বীর কেশরী প্রতাপসিংহর অসাধারণ রণ-কৌশল দেখে রাজপুত বীরদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে বীর বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমান সৈন্যর ওপর। প্রতাপের প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে মোগল সেনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। সেই ছত্রখান মুসলমান সৈন্যদের দলিত মথিত এবং বিতাড়িত করতে করতে উন্মত্তের মত রাজপুত-কলঙ্ক মানসিংহর অনুসন্ধান করতে লাগল প্রতাপ। কিন্তু কোথায় মানসিংহ। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে দেখতে পেল না কোথাও। প্রতাপের প্রচণ্ড গতি প্রতিরোধ করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগল মোগল সৈন্যরা, কিন্তু কার সাধ্য তার গতি রোধ করে। রাণার তরবারির আঘাতে অসংখ্য মুসলমান সৈন্য জীবন দিল। তার ভল্লর আঘাতে বিদ্ধ হল শতশত শত্রু সৈন্য।

মানসিংহকে দেখতে পেল না প্রতাপ। দেখতে পেল সেলিমকে।

সেলিমের হাতী লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল প্রতাপ ওর পরম সৌভাগ্য, হাতীর হাওদায় গিয়ে লাগল বর্শা। লোহার হাওদায় প্রতিহত হয়ে বর্শা গিয়ে গেঁথে ফেলল মাহুতকে। প্রাণ ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল সেলিম। সেলিমের পিছনে ছুটল প্রতাপের চৈতক। এই সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল মহাসংগ্রাম। এক দিকে সেলিমের প্রাণ রক্ষার জন্যে মোগল সেনারা উন্মত্ত, অন্য দিকে প্রতাপের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে রাজপুত যোদ্ধরা বদ্ধপরিকর। রাজপুত সৈন্যর হাতে অগণিত মুসলমান সৈন্য প্রাণ হারাতে লাগল। কিন্তু আবার ঝাঁকে ঝাঁকে মোগল সৈন্য এসে ভরে ফেলল রণক্ষেত্র। প্রতাপের মাথার ওপরে মিবারের রাজছত্র ধরা মাত্র চারদিক থেকে মুসলমান সৈন্যরা এসে রাণাকে আক্রমণ করল। এবার প্রতাপের প্রাণ-সংকট অবস্থা। তিনটি ভল্লের আঘাত, তিনটি তরবারির ও একটি গুলির আঘাত লেগেছিল প্রতাপের দেহে। তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তে ভেসে যেতে লাগল।

আর দেরি না করে ঝালাপতি মান্না প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে প্রতাপের সামনে গিয়ে হাজির হল। রাণার মাথা থেকে নিজের মাথার ওপর তুলে নিল রাজছত্র। রাজছত্র দেখে শত্রু সৈন্যরা তাকেই রাণা প্রতাপ বলে ভুল করল। রাণাকে ছেড়ে তার দিকে তেড়ে এল মোগল সৈন্য। অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে, অসংখ্য শত্রু-সৈন্য সংহার করে জীবন উৎসর্গ করল মান্না।

ঝালাপতির এই আত্মত্যাগে জন্যে সে যাত্রা প্রতাপের প্রাণ রক্ষা হল। সেই থেকে মান্নার বংশধররা রাজা উপাধিতে ভূষিত হতে থাকে। সদ্রি এবং অন্যান্য ভূমিবৃত্তি দিয়েও সম্মানিত করা হয়েছিল তাদের।

প্রতাপের সেনাবলের চেয়ে মোগল সেনাবল শতগুণে বেশী। এ ছাড়া মোগল সৈন্যরা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত। প্রথমদিনের যুদ্ধ শেষ হল। প্রতাপের বাইশ হাজার সৈন্যর মধ্যে আর মাত্র আট হাজার জীবিত রইল।

রণশ্রমে প্রতাপ ক্লান্ত। চৈতকের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত-গঙ্গা বয়ে চলেছে। একাই যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে প্রস্থান করল প্রতাপ। প্রভুকে পীঠে

নিয়ে তখনও চৈতক ছুটে চলেছে গিরিদুর্গের দিকে। এই সময় প্রতাপকে লক্ষ্য করেছিল একটি মুলতানি এবং একটি খোরাসানি সৈন্য। এই দুই শত্রুসৈন্য প্রতাপকে অনুসরণ করে যেতে লাগল। পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এক খরস্রোতা নদী। চৈতক এক লাফেই সে নদী পার হয়ে গেল। কিন্তু মুলতানি, খোরসানিদের ঘোড়া সে-নদী লাফ দিয়ে পার হতে পারবে কেন? তাদের পার হতে যতটা সময় লেগেছিল সে-সময়ে সুস্থ থাকলে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পারত সে। কিন্তু সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। দেহে আর সে বল নেই। আগের মত দ্রুতগতিতে আর যেতে পারল না চৈতক। এদিকে শত্রুসৈন্য দুটিও প্রায় কাছা-কাছি এসে পড়েছে। এমন সময় গুড়ুম গুড়ুম করে বন্দুকের শব্দ হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনে এক রাজপুত কণ্ঠ শোনা গেল, 'হো নীল ঘোড়ার সোয়ার।'

চমকে উঠল প্রতাপ।

'—ক?'

পিছন ফিরে চাইতেই দেখল, একজন অশ্বারোহী তার দিকেই এগিয়ে আসছে। চিনতে পারল প্রতাপ, তারই বিশ্বাসঘাতক ভাই, আকবরের দালাল, শক্তসিংহ। বিস্ময় এবং ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল সে।

প্রতাপের সঙ্গে বিবাদ করে শক্ত গিয়ে যোগ দিয়েছিল আকবরের পক্ষে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করে জিঘাংসার শান্তি করবে এই রকম এক পণ করেছিল শক্তসিংহ। কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে প্রতাপ যখন একা গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন আর শক্তসিংহ চুপ করে থাকতে পারল না। যে দুজন শত্রুসৈন্য প্রতাপকে হত্যা করার জন্যে অনুসরণ করছিল, পথের মধ্যে তাদের সংহার করে অগ্রজের সামনে গিয়ে হাজির হল সে। প্রতাপ ভেবেছিল, প্রতিশোধ নেবার জন্যেই শক্ত সিংহ তার পিছু ধাওয়া করে এসেছে। তাই ক্রোধে জ্বলে উঠল সে। তরবারি বাগিয়ে ধরে অনুজের মুখোমুখি হওয়ার জন্যে তৈরি হল। কিন্তু শক্তসিংহ তখন প্রশান্ত চিত্ত। লজ্জায় মাথা নিচু করে বিষণ্ণ মুখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে

নিজের ভুল বুঝতে পারল রাণা। দাদার পা দুটো জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে নিজের কৃতকর্মের জন্যে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল শক্তসিংহ। বহুকাল পরে এই অপূর্ব ভ্রাতৃ-মিলন। আনন্দে ভরে গেল প্রতাপের মন। ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরল প্রতাপ। কিন্তু এই পরম আনন্দের মুহূর্তে এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা ঘটল। রাণা প্রতাপের প্রাণাধিক প্রিয় অশ্ব চৈতক মারা গেল।

চৈতকের অসাধারণ দক্ষতার গুণেই মোগল-ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়ে ছিল প্রতাপ। পরমাত্মীয়ের বিয়োগেও সে বুঝি এতটা ভেঙ্গে পড়ত না। চৈতক আর নেই, একথা ভাবতেও বুক ফেটে যায় তার। যে জায়গায় চৈতক প্রাণ হারিয়েছিল তা জারালোর খুব কাছেই। সেখানে 'চৈতকা চাবুত্রা' নামে এক বেদী বানিয়েছিল প্রতাপ। এতকাল ধরে মহারাণার যে সব চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে প্রতাপের পাশে তার প্রিয়তম অশ্ব চৈতকের ছবিও আঁকা আছে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর বেশী দেরি করলে সেলিমের মনে সন্দেহ জাগবে, তাই জ্যেষ্ঠের কাছে বিদায় নিয়ে মোগল শিবিরের দিকে ফিরে গেল শক্তসিংহ। বিদায় নেবার সময় নিজের ঘোড়াটি অগ্রজকে দিয়ে, খোরা-সানি মুলতানিদের একটি ঘোড়ায় চেপে, সেলিমের সামনে এসে উপস্থিত হল। শক্তসিংহ প্রতাপকে বলে এসেছিল, 'সুযোগ সুবিধে মত আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।'

সেলিম ঠিকই সন্দেহ করেছিল। শক্তসিংহকে দেরি করার কারণ জিজ্ঞেস করল। কিন্তু কি জবাব দেবে সে এ কথার। শেষে বানিয়ে এক মিথ্যা কাহিনী পেশ করল সে।

'—প্রতাপ খোরাসানি মুলতানি দুজনকেই হত্যা করেছে। আমার ঘোড়াটি প্রতাপের হাতে নিহত হয়েছে। খোরাসানির ঘোড়ায় চেপে আমি ফিরে এলাম।'

শক্তসিংহর কথায় বানিয়ে বলার জড়তা দেখে সেলিম আরও সন্দিহান হয়ে শক্তকে চেপে ধরল।

'—বল, আসল ঘটনাটা কি? মিথ্যে কথা বলবে না। তাতে তোমার সমূহ বিপদ। কিন্তু যদি সত্যি কথা বল, তা সে যাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

শক্তসিংহ এবারে আসল কথা বললে, 'প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। তাকে বিপন্ন দেখে, আমি ছোটভাই তার, শুধুমাত্র দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। তাই খোরাসানি মুলতানিকে হত্যা করে আমি আমার অগ্রজের জীবন রক্ষা করেছি।'

সেলিম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শক্তসিংহর কোন ক্ষতি করল না সে। শুধু তাকে বিদায় করে দিল মোগল শিবির থেকে। শক্তসিংহ উদয়পুরের পথে পা বাড়াল। পথে ভিনসোর দুর্গ জয় করল এবং তাই দিয়েই দাদাকে সে প্রণাম জানাল। বহুদিন পর্যন্ত শক্তসিংহর বংশধররা এই দুর্গে বসবাস করেছিল। শক্তসিংহর মা বাঈ-জি-রাজ এই ভিনসোর দুর্গেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছিল।

ভাইএ ভাইএ বিরোধ করে যে শক্তসিংহ একদিন অনুজের জীবন-নাশের সঙ্কল্প নিয়ে মোগল পক্ষ নিয়েছিল আবার বিপদ কালে সেই শক্তসিংহই তার জীবন রক্ষা করে নতুন ইতিহাস রচনা করল। শক্তসিংহর কোন বংশধরকে দেখলে, আজও ভট্ট-কবিরা 'খোরাসানি মুলতানি কা অগ্‌গল' বলে সম্বোধন করে থাকে।

১২৩২ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। এই তারিখটি রাজপুতদের কাছে এক চিরস্মরণীয় দিন। হলদিঘাটের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধের কথা কোন রাজপুতই ভুলতে পারবে না। এ যুদ্ধে সবচেয়ে যে বেশী সাহায্য করেছিল সে ঝালাপতি মান্না। তার বীরত্বের কাহিনীও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজপুতরা মনে গেঁথে রেখেছে। হলদিঘাটের যুদ্ধে মিবারের চোদ্দ হাজার যোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছিল। ফলে মিবার প্রায় বীরশূন্য হয়ে পড়ল। রাণা প্রতাপের পাঁচ শো নিকট আত্মীয়, গোয়ালিয়রের রাজ্যভ্রষ্ট রাজা রামশা, তার পুত্র খাঁদেরাও এবং তার অনুরক্ত সাড়ে তিন শো বীর এই যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিয়ে আন্তরিক কৃতজ্ঞার নিদর্শন রেখে গেছে।

বর্ষাকাল। দিনরাত অঝোরে বৃষ্টি। পাহাড়ী অঞ্চল একরকম দুর্গম হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা, সেলিম সৈন্য সামন্ত গুটিয়ে নিয়ে তখনকার মত বিদায় হল। বছর খানেক কেটে গেল। কিছুটা বিশ্রামের অবকাশ পেল প্রতাপ। কিন্তু সে আর কতদিন। ১২৩৩ সংবতের ৭ই মাঘ আবার আক্রমণ করল সেলিম। এমনি দুর্ভাগ্য, সে যুদ্ধেও পরাজিত হল প্রতাপ। উদয়পুর ছেড়ে কমলমীর দুর্গে আশ্রয় নিল সে। কিন্তু মোগল সেনাপতি কোকা শাবাজ খাঁ গিয়ে অবরোধ করল কমলমীর দুর্গ। মোগল সৈন্যর সঙ্গে সংগ্রাম করে বহুদিন পর্যন্ত সেখানেই সে টিকে ছিল, কিন্তু আর পারল না। আবু অধিপতি দেবরাজের চক্রান্তে মহারাণা নিরুপায় হয়ে মিবারের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চপ্পন-এ গিয়ে চৌন্দ গিরি-দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। কমলমীরে একটি মাত্র কূপ ছাড়া অন্যকোন পানীয় জলাশয় ছিল না। এ গুপ্ত তথ্য মোগলদের জানিয়ে দিয়েছিল স্বদেশদ্রোহী দেবরাজ। মোগলরা এ কূপের জল বিষময় করে রেখেছিল।

গভীর অরণ্যে ঘেরা চৌন্দ গিরি-দুর্গে আশ্রয় নিয়েও কিন্তু শত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না প্রতাপ। এ দুর্গও আক্রমণ করল দুর্দ্ধর্ষ মোগলরা। চৌন্দ দুর্গ উদ্ধারের জন্যে শোনিগুরু সর্দার ভনসিংহ অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিল। একজন ভট্ট-কবিও অদ্ভুত রণ-কৌশল দেখিয়ে নিজেকে আহুতি দিয়েছিল। এই কবির লেখা কতকগুলো রক্ত-গরম করা স্বদেশী সঙ্গীত আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

অদৃষ্টের ফেরে, মুসলমান সৈন্য দ্বারা চারদিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল প্রতাপ। কমলমীর আগেই মোগল অধিকারে গেছে। ধর্মমতী এবং গোগণ্ডা আক্রমণ করেছে মানসিংহ। মহব্বত খাঁ উদয়পুর দখল করে নিয়েছে। আমীশাহ নামে এক নবাবপুত্র চৌন্দ ও আগুনাপানোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভীলদের সঙ্গে প্রতাপের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল। আর এদিকে ফরিদ খাঁ নামে এক মোগল শত্রু চপ্পন আক্রমণ করে একেবারে চৌন্দ পর্যন্ত এসে হাজির হল। প্রতাপের সামনে ঘোর দুর্দিন। একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ল প্রতাপ। বিশাল সাম্রাজ্যের

অধীশ্বর হয়ে আজ আর দাঁড়াবার জায়গা রইল না একটুও। অরণ্যে-প্রান্তরে, পর্বত গুহায়, যেখানেইগিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা করল, মোগল সেনারা অনুসরণ করে, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। প্রতাপের অনেক ভাগ্য যে, মোগলরা তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে কিন্তু বন্দী করতে পারেনি কখনও। জীবনের ভয়ে যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত তা না, সুযোগ পেলেই সে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং তার আয়ত্বের মধ্যে যাদের পেত দলিত মথিত করে ফেলত।

চৌদ্দ অবরোধ করে ফরিদ খাঁ সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল। এবার তার হাতে রাণা বন্দী হবেই। কিন্তু তার সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বন্দী করা দূরে থাক, মহারাণার বীরত্বের সামনে ফরিদের সৈন্যরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। যারা এগোল, তারাই নিহত হল। এদিকে বর্ষা নেমে এল। ফরিদ দেখল, পাহাড়ী দুর্গম জায়গা, এখন আর কোন সুবিধে করা যাবে না। যুদ্ধ বন্ধ রাখল ফরিদ। বছরের পর বছর ঘুরে গেল। ফি বারই বর্ষার আগে প্রতাপকে আক্রমণ করতে লাগল মোগল সৈন্য। কিন্তু সব ক'বারই ব্যর্থ হল তারা।

ধীরে ধীরে নিঃসম্বল হয়ে পড়ল রাণা। দুঃখর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও এসে বাসা বাঁধল। নিজের জীবনের জন্যে অতটা ভাবে না প্রতাপ। কিন্তু স্ত্রী পুত্র পরিবারের নিরাপত্তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ল সে। শেষে কি তারা শত্রুর হাতে পড়ে পবিত্র শিশোদীয় কুল কলঙ্কিত হয়ে পড়বে! এই আশঙ্কাই তাকে নিয়ত দহন করতে লাগল। একবার রাণার পরিবারের সবাই মুসলমান শত্রুর হাতে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু কয়েকজন ভীলের উপস্থিত বুদ্ধির ফলে সে-যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল তারা। বাঁশের ঝাঁপির মধ্যে বসিয়ে প্রতাপের পরিবারের সবাইকে জবুরা টিন খনিতে পার করে দিয়েছিল ভীলরা। গাছের ডালের সঙ্গে ঝাঁপিগুলো বেঁধে ঝুলিয়ে হিংস্র জন্তু জানোয়ার থেকে তাদের রক্ষা করেছিল। এরকম দারুণ বিপদের মধ্যেও কিন্তু প্রতাপ নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি কোন সময়।

মহারাণার অদম্য অধ্যবসায় এবং অসাধারণ ধৈর্যের কথা লোকমুখে

ছড়াতে ছড়াতে আকবরের কানে গিয়ে পৌঁছল। গুণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল সম্রাট। গুপ্তচর লাগিয়ে এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করে নিল আকবর। রাণার ওপর শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল তার। সম্রাটের প্রধান সামন্ত, বৈরাম খাঁর পুত্র মীর্জা খাঁ রাণার মহত্বে মুগ্ধ হয়ে বলেছিল, 'দুনিয়ায় সবই অনিত্য, কালে সবই ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু মহাপুরুষ প্রতাপসিংহর কীর্তি বেঁচে থাকবে অনাদিকাল।'

এত কষ্ট, এত যন্ত্রণাও উপেক্ষা করতে পেরেছিল প্রতাপ। শুধু তার চিন্তা, যারা তার চির অনুগত, যারা এক কথায় প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত না কিসে তাদের মান ইজ্জত রক্ষা পাবে। আর চিন্তা, তার ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে। অনিদ্রায় অনাহারে দিনে দিনে তারা শুকিয়ে যাচ্ছে। রাজসুখের মধ্যে যারা লালিত হয়েছে আজ তারা জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে অরণ্যে বসবাস করছে। গাছের ফল খেয়ে, ঘাসের শয্যায় শুয়ে আজ তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। এমনও অনেকদিন গেছে, সারাদিনের চেষ্টায় সামান্য মাত্র আহার্য সংগ্রহ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় ছটফট করছিল। সবে তাদের মুখের সামনে ধরা হয়েছে খাবার। এমন সময় মোগল সৈন্যর আক্রমণ আশঙ্কায় খাওয়া-দাওয়া সিকেয় তুলে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে লুকোতে হয়েছে সবাইকে।

একদিন রাণা প্রতাপের স্ত্রী ও পুত্রবধূ ঘাসের রুটী বানিয়েছিল কয়েক টুকরো। তার অর্ধেকটা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে বাকিটুকু ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দেওয়া হল। খিদের তাড়নায় তাই মহা আনন্দে খাচ্ছিল ওরা। কাছেই ঘাসের ওপর শুয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের খতিয়ান করছিল প্রতাপসিংহ। এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ের করুণ আর্তনাদে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল, একটি বনবিড়াল রুটীর খণ্ডটি, মেয়ের ক্ষুধার্ত মুখ থেকে, কেড়ে নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেল, এখন কি খাবে, এই আশঙ্কাতেই সে ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

চারদিক যেন অন্ধকার দেখল প্রতাপ। অধীর হয়ে উঠল তার হৃদয়। রাজ্য শত্রু অধিকারে, উপযুক্ত পুত্ররা যুদ্ধে নিহত, আত্মীয় স্বজনরা চিতোরের

জন্য বলি হয়েছে, তবু ক্ষণকালের জন্যেও প্রতাপ বিচলিত হয়নি এতদিন। কিন্তু আজকের এই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না সে। উন্মত্তের মত চারদিকে পায়চারী করতে লাগল। 'আমার মত নির্বোধ পাষণ্ডকে ধিক। এ ধরনের পাশবিক যন্ত্রণা হজম করে যদি রাজ-সম্ভ্রম রক্ষা করতে হয় তবে সে রাজসম্ভ্রমে শত ধিক।'

আর না, অনেক হয়েছে। আকবরের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করে এক চিঠি লিখল বীরকেশরী মহারাণা প্রতাপসিংহ।

প্রতাপের পত্র পেয়ে আনন্দে ধেইধেই করে নাচতে লাগল মোগল সম্রাট আকবর। যার জন্যে তার লক্ষলক্ষ সৈন্য নিধন হয়েছে, যাকে বশে আনার জন্যে সে ছলে বলে কৌশলে রাজস্থানের অন্য সমস্ত রাজপুত রাজাকে হাত করে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে, সেই মহাপুরুষ, চির উন্নত শির বীর রাণাপ্রতাপ আজ মোগল সম্রাটের দাক্ষিণ্য প্রার্থী, একথা ভাবতেও আকবরের রোমাঞ্চ লাগে।

'—ওরে বাজা বাজা! তোরা সব জয়ধ্বনি কর।'

সারা রাজধানীতে ঢেড়া দিয়ে দিল আকবর। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতে চায়। এ আনন্দ কোথায় রাখবে সে। আনন্দ-গানে মুখরিত হয়ে উঠল দিল্লী। আলোর মালায় সাজানো হল সারা শহর। মেলা বসানো হল। সার্কাস, বাজী, বেশ্যার হুল্লোড় পড়ে গেল সর্বত্র। আজ আর কোন কার্পণ্য নয়, কোন দীনতা নয়। যে যত পার খাও, নাচ, কুদ, মেয়ে-মানুষ নিয়ে ঘরে যাও। কেউ মানা করবে না।

১৫১৫ সংবতে যোধরাও যোধপুরে রাজধানী গড়ে তোলার পর তার পুত্র বিকা মরু-প্রান্তরে বিকা-রাজ্য গড়ে তোলে। বিকার বংশধর বিকানিরের রাজা রায়সিংহ মারাবার রাজ মালদেবের ঘৃণিত পথ অনুসরণ করেছিল। রায়সিংহর ভাই পৃথ্বীরাজ। ঘটনাচক্রে পৃথ্বীরাজ মোগল কারাগারে বন্দী। তার বীরত্ব, মহত্ব এবং স্বদেশপ্রেম স্মরণীয়। আকবরের হাতে বন্দী হয়েও কিন্তু পৃথ্বীরাজ নিজের তেজ এবং গর্ব এতটুকু খাটো করেনি কখনও। রাণার চিঠিখানা হাতে নিয়ে আকবর কারাগারে এল

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করতে। ভাবখানা এই, মিবারের মহারাণাও শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মাথা নুইয়েছে, তুমি তো কোন চুনো-পুঁটি!

চিঠিখানা পড়ে কালো হয়ে গেল পৃথ্বীরাজের মুখ। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, এ চিঠি প্রতাপ নিজেই লিখেছে। চিঠিখানা আকবরের হাতে ফেরৎ দিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে, 'তাকে আমি খুব ভাল করে চিনি। আরাধ্য দেবতার মত ভক্তি করি। আপনি নিজে যদি তার মাথায় দিল্লীর রাজমুকুট পরিয়ে দেন তবু সে কখনও আপনার কাছে নতি স্বীকার করবে না। আমার বিশ্বাস, এ চিঠি জাল।'

আকবর আর কোন কথা বাড়াল না। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে প্রতাপ সিংহর কাছে একখানি চিঠি পাঠাল পৃথ্বীরাজ। চিঠিখানি লেখা হয়েছিল কবিতায়। পৃথ্বীরাজের কবি-প্রতিভা সারা রাজস্থানে খ্যাতি পেয়েছিল। চিঠির আসল বক্তব্য উদ্ধার করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না। পড়লে আপাতভাবে মনে হতে পারে, মোগল সম্রাটের কাছে বশ্যতা স্বীকারের কারণ জানতে চেয়েছে পৃথ্বীরাজ। কিন্তু আসল মর্ম, প্রতাপের কাছে মিনতি জানিয়েছে সে, প্রতাপ যেন তার বংশ-গৌরব, মর্যাদা, সম্ভ্রম, সব ভুলে গিয়ে মুসলমানের পায়ে লুটিয়ে না পড়ে।

পৃথ্বীরাজের রক্তটগবগে ভাষায় লেখা চিঠিটা পড়ে প্রতাপ আবার জেগে উঠল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপ করতে লাগল সে। যাইহোক, সব ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন উৎসাহে কাজে মেতে উঠল বীর কেশরী।

মুসলমানদের এক বিখ্যাত উৎসবের দিন নৌরোজা। এদিন মোগল রাজ্যে আনন্দের ধুম পড়ে যেত। ছোট বড় সব রকমের লোকই উপস্থিত থাকত রাজ-সভায়। বেগমরাও মহাসমারোহে এসে বসত রাজ-দরবারে। সম্ভ্রান্তবংশের মুসলমান মেয়েরা এবং রাজপুত কুল-নারীরাও যোগদান করত এই উৎসবে। এ ছাড়া রাজপ্রাসাদের কাছে মেয়েদের এক মেলা বসত। পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না সেখানে। হাতের কাজ করা নানারকম শিল্প-সম্ভার নিয়ে পশারা বসাত মুসলমান ও রাজপুত মেয়েরা।

রাজপরিবারের মেয়েরা সে সব পছন্দ করে কিনত। সম্রাট আকবর ছদ্মবেশে এই মেলায় ঘুরে বেড়াত। এ আয়োজনের মূলে কিন্তু ছিল এক ঘৃণিত উদ্দেশ্য। এই উৎসবের ছুতোয় কত রাজপুত রমণীর সতীত্ব নষ্ট করেছে মুসলমানরা তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ভট্টগ্রন্থে।

একবার এই উৎসবের মেলায় ছদ্মবেশে সম্রাট আকবর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় পৃথ্বীরাজের স্ত্রীর অনুপম রূপ লাবণ্য দেখে লোলুপ হয়ে উঠল তার কামনা। রাজপুত কুলনারীকে উপভোগ করার প্রবৃত্তি লকলক করে উঠল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথ্বীরাজ আকবরের কারাগারে বন্দী। কিন্তু এক দিনের জন্যেও সে আকবরের কাছে মাথা হেঁট করে নি। বন্দী হয়েও স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছিল। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী শক্তসিংহর কন্যা। যে পথ দিয়ে সে মেলায় গিয়েছিল সেই পথ দিয়েই সে ঘরে ফিরে আসছিল, কিন্তু কিছু দূর এসে দেখল, সবদিকের দরজাই বন্ধ। কোন দিকেই আর পথ নেই। বিস্ময়ে, সন্দেহে, ভয়ে সে অধীর হয়ে পড়ল। হঠাৎ একটি দরজা খুলে গেল। দরজার মাঝখানে কামোন্মত্ত আকবর, দুহাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। নানাভাবে লোভ দেখিয়ে রাজপুত ললনাকে প্রলুব্ধ করার বৃথা চেষ্টা করল। আকবরের মুখে এ ধরনের জঘন্য প্রস্তাব শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠল সে। মুহূর্তেই কটিদেশ থেকে ছুরিকা বের করে পাষণ্ডটার বুকের ওপর বাগিয়ে ধরে কঠিন কণ্ঠে তিরস্কার করে বলতে লাগল, 'নরাধম, পাপিষ্ঠ মুসলমান কুলাঙ্গার, তোর ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, যতদিন বেঁচে থাকবি আর রাজপুত কুলে কালি দেবার চেষ্টা করবি না। বল, প্রতিজ্ঞা কর, নাহলে এই ছুরিকা আমূল বসিয়ে দেব তোর হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।'

সতীর অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সম্রাট আকবর। সেই মুহূর্তেই কোথায় উবে গেল তার উন্মত্ত কামনার আগুন। তার আদেশ শিরধার্য করে নিল সে। এই নির্মল চরিত্র রাজপুত রমণীর বহু গুণ কীর্তন করা হয়েছে ভট্টগ্রন্থে। কিন্তু আবার পৃথ্বীরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায়সিংহর কলঙ্কিনী স্ত্রীর কলঙ্ক কাহিনীও লিখে রেখেছে ভাটরা। রায়সিংহর

স্ত্রী সামান্য বসন-ভূষণের জন্যে নিজের সতীত্ব বিকিয়ে দিয়েছিল আকবরের হাতে। আকবরের জৈব ক্ষুধা মিটিয়ে রায়সিংহ-পত্নী ঘরে ফিরে এলে একদিন পৃথ্বীরাজ চিৎকার করে অগ্রজকে তার ক্ষোভ জানিয়েছিল।

'—দাদা, দেখ দেখ, তোমার সোহাগের সতীলক্ষী বৌ আকবরের দেওয়া মণি-কাঞ্চনের গয়না পরে আবার তোমার ঘরে এসেছে শয্যাসঙ্গিনী হতে।'

পৃথ্বীরাজের চিঠিখানা বার বার পড়ল প্রতাপ। নতুন আশা, উৎসাহের সঞ্চার হল মনে। আবার রক্ত গরম হয়ে উঠল। এদিকে প্রতাপের নতি স্বীকারে দিল্লীর সম্রাট আমোদ-প্রমোদে ডুবে রইল। এমন সময় সৈন্য সামন্ত নিয়ে মোগল শিবির আক্রমণ করল প্রতাপ। রাজপুতের হাতে হাজার হাজার মোগল সৈন্য জীবন হারাল, কিন্তু তাতেও রাণার উদ্দেশ্য সফল হল না। কারণ, মোগলের সৈন্য-সংখ্যা অপরিমিত। তার সেনাবলকে নিঃশেষ করতে হলে যে পরিমাণ সৈন্য সামন্ত দরকার তার তা নেই। যে পরিমাণ মোগল সৈন্য নিহত হল তার দশগুণ এসে ছেয়ে ফেলল পর মুহূর্তেই। উপায় না দেখে সদলে পালিয়ে আবার পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল প্রতাপ। আবার মুসলমান সৈন্যরা বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল তাকে। কিন্তু কেউই সন্ধান পেল না তার। যখনই একটু সুযোগ পেত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত প্রতাপ। হাতের কাছে যাদের পেত, নিহত, দলিত, মথিত করে আবার গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ত।

আরও কিছুদিন কাটল এভাবে। যে টুকু সহায় সম্বল ছিল তাও শেষ। এবারে একেবারে ক্ষীণ বল হয়ে পড়ল সে। বনের ফল, গাছের লতাপাতা খেয়ে জীবন-ধারণ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে বনের মধ্যে খাওয়ার মত বন্য ফলও সংগ্রহ করা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। হয়তো অনাহারে তাকে মরতে হবে একদিন, তার জন্যে একবিন্দুও বিচলিত না সে। শুধু তার দুঃখ রয়ে গেল, যে জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্যে সে এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করছে সে-স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার কোন আলোই দেখতে পাচ্ছে না আর। রাজমহিষী আজ পথের কাঙ্গালিনী, চিন্তায় চিন্তায় জর্জরিত হয়ে

পড়েছে সে। প্রাণাধিক পুত্র কন্যারা পুষ্টির অভাবে জীর্ণ-শীর্ণ। সহায় নেই, সম্বল নেই, স্বাধীনতাও তো যাই যাই করছে। এ অবস্থায় পরাক্রান্ত মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করার সঙ্গতি কোথায়? অন্য কোন উপায় না দেখে সিন্ধুর কাছে সগদি রাজ্যে চলে যাওয়ার আয়োজন করতে লাগল প্রতাপ। কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত সর্দার ও পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নিয়ে আরাবল্লীর চূড়ায় গিয়ে উঠল সে। শেষ বারের মত চিতোরকে সাশ্রু নয়নে একবার দেখে নিল সে। জীবনে আর কখনও মিবার রাজ্যে ফিরে আসতে পারবে না, মুসলমানদের তাড়িয়ে জন্মভূমিকে আবার মুক্ত করতে পারবে না, এই দুঃখই তাকে দাহন করছিল তখন।

ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কার ওপর প্রসন্ন হয় কেউ বলতে পারে না। বহু কষ্ট, বহু দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করেও কখনও ধর্মপথ থেকে এতটুকু সরে দাঁড়ায় নি প্রতাপ। আজ জন্মের মত জন্মভূমির কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সে। ভাগ্যলক্ষ্মী আর সহ্য করতে পারল না।

আরাবল্লী থেকে নিচে নেমে মরুভূমির পথে পা বাড়িয়েছে প্রতাপ, এমন সময় তাদের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ভামশা তার সামনে এসে উপস্থিত। অতুল ধনরত্ন নিয়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করল ভামশা। পুরুষানুক্রমে তারা মিবারের মন্ত্রীত্ব করে এসেছে। এতকালের সঞ্চিত সমস্ত ঐশর্যই সে আজ প্রতাপের হাতে তুলে দিল। এই অর্থ দিয়ে পঁচিশ হাজার সৈন্যর বারো বছরের ভরণ-পোষণ চলতে পারে। এই সময় থেকে ভামশা মিবারের 'উদ্ধার কর্তা' হিসেবে পরিচিত হল।

প্রতাপের আর আনন্দের সীমা নেই। অল্পদিনের মধ্যেই সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করে মোগল সেনাপতি শাবাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল সে। দেবীর ক্ষেত্রে দুই দলে ঘোর যুদ্ধ বাধল। প্রতাপের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সদলে শাবাজ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাল। কিছু মুসলমান সৈন্য জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। আর একটি মোগল শিবির আক্রমণ করে আরও অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিহত করল প্রতাপ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মোগল সৈন্যদের মধ্যে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। প্রতাপকে প্রতিরোধ

করার জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মোগল সৈন্য এগিয়ে এল। এদিকে কমলমীর দুর্গে উপস্থিত হয়ে ,সখানকার মোগল সেনাপতি আবদুল্লাকে সদলে সংহার করল মহারাণা। দেখতে দেখতে বত্রিশটি দুর্গ আবার দখল করে ফেলল সে। এই ভাবে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে শুধু চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ছাড়া মিবারের সব জায়গাই দখল করে নিল রাণা। স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার মানসিংহকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে অম্বর রাজ্য আক্রমণ করল সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানকার বাণিজ্য-নগর মালপুর ছারখার হয়ে গেল। উদয়পুর অধিকার করতে বেশী বেগ পেতে হল না তাকে। তার মহা বিক্রম দেখে বিনা দ্বিধায় ছেড়ে পালিয়ে গেল মোগল সৈন্যরা।

মিবাবের প্রায় সব জায়গায়ই তার অধিকারে ফিরে এল। তবু প্রতাপের মনে শান্তি নেই। চিতোর তখনও মুসলমান কবলে। চিতোরকে সে কিছুতেই উদ্ধার করতে পারল না।

প্রতাপের দেহ থেকে যৌবন বিদায় নিয়েছে। প্রৌঢ় বয়সেই অকাল-বার্ধক্য এসে তাকে গ্রাস করতে চায়। চিন্তার চিতায় জ্বলে জ্বলে হৃদয় শান্ত হয়ে এসেছে তার। উদয়পুরের আকাশচুম্বী প্রাসাদ শিখরে বসে চিতোরের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ জ্বালা করে। সারাজীবনের উদ্যম অধ্যবসায়েও চিতোর উদ্ধার করতে পারল না। একটা বুক-চেরা মর্মভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্তনাদ করে ওঠে প্রতাপ। এ শোক বেশীদিন সহ্য করতে পারেনি সে। কিছুকাল পরে চিতোর উদ্ধারের স্বপ্ন বুকে করেই দেহত্যাগ করল মহারাণা।

পেশোলা সরোবরের ধারে অনেকগুলো ছোটছোট কুটীর নির্মাণ করে-ছিল রাণা প্রতাপ। আত্মরক্ষার জন্যে সে, সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে, সব আগে এই কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ জীবনের এই শেষ মুহূর্তে উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ থেকে নেমে এসে এরই একটি কুটীরে এসে শয্যা নিল। তার বিষণ্ণ চোখের কোলে কালি পড়েছে। মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা থেমে আসে প্রতাপের। রাণার শয্যার পাশে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সর্দাররা।

'—আপনার কি খুবই কষ্ট হচ্ছে মহারাণা?'

'—দেহের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করি নি কোনদিন। কষ্ট হচ্ছে শুধু এই ভেবে, আমার সাধের চিতোরকে আমি বিধর্মীর হাতথেকে উদ্ধার করে যেতে পারলাম না। আমার পুত্র অমরসিংহ সুখে লালিত, তার সাধ্য হবে না জানি। কিন্তু আপনাদের ওপর আমার অগাধ ভরসা আছে, আমাকে কথা দিন, চিতোর উদ্ধারের জন্যে আপনারা জীবনপণ লড়াই করে যাবেন।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, 'আমার কেবলই আশঙ্কা হচ্ছে কেন, অমর বিলাসিতার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। পঁচিশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় যে সব সম্পত্তি উদ্ধার করলাম তা বোধহয় সে রক্ষা করতে পারবে না। শুধু মনে হচ্ছে, আত্ম সুখের জন্যে সে স্বাধীনতা পর্যন্ত জলাঞ্জলি দেবে। এবং এও মনে হচ্ছে. হয়তো বা আপনারাও অমরের পথ অনুসরণ করে মিবারের কলঙ্ক বাড়াবেন।'

সর্দাররা একবাক্যে বলে উঠল, 'মহারাজ, বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনের শপথ করে বলছি, আমরা যতদিন জীবিত থাকব কুমার অমরসিংহ আপনার নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারবে না। আর আমাদের প্রতিজ্ঞা, যতদিন মিবারের অখণ্ড স্বাধীনতা ফিরে না পাব ততদিন আমরা এই পর্ণকুটীরেই জীবনযাপন করব। বিলাসিতা এবং সুখ-সম্ভোগ বিষের মত মনে করব।'

সর্দারদের আশ্বাসে রাণার হৃদয় প্রশান্ত হল। তারপর ধীরে ধীরে অনন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়ল সে।

১০

রাণা প্রতাপসিংহর সতেরটি পুত্রের মধ্যে অমরসিংহ জ্যেষ্ঠ। পিতার মৃত্যুর পর ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে রাণা অমরসিংহ সিংহাসনে বসল। এদিকে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর সম্রাট আকবর দেহত্যাগ করল। আকবরের সময়ে ফ্রান্সে চতুর্থ হেনরী. স্পেনে পঞ্চম চার্লস, ইংলণ্ডের সিংহাসনে

রাণী এলিজাবেথ অধিষ্ঠিত ছিল। সম্রাটের বড় সাধ ছিল, রাণা প্রতাপ তার বশ্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু সে সাধ তার পূরণ হয়নি। আর একটি সাধও ছিল তার। মানসিংহকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করবে সে। তাও পূরণ হয়নি।

মানসিংহর বাহুবলেই আকবর অর্ধেক ভারতে রাজ্য-বিস্তার করতে পেরেছিল। নানাভাবে আকবরও এর প্রতিদান দিয়েছে মানসিংহকে। তবু আকবরের মনে সন্দেহ ছিল, তার মৃত্যুর পর মোগল-সিংহাসনে চেপে বসবে বুঝি মানসিংহ। হঠাৎ এ ধরনের সন্দেহ কেন এত জটিল হয়ে উঠেছিল তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু একবার সন্দেহের কালোছায়া যখন হাতছানি দিয়েছে, তখন রেহাই পাওয়ার জো কি? আকবর ঠিক করল, মানসিংহকে ইহজগত থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে ফেলতে হবে। নাহলে তার মোগল সাম্রাজ্যের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না হয়তো বা। একদিন আকবর নিজে হাতে হজমিগুলি বানিয়েছিল দুটো। একটায় মেশানো ছিল কালকূট। মানসিংহর হাতে তুলে দিল আকবর তার নিজের হাতে তৈরি করা সেই হজমি গুলির একটি। অন্যটি খেল সে নিজে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত সতর্কতা সত্বেও কখন গোলমাল হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি। বিষ মেশানো গুলিটিই খেয়ে ফেলেছে সে। আর বিশুদ্ধ হজমি গুলিটি তুলে দিয়েছে সে মানসিংহর হাতে। মানসিংহকে মারতে গিয়ে নিজেই মরল আকবর। এই নিয়তি।

রাজ্যলাভের পর নতুন নতুন আইন, নতুন নতুন প্রথা, নতুন নতুন কর প্রবর্তন ও সামন্তদের মধ্যে নতুন নতুন ভূমি-বৃত্তি দান করে রাজ্যকে সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল করে তুলেছিল অমরসিংহ। উষ্ণীষ-বন্ধনের যে নতুন প্রথা চালু করেছিল সে আজও মিবারের সর্দাররা সেই প্রথানুসারে উষ্ণীষ বেঁধে থাকে। একে অমরশাহী পাগড়ী বলা হয়।

বহুদিন সুখে শান্তিতে রাজ্যভোগ করতে করতে আলস্যের মধ্যে গা এলিয়ে দিল অমরসিংহ। মৃত্যুকালে রাণা প্রতাপ যে সব উপদেশ দিয়েছিল ভুলে গেল সে সব। পেশোলার তীরে যে পর্ণকুটীরগুলো ছিল তা ভেঙ্গে

সেখানে গড়ে তুলল সে অমরমহল নামে ছোট একটি প্রমোদ ভবন। চাটুকার এবং পারিষদরা পরিবেষ্টিত হয়ে এই অমরমহলে উশৃঙ্খল ভাবে দিন কাটাতে লাগল সে। এমন সময় দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের দামামা বেজে উঠল মিবারের সীমায়। সিংহাসন লাভের চার বৎসর পরে জাহাঙ্গীর আক্রমণ করল মিবার। রাজস্থানের সমস্ত রাজাই তার পায়ের তলায়, শুধু মিবারের রাজা কেন মাথা উচু করে থাকবে। এত কি তার দর্প। মিবার-রাজের দর্প চূর্ণ করার সঙ্কল্প নিয়েই মিবার আক্রমণ করেছিল।

এ দিকে দুষ্ট গ্রহ এসে ভর করল অমরসিংহর কাঁধে। বিলাস সম্ভোগ ছেড়ে যুদ্ধ-বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়তে সে নারাজ। শিশোদীয় কুলের গৌরব, মর্যাদা রক্ষার কথা মাঝে মাঝে তার মনে হয় নি তা না, কিন্তু বিলাসিতার মোহ তাকে এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যে, সব সঙ্কল্প গৌরব মর্যাদার কথা সে ভুলে গেল। এর জন্যে প্রধানত দায়ী তার সাঙ্গপাঙ্গরা। বার বার তারা মন্ত্রণা দিতে লাগল, 'সারা রাজস্থানের রাজারা যে মোগল সম্রাটের পদানত, তার সঙ্গে যুদ্ধ করা মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা। তার চেয়ে মোগলের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।' রাণার মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও সরে গেল এই সব চাটুকারদের কথায়। আবার নিশ্চিন্ত মনে বিলাস-ব্যাসনের মধ্যে দিন কাটাতে লাগল সে।

মিবারের সামন্ত সর্দাররা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। প্রধান সামন্ত চন্দাবৎ এসে উপস্থিত হল অমরমহলে। দৃঢ়কণ্ঠে তিরস্কার করে সে বললে, 'মহারাজ, মহারাণা প্রতাপসিংহর পুত্র হয়ে আপনি কি এই সঙ্কট সময়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবেন? পবিত্র কুলগৌরব নষ্ট হবে, বীরকেশরীর সন্তান হয়ে আপনি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন! প্রচণ্ড মোগল শত্রু আপনার মাথার ওপর, আর আপনি কি না চাটুকারদের নিয়ে মেতে আছেন! মুসলমানের হাতে মিবার ছারখার হবে, রাজপুত মেয়েরা কলঙ্কিত হবে, আপনি তা সহ্য করতে পারবেন? পূর্বপুরুষদের কীর্তির মর্যাদা যদি বাঁচাতে না পারেন তা হলে পবিত্র শিশোদীয়কুলে জন্মে ছিলেন কেন

আপনি ? ধিক আপনাকে !'

চন্দাবৎ সর্দারের তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনেও কিন্তু অমরের জড়তা কাটল না একটুও। ক্রোধে জ্বলে উঠল চন্দাবৎ। ঘরের এক কোণে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড ছিল, সেটি তুলে নিয়ে সারা দেয়াল জুড়ে যে আয়নাটি ছিল, ছুড়ে মারল সে। বিশাল আয়নাটি খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল ঘর ময়। অমরসিংহর একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে নিয়ে এল চন্দাবৎ। গম্ভীর-ভাবে সর্দারদের নির্দেশ দিল, 'এখুনি ঘোড়া নিয়ে এস। প্রতাপের পুত্রকে কলঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

রাণা অমরসিংহ রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। রাজদ্রোহী বলে চন্দাবৎকে তিরষ্কার করতে লাগল। চন্দাবৎ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করল না।

সমস্ত সর্দাররা চন্দাবতের কাজে তুষ্ট হয়েছিল। তখনি রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পীঠে চেপে মুসলমান সৈন্যর সঙ্গে মোকাবিলা করতে ছুটল তারা। অনিচ্ছা সত্বেও রাণাকে যেতে হল তাদের সঙ্গে। মিবারের জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কাছে এসে রাণার রাগ জল হয়ে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। চন্দাবৎকৃষ্ণকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে বললে, 'আপনিই আমার পিতার একমাত্র পরম বন্ধু। আপনিই শিশোদীয় বংশের যথার্থ হিতৈষী। আমি অলস মায়ায় মোহগ্রস্ত ছিলাম। আপনি আমাকে উদ্ধার করে পরম উপকার করেছেন। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই আমার।'

রাণার মুখে এ কথা শুনে সবাই আনন্দিত হল। উৎসাহ, তেজ এবং বিক্রম চতুর্গুণ হয়ে উত্তেজিত করল তাদের। গগনভেদী সিংহনাদ করতে করতে পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে শত্রুসৈন্যর দিকে এগিয়ে চলল তারা। মোগল সেনাপতি খাঁ খানান সৈন্যদল নিয়ে দেবীর ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। সেই পর্বত-পথের ওপর হিন্দু-মুসলমানের ঘোর যুদ্ধ হল। রাণা অমরসিংহ প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসৈন্য সংহার করতে লাগল। তার অসাধারণ বীরত্ব দেখে মুগ্ধ, হতবাক হয়ে গেল সবাই। বহুক্ষণ যুদ্ধ হল, কিন্তু কোন পক্ষেরই

জয় পরাজয় নির্ধারিত হল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। মোগলদের কামান গর্জ্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। কিন্তু অমিত বিক্রমশালী রাজপুত যোদ্ধারা এসব হুঙ্কার তুচ্ছ করে তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রচণ্ড তেজে। রাজপুত বীরের সামনে টিকতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল মোগল সৈন্যরা। বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে রাজধানীতে (১৬০৮ খৃষ্টাব্দে) ফিরে এল রাণা অমরসিংহ।

এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েও কিন্তু জাহাঙ্গীর নিরুৎসাহ হল না। বরং তার আক্রোশ আরও শতগুণে বেড়ে গেল। এর পর বৎসরই আবদুল্লাকে সেনাদলের দায়িত্ব দিয়ে আবার মিবার অভিযানে পাঠাল সে। বনপুর নামে এক পাহাড়ী পথে আবার যুদ্ধ হল! কিছুক্ষণের মধ্যেই মোগলের বিরাট সৈন্যব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিল রাজপুত যোদ্ধারা। মোগল সেনাদলের প্রায় সবাই নিহত হল রাজপুতদের হাতে। উপায় না দেখে বাকী সৈন্যরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বাঁচল। বহুকাল বাদে বাপ্পার রক্তপতাকা আবার ওড়ানো হল গাদবার রাজ্যের চারদিকে। দেবগড়ের দুদো, সঙ্গাবৎ নারায়ণ দাস, সূর্যমল্ল, ঐশকর্ণ, শক্তাবৎ সর্দার ভনসিংহর পুত্র পূর্ণমল্ল, রাঠোর হরি-দাস, সদ্রির ঝালাভূপত, কহির দাস কচ্ছবাহ, বৈদলার চৌহান কেশব দাস, মুকুন্দ দাস রাঠোর, জয় মলোট প্রভৃতি রাজপুত যোদ্ধা এ যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল।

পরপর দু'বার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাহাঙ্গীরের মনে আশঙ্কা, ভয় এবং সন্দেহ দানা বাঁধল। ভেবে পেল না সে, সামান্য সৈন্যবল নিয়ে বিশাল মোগল বাহিনীকে কি করে পরাজিত করে তারা। দারুণ রোষে উন্মত্ত হয়ে উঠল দিল্লীর সম্রাট। আবার সমর-আয়োজন হল। রাজপুত-কলঙ্ক সাগরজীকে চিতোর ধ্বংসাবশেষের ওপর 'রাণা' বলে অভিষেক করল জাহা-ঙ্গীর। একদল মোগল সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে সাগরজী চিতোরে বাস করতে লাগল। চিতোরের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে স্যার টমাস রো ইংলণ্ডে যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার সারমর্ম এই রকম ঃ

'দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় ভারতের এক প্রাচীন নগর চিতোর অবস্থিত। এর চারদিকে দশ মাইল ব্যাপী বিশাল প্রকার। এখনও এখানে শতাধিক ধ্বংসপ্রায় দেবালয় এবং কিছু রাজপ্রসাদের আদল পাওয়া যায়। এইসব রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে আজও কিছু প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন উঁকি দিচ্ছে। খুব কম করে হলেও প্রায় এক লক্ষ পাথরের তৈরি বাড়ি ছিল চিতোর নগরে। দুর্লঙ্ঘ্য কঠিন পাহাড়ের গা বেয়ে একটিমাত্র সিঁড়ি। শুধুমাত্র এই সিঁড়ি বেয়েই ওপরে ওঠা যায়। বহুকাল ধরে অবরোধের পর নগরবাসীরা নিঃসম্বল হয়ে পড়লে আকবর চিতোর দখল করতে পেরেছিল। একজন লোক জীবিত থাকতেও কিন্তু চিতোর অধিকার করতে পারেনি সে।'

আকবরের আক্রমণে চিতোরের সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শ্মশানপুরী চিতোরকে আবার সাজিয়ে গুছিয়ে বসল সাগরজী। জাহাঙ্গীরের ধারণা ছিল, চিতোর বাসযোগ্য হলে অমরসিংহর রাজ্য ছেড়ে ধীরে ধীরে অনেকেই হয়তো সাগরজীর আখড়ায় এসে বাসা বাঁধবে। কিন্তু সে-সব কিছুই হল না। একটি লোকও আর চিতোরে ফিরে এল না।

সাত বছর কেটে গেল। দারুণ যন্ত্রণায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই সাত বছর চিতোরে কাটাল সাগরজী। মোগল সম্রাটের পদলেহী সে, নিজের কোন সামর্থ্য নেই, সাতন্ত্র্য নেই, স্বাধীনতা নেই। কে তাকে রাণা বলে সম্মান করবে। সবাই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। চিন্তায় চিন্তায় জরাজীর্ণ হয়ে গেল তার দেহ। একদিন রাতের অন্ধকারে তার সামনে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি উপস্থিত হয়ে নির্দেশ দিল, 'নরাধম, রাজপুত-কুলাঙ্গার শিগ্‌গির এখান থেকে দূর্ হ। নইলে তোর সর্বনাশ করব।'

ভয়েই হোক আর যে কারণেই হোক, পরদিনই ভ্রাতুষ্পুত্র অমরসিংহকে ডেকে, চিতোর রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে এক পর্বত অরণ্য বাসে গিয়ে দিন কাটাতে লাগল সে। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগল। ধন নয়, মান নয়, রাজ্য নয় শুধু একটু শান্তি চায় সে। কিন্তু শান্তি কোথায় পাবে সে। আবার ফিরে গেল

জাহাঙ্গীরের কাছে। জাহাঙ্গীরও তাকে কুকুরের মত দূর দূর করে দিল। আর সহ্য করতে পারল না সাগরজী। সেই রাজদরবারেই, সকলের সামনে নিজের ছুরি দিয়ে নিজের বুকের হৃৎপিণ্ড চিরে ফেলল সে। এইভাবে এক পাপ জীবনের অবসান হল। এই নরাধম সাগরজীর পুত্র মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তার নাম মহব্বৎ খাঁ।

মৃত্যুকালে প্রতাপসিংহ বলে গিয়েছিল, ভোগ বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়ে অমরসিংহ রাজ্য রক্ষা করতে পারবে না। তার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। চিতোর হাতে পেয়ে আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না অমরসিংহ। উদয়পুরের রাজপাট বন্ধ করে দলবল নিয়ে সে উঠে এল চিতোরে। তা না করে পিতার আদেশ মত যদি সে সেই গিরিদুর্গম-দুর্গেই বসবাস করত তাহলে এমনটি ঘটতে পারত না হয়তো।

চিতোর ফিরে পাওয়ার পর মিবারের আশীটি দুর্গ তার আয়ত্বে এসেছিল। এর মধ্যে অন্তলা দুর্গ অধিকার করার সময় তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

এদিকে জাহাঙ্গীর তৃতীয়বার মিবার আক্রমণের আয়োজন করতে লাগল। অমরসিংহও তৈরি হচ্ছিল। মোগল সৈন্য মিবার আক্রমণ করতে দেরি করছে দেখে আরও কিছু মুসলমান অধিকারের জায়গা দখল করতে ছুটল। এই সময় চন্দাবৎ ও শক্তাবৎ সর্দারদের মধ্যে কলহ শুরু হয়ে গেল। এতকাল চন্দাবৎরা সামনের সেনাবাহিনী পরিচালনা করে আসছিল, কিন্তু শক্তাবৎরা এই চিরাচরিত প্রথা মানতে রাজি না। তারা এখন চন্দাবৎদের চেয়ে বেশী শক্তিমান। সুতরাং এ সম্মান তাদেরই প্রাপ্য বলে দাবি জানাল। উভয় সঙ্কটে পড়ল রাণা অমরসিংহ। কার দিকে রায় দেবে সে। অনেক চিন্তা করে শেষে সে বললে, যে আগে অন্তলা দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে সেই পাবে এসম্মান। সঙ্গে সঙ্গে দু'দলই অন্তলার দিকে ছুটল। পাষাণ-প্রাকার পরিবেষ্টিত এক উঁচু জায়গায় অবস্থিত অন্তলা দুর্গ। দুর্গের মধ্যে পরিখা বেষ্টিত এক বিরাট প্রাসাদ। দুর্গরক্ষক বাস করে সেখানে। চিতোরের আঠারো মাইল পূর্বে এই

অন্তলা। দুর্গটি আজ আর নেই। এখন শুধু একটা ইটের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গ অভিযানে বেরিয়ে শক্তাবৎরাই আগে গিয়ে পৌঁছল দুর্গের একমাত্র দরজার সামনে। লৌহকঠিন দরজা রুদ্ধ। কিন্তু কে পরোয়া করে তা। শক্তাবৎ সর্দার মাহুতকে হুকুম দিল, হাতী দিয়ে দরজা উড়িয়ে দিতে। হাতীর প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতেও কিন্তু দরজা ভাঙ্গা যায় না। এদিকে চন্দাবৎ দল উল্টো পথ ধরে পৌঁছতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল পথ। শেষে এক রাখাল বালকের সাহায্যে তারা এসে পৌঁছল দুর্গেরপিছন দিকে। সেদিকে প্রবেশের কোন পথ নেই। কিন্তু চন্দাবৎ সর্দার তাতেও বিচলিত না। সেই দুরারোহ প্রাকার বেয়েই ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মোগল-কামানের একটি গোলা এসে তাকে ফেলে দিল নিচে। সর্দার নিহত, এখন উপায় ? সঙ্গে সঙ্গে তার নিচের সর্দার বান্দা ঠাকুর চন্দাবৎ-অধিনায়ক নিযুক্ত হল। অসীম বীরত্বের সঙ্গে ঐ প্রাকার বেয়ে আবার ওপরে উঠতে লাগল সে। এবং সে একা নয়। সর্দারের মৃতদেহ একটা কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে, পিঠে বেঁধে উঠতে লাগল। আর এদিকে শক্তাবৎ সর্দারের নির্দেশে হাতীর প্রচণ্ড আঘাত হানা হচ্ছে দরজার ওপর। দরজার মধ্যে কিছু লোহার গজাল গাঁথা ছিল। শক্তাবৎ সর্দার চেষ্টা করছিল, সেই গজাল গুলোর ওপর পা রেখে ওপর দিয়ে ভিতরে ঢোকার। এমন সময় হাতীর ধাক্কায় ধাক্কায় বিকট শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ল সেই বিরাট দরজা। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার নিচে চাপা পড়ে প্রাণ হারাল শক্তাবৎ সর্দার। দলপতি নিহত, কিন্তু কেউই ভ্রূক্ষেপ করল না তা। জয়ধ্বনি করতে করতে সবাই ঢুকে পড়ল ভিতরে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা বুঝতে পারল, তাদের এত শ্রম সব ব্যর্থ হয়েছে। চন্দাবৎ বান্দা ঠাকুর তার আগেই চন্দাবৎ সর্দারের মৃতপ্রায় দেহ এনে উপস্থিত করেছে দুর্গের মধ্যে। শক্তাবৎ সৈন্যরা বিফল মনোরথ হয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল দুর্গ থেকে।

কিংবদন্তী আছে, রাজপুতরা যখন অন্তলাদুর্গ আক্রমণ করে সে সময়

ছ'জন মোগল সেনাপতি এমনভাবে দাবাখেলায় মেতেছিল যে, সৈন্যরা এসে দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে বলা সত্ত্বেও তাদের চৈতন্য ফেরেনি। যখন দুর্গ মধ্যে রাজপুতের আকাশ বিদারী জয়ডঙ্কা বাজতে শুরু করল তখনও নাকি তারা দাবার জটিল চালের মধ্যেই ডুবেছিল। শেষে রাজপুতরা তাদের সামনে এসে তরবারি উঁচিয়ে সংহার করতে উদ্যত যখন তখন তারা বিনিতভাবে কিছুক্ষণের জন্যে সময় চেয়েছিল তাদের কাছে।

'—দয়া করে একটুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমাদের খেলাটা শেষ হোক, তারপরে আপনারা হত্যা করবেন আমাদের। শুধু এইটুকু মিনতি।'

মোগল সেনাপতিদের কথায় অবাক হলেও রাজি হয়েছিল রাজপুতরা। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তাদের খেলা শেষ হল না তখন আর অপেক্ষা না করে দুজনকেই হত্যা করেছিল তারা।

রাণা উদয়সিংহর চব্বিশটি পুত্র। তার মধ্যে শক্তসিংহ দ্বিতীয়। শক্তসিংহর কোষ্টিপত্র তৈরি করার সময় দৈবজ্ঞ পণ্ডিতরা বলেছিল, এ ছেলে মিবারের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। পণ্ডিতের মুখে একথা শোনার পর শক্ত-সিংহকে তেমন সুনজরে দেখত না রাণা উদয়। একদিন রাণার কাছে বসে খেলা করছিল শক্ত। এমন সময় এক কর্মকার একখানা নতুন ছুরিকা নিয়ে উপস্থিত হল। ছুরিকার ধার পরীক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, হঠাৎ শক্তসিংহ কর্মকারের হাত থেকে ছুরিকাখানা কেড়ে নিয়ে পিতাকে সম্বোধন করে বললে, 'বাবা, এ ছুরি দিয়ে কি হাড় মাংস কাটা যায় না?'

এই বলে নিজের হাতের মধ্যেই বসিয়ে দিল ছুরির ডগাটি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সভাসদরা বিস্ময়ে হতবাক। রাণা উদয় কি ভাবল, পরে আদেশ করল, 'এই মুহূর্তেই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও শক্তকে। আমি তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।'

বালক শক্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। এমন সময় শালুম্ব্রা সর্দার উদয়সিংহর সামনে এসে করজোড়ে বললে, 'মহারাজ, এই অধীনের এক নিবেদন আছে। অনেক সময় অনেক কারণে আমার ওপর খুশী হয়ে আমাকে বর দিতে চেয়েছেন আপনি। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে নেব বলে

আমি তখন কিছু চাইনি। আজ আমি আপনার কাছে একটি বস্তুরপ্রার্থী। আপনি অনুগ্রহ করলে আমার অভিষ্ট পূর্ণ হয়।'

রাণা তখুনি সম্মত হল, 'বলুন আপনি কি চান, আমি দেব।'

শালুম্ব্রা বললে, 'আপনার কল্যাণে আমার অর্থের অভাব নেই, সম্মান গৌরবও পেয়েছি আমি প্রচুর। এসব আমি কিছুই চাই না। আমার পুত্র কন্যা কিছুই নাই। এই বিষয় বৈভবের কি গতি হবে। রাজপুত্র শক্তকে ধর্মপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে আমার কুলধর্ম বাঁচিয়ে রাখি, এই আমার ইচ্ছে।'

রাণা উদয়সিংহ শালুম্ব্রার প্রার্থনা পূর্ণ করল। শক্তসিংহর প্রাণদণ্ড মুকুব করে শালুম্ব্রার হাতে অর্পণ করে দিল সে। কিন্তু বিপদ হল পরে। বৃদ্ধবয়সে শালুম্ব্রাপতির পুত্র কন্যা জন্মাল। নিজের পুত্রকে বঞ্চিত করে দত্তকপুত্র শক্তকে উত্তরাধিকারী করার রীতি নেই। সঙ্কটে পড়ল শালুম্ব্রাপতি। এমন সময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রতাপসিংহ ডেকে পাঠাল শক্তকে। চন্দাবৎ সর্দারের অনুমতি নিয়ে দু'ভাই এক জায়গাতেই বাস করতে লাগল। দুজনের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে উঠল। কিন্তু খুব বেশীদিন টিকল না তা।

একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে একটি লক্ষ্য নিয়ে দু'ভাই এর মধ্যে তুমুল তর্ক আরম্ভ হল। কথা কাটাকাটি হতে হতে সত্যি সত্যি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে গেল। দুজনেই তরবারি খুলে দাঁড়াল। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল কেউই তাদের এই অনর্থ থেকে নিরস্ত করতে সাহস করল না। সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল। আজ এক অঘটন ঘটবে। মিবারের ভাগ্য বিপর্যয়ের মুহূর্ত উপস্থিত। কিন্তু কে তাদের বাধা দেবে। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে। এমন সময় ঐ পথ দিযে যাচ্ছিল গিহ্লোটবংশের পুরোহিত। দুভাইকে তরবারি খুলতে দেখেই হাঁহাঁ করে ছুটে এল সে।

'—মহারাজ, ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন।'

কিন্তু কে ক্ষান্ত হবে তখন। ক্রোধে টগবগ করে উঠেছে দেহের রক্ত। দুজনেই দুজনের জিদ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর.। তাতে যায় যাক প্রাণ,

কে পরোয়া করে। ব্রাহ্মণের সকাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করল না তারা। শেষে নিরুপায় হয়ে কুলপুরোহিত চিৎকার করে উঠল, 'আপনারা যদি নিরস্ত না হন তবে এখানেই আমি আত্মঘাতী হব।'

সে কথাতেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করল না। দুজনে তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টীতে তরবারি হাতে তাক খুঁজছে। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ ছুরিকা বের করে নিজের বুকেই আমূল বসিয়ে দিল। রক্তে ভেসে গেল পথ। পথের ওপরই লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।

ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে ব্রহ্মহত্যায় বিচলিত হল প্রতাপ। অনুশোচনায় ভরে গেল অন্তর। তরবারি কোষে পুরে শিশুর মত চিৎকার করে কেঁদে উঠল মহারাণা।

'—একি হল, একি করলাম আমি? এ পাপ কোথায় রাখব?'

শক্তসিংহকে তখুনি মিবার থেকে বিদায় করে দিল সে। অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য করে মনের জিঘাংসা মনে চেপেই রাজ্য ছেড়ে সোজা আকবরের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল শক্ত। মোগলের সেনাদলে যোগ দিয়ে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। অগ্রজের জীবন সংহার না করা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। এর পর থেকে প্রতাপের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল শক্তসিংহ। কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল প্রতাপ তখন তা দেখে অনুজ শক্তসিংহ আঘাত সহ্য করতে পারে নি। তার অনুসরণকারী খোরাসানি মুলতানি দুইটি মোগল সৈন্যকে হত্যা করে দাদাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। এরপর থেকে আবার দুভাই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মাল। সে সৌহার্দ আর নষ্ট হয়নি কোনদিন।

যে জায়গায় কুলপুরোহিত আত্মঘাতী হয়েছিল সেখানে একটি স্মারক-স্তম্ভ তৈরি করেছিল রাণা। পুরোহিতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি শেষ করে তার পুত্রকে একটি ভূমিবৃত্তি দান করেছিল প্রতাপ। আজও তার বংশধররা সেই ভূমিবৃত্তি ভোগ করে আসছে।

শক্তসিংহর সতেরটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভনজী এবং দ্বিতীয় অখিল শক্ত-

সিংহর মৃত্যুর সময় অন্যান্য পুত্ররা যখন পিতার শ্মশানকৃত্য করছে সে সময় ভিনসোর দুর্গের তোরণ বন্ধ করে বসে রইল ভনজী। ছোট ভাইদের ডাকে দরজা খুলে দিল না সে। শেষে, তারা যখন ভিনসোর দুর্গের কোনরকম আধিপত্য দাবি করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল তখন শুধু তাদের স্ত্রী-পুত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিদেয় হওয়ার ব্যাপারে ক্ষণকালের জন্যে দুর্গের দরজা খুলে দিয়েছিল সে। জ্যেষ্ঠের ব্যবহারে ঘৃণায় ক্ষোভে ভিনসোর পরিত্যাগ করে ইদর রাজ্যের দিকে চলে গিয়েছিল তারা।

ইদর তখন মারবারের রাঠোরদের অধিকারে। অখিলের স্ত্রী গর্ভবতী, সুতরাং তাকে নিয়ে খুব সাবধানে পথ চলতে হচ্ছিল। নীমহৈরার মধ্যে পালোড়ে উপস্থিত হওয়ামাত্র প্রসব-বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল সে। পালোড় তখন শোনিগুরু সর্দারের দখলে ছিল। অখিল তার কাছে আশ্রয় চাইল, কিন্তু শোনিগুরু আশ্রয় দিল না তাদের। কাছেই জাহ্নবী দেবীর ভাঙ্গা মন্দির। নিরুপায় হয়ে সেই মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল সকলে। দারুণ দুর্যোগে অন্ধকার হয়ে এল চারদিকে। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব-লীলা। তারপর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। মন্দিরের এক কোণে প্রসূতিকে রাখা হয়েছে। এমন সময় দেওয়ালের একটা অংশে ফাটল ধরে একখানা বিরাট শিলাখণ্ড খসে পড়ার উপক্রম হল প্রসূতির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে অখিলের ছোটভাই বল্ল এসে কাঁধ পেতে ঠেকিয়ে রাখল সেই বিরাট ভার। এদিকে অন্য ভাইরা ছুটল বাঁশ-কাঠ সংগ্রহ করতে। একটা গাছের শক্ত মোটা ডাল কেটে এনে ঠেকা দেওয়া হল। এইভাবে ঘোর বিপদের মধ্যে নবজাতকের জন্ম হল। তার দেহে কতকগুলো শুভচিহ্ন দেখে আশায় বুক ভরে উঠল তাদের। পুত্রের নাম রাখা হল আশা।

যথাসময়ে ইদর-রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল তারা। রাঠোর শাসনকর্তার কল্যাণে সবাই পুত্র-পরিবার নিয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

জৈনদের পাঁচটি পবিত্র পাহাড় আছে। শত্রুঞ্জয় তার মধ্যে একটি। একদিন রাণার মন্ত্রী এই পাহাড় থেকে ফিরছিল, এমন সময় ইদরে এসে সন্ধ্যা নেমে এল, এক জায়গায় তাঁবু গেড়ে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত করল।

কিন্তু প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে তাঁবু গেল উড়ে। রাজমন্ত্রী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। এই দুর্যোগের রাত। নিদারুণ কষ্টের মধ্যে, সপরিবারে, কোন কুল-কিনারা করতে পারল না সে। এমন সময় বল্ল ও অন্যান্য ভাইরা এসে সে-রাতে রাজমন্ত্রীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল সেদিন। রাজমন্ত্রী তাদের পরিচয় পেয়ে দুঃখ করে বললে, 'আপনারা অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে উদয়পুরে চলুন। মহারাজকে অনুরোধ করে আপনাদের উচ্চ-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করব আমি। এখানে থাকা আপনাদের উচিৎ না।'

বল্ল বললে, 'কিন্তু রাণার আমন্ত্রণ ছাড়া আমরা যাই কি করে। তিনি না ডাকলে আমরা তো যেতে পারি না।'

দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে পার্বত্য-সৈন্য সংগ্রহ করছিল রাণা। মন্ত্রীর মুখে সব শুনে তখনি ইদরে দূত পাঠানো হল। অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে নিয়ে বল্ল চলে এল উদয়পুরে। রাণা অমরসিংহ সম্মানীয়-সর্দারের পদে বহাল করল তাদের। অন্তলা-দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে বীরের মত জীবন উৎসর্গ করেছিল এই শক্তাবৎ-সর্দার বল্ল।

অন্তলার দুর্গ মোগল অধিকার থেকে উদ্ধার হয়েছে, মহাবীর বল্ল মুমূর্ষু অবস্থায় তখনও জীবিত। খবর পেয়ে রাণা ছুটে এল অন্তলায়। রাণাকে দেখামাত্র বল্ল কোনরকমে বলতে পারল, 'দুনা দুত্তার চৌগুনা জুজার, খোরাসানি মুলতানি কা অগ্‌গল।' অর্থাৎ রাজা তাদের ওপর যত অনুগ্রহ দেখাবেন তাদের আত্মোৎসর্গও তত বেড়ে যাবে।

কোন বিশেষ কারণে ভনজীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল রাণা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আবার রাণাকে খুশী করেছিল সে। ভাণ্ডীর দুর্গের রাঠোররা রাণাকে অসম্মান করায় ভনজী নিজের সেনাবল নিয়ে আক্রমণ করল ভাণ্ডীর। অনায়াসেই রাঠোরদের পরাজিত ও বিতাড়িত করল, দুর্গটি দখল করে মহারাণার হাতে তুলে দিল সে। মহারাণা তুষ্ট হয়ে ভাণ্ডীরের শাসন ভারও অর্পণ করল ভনজীকে।

শক্তাবৎরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী বংশ-বিস্তার করেছিল যে, দরকার হলে একসঙ্গে দশহাজার শক্তাবৎ এসে হাজির হতে পারত রাণার

সামনে। শৌর্যে ও বীরত্বে এরা একদিন রাজস্থানের অহঙ্কার ছিল। কিন্তু কালে, নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদের ফলে ধীরেধীরে এই বিরাট বংশ একরকম ধ্বংস হয়ে এসেছে।

অন্তলা রাণার অধিকারে গেছে, অসংখ্য মোগলসৈন্য তার হাতে বন্দী, দিল্লীর বাদশাহ চিন্তিত হয়ে পড়ল। পর পর চারবার পরাজয় হল তার। ভয় পেয়ে গেল জাহাঙ্গীর। কিন্তু হতাশ না হয়ে আজমীরের ভিতর দিয়ে আবার মিবার আক্রমণ করল সে। এবার সেনাপতি নিযুক্ত করল তারই এক পুত্র পারবেজকে। যুদ্ধে রওনা হওয়ার আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর পুত্রকে ডেকে বললে, 'আমি দেখতে চাই, দুর্জয় মিবারের রাণাকে তুমি পরাজিত করতে পার কিনা। হাঁ, একটা কথা মনে রেখ, রাণা বা তার পুত্র পরাজিত হয়ে যদি তোমার হাতে বন্দী হয় তবে তাদের মর্যাদার কোন ক্রুটী করবে না। এবং চিতোরের যেন কোন ক্ষতি না হয়। একথা তোমার সৈন্যদেরও জানিয়ে দিও।'

জাহাঙ্গীর ভেবেছিল, যুদ্ধে নিরস্ত হয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করবে রাণা অমরসিংহ। কিন্তু তা হল না। মোগলবাহিনী অভিযান করেছে শোনামাত্র ক্রোধে জ্বলে উঠল রাণা। আরাবল্লীর ক্ষেমার নামে এক গিরিবর্তে দুদলে সংঘর্ষ বেধে গেল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের এই যুদ্ধে রাজপুত সেনাদের সামনে টিকতে না পেরে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মোগল সৈন্য। অসংখ্য নিহত হল, বাকি সব প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল আজমীরের দিকে। কিন্তু জাহাঙ্গীর তার দিন লিপিতে এ সত্যকে চেপে লিখে রেখেছে, 'বিশেষ কারণে লাহোরে আসার প্রয়োজন হয়েছিল, সেজন্যে পারবেজকে আমি খবর দিয়েছিলাম। আমার আদেশে পারবেজ যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়ে লাহোরে উপস্থিত হয়েছিল। রাণার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে আমার পৌত্রকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলাম।'

পারবেজ পরাজিত, অবমানিত ও লজ্জিত হয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হল। তখন জাহাঙ্গীর পারবেজের পুত্রকে সেনাপতি করে রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠাল। তার সঙ্গে মহব্বৎ খাঁকেও পাঠানো হয়েছিল। বারবার

পরাজিত হয়ে মোগল বাদশাহ জিঘাংসায় অধীর হয়ে পড়েছিল। মিবারের রাণার রক্তে তর্পণ করার উপায় চিন্তা করতে লাগল সে। কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারল না। এদিকে পারবেজের পুত্র রাজপুত সৈন্যর হাতে নিহত হল। এই সময় মোগল সৈন্যরা মারমুখী হয়ে উঠেছিল। একদল নিহত হতে না হতেই আর একদল এসে মাথা পেতে দেয় রাজপুতের তরবারির নিচে। এইভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে মোগল সৈন্য আসতে লাগল এবং নিহত হতে লাগল। মোগল বাদশাহর সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ করে দিল রাণা। তবে শেষ পর্যন্ত কোনই ফল হল না। অসংখ্য মোগল সৈন্যর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একদিন রাণা অমরসিংহ নিঃসহায়, সম্বলহীন হয়ে পড়ল। সামান্য ক'জন মাত্র যোদ্ধা তখন জীবিত। তাদের বাহুবলের ওপর ভরসা করেই অপরিমিত মোগল সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল অমরসিংহ। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাজপুত যোদ্ধার মহাবিক্রমের সামনে অসংখ্য মোগল সৈন্যও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এইভাবে পরপর সতের বার মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সগৌরবে জয় পতাকা উড়িয়ে ফিরে এসেছিল রাণা অমরসিংহ। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীর দমবার পাত্র নয়। আবার যুদ্ধের আয়োজন হল। এবার পুত্র খুরমকে সেনাপতি করে পাঠানো হল। অল্প বয়সেই যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠেছিল সে। খুরমই পরে সম্রাট হয়ে 'শাজাহান' নামে খ্যাত হয়েছে।

কোষাগার অর্থশূন্য, দুর্গ সৈন্য-শূন্য। অস্ত্র নাই। এই ভীষণ সংকটে কে উদ্ধার করবে? বিশাল মোগল বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করবে কে? এক গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক চিরে। ভেবে কোন কুলকিনারা পায় না রাণা অমরসিংহ। এবার মিবারের পতন অনিবার্য। রাণার সঙ্গে সঙ্গে মিবারের প্রতিটি প্রজাও দারুণ চিন্তিত। তবে কি মুসলমানের দাসত্বেই দিন কাটাতে হবে তাদের? যার যা ছিল সব এনে ঢেলে দিতে লাগল রাণার কাছে। ধীরে ধীরে আবার কিছু সম্পদে ভরে উঠল চিতোরের রাজভাণ্ডার। আবার তৈরি হল অস্ত্রশস্ত্র, রণসজ্জা। সংগ্রহ করা হল রাজপুত যোদ্ধা। আবার মোগলের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেল

সসৈন্য রাণা অমরসিংহ। কিন্তু বিপুল মোগল সৈন্যর সামনে কতক্ষণ টিকতে পারে সামান্য কিছু রাজপুত যুবক। যারা কখনও অস্ত্র ধরেনি, আজ প্রয়োজনের তাগিদে তারাই এসেছিল যুদ্ধ করতে। গিহ্লোটবংশের এতদিনের গৌরব, মর্যাদা, অহঙ্কার আজ শেষ হয়ে গেল জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরমের হাতে। আত্মচরিত লিখতে গিয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীর শিশোদীয় কুলের এই শোচনীয় পরাজয়ের যে চিত্র এঁকে রেখেছে তা এই রকম ঃ

"রাজত্বলাভের আট বৎসর পরে, ১০২২ হিজিরা সালে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) আজমীরের মধ্য দিয়ে আমি খুরমকে মিবার অভিযানে পাঠাই। তার সৈন্যদল ছাড়াও সেনাপতি আজিম খাঁর অধীনে আরও বার হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। আমার সমস্ত কর্মচারীকেই যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়েছিলাম।

খবর এল, খুরমের হাতে রাণা অমরসিংহ পরাজিত হয়েছে। রাণার প্রিয়তম হাতী আলম গোমান এবং আরও সতেরটি হাতী জয় করে আমার কাছে পাঠিয়েছে সে। পরদিন আলম গোমানে চড়ে আমি সারা শহর ঘুরলাম। দীন দুঃখীদের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদিও বিতরণ করা হল। অল্পদিনের মধ্যেই খবর পেলাম, মিবারের অনেকগুলো দুর্গ খুরম জয় করেছে। রাণাও আমার বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়েছে। পুত্র কর্ণ ও হরিদাস ঝালা নামে দুজন সর্দারকে খুরমের কাছে পাঠিয়ে রাণা অনুরোধ জানিয়েছে, সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় নিজে উপস্থিত থাকতে না পেরে পুত্র কর্ণকে দিল্লীর রাজদরবারে পাঠাতে চায়। তার দৈহিক অক্ষমতার জন্যে ক্ষমা চেয়েছে রাণা অমরসিংহ।

আমি খুশী হলাম। তখনি আমার পুত্রকে প্রতিনিধি পাঠালাম তার কাছে। নির্ভয়ে সে বাস করতে পারে বলে জানালাম। যে প্রমাণপত্র 'পাঞ্জা' পাঠালাম, তাতে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ আঁকা ছিল। পুত্রকেও বলে পাঠালাম, রাণা মহাসম্মানের পাত্র, তাকে যেন কোন কারণেই অসম্মান না করা হয়। তার ইচ্ছে অনুসারেই যেন সব কিছু ব্যবস্থা করা হয়। যথাসময়ে আমার পাঞ্জা পাঠিয়ে দিয়েছিল সে রাণার কাছে। স্থির

হল, ২৬ তারিখ রাণা আমার পুত্রের কাছে উপস্থিত হবে। অল্পদিনের মধ্যেই খুরমের অধীনস্থ মহম্মদবেগের মারফৎ খবর পেলাম, রাণা আমার পুত্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এই শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্যে তখুনি তাকে একটি হাতী, একটি অশ্ব এবং একখানি ছুরিকা উপহার দিয়ে 'জুলফিকার' খেতাব দিলাম।

রাণার সম্মান-সম্ভ্রম ও অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয়নি। সাতটি হাতী, নয়টি অশ্ব, কাঞ্চনমণ্ডিত কতকগুলো অস্ত্রশস্ত্র এবং একখানি পদ্মরাগমণি উপহার দিয়েছে খুরমকে। খুরমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সে। খুরমও তাকে আশ্বাস দিয়ে একটি হাতী, কয়েকটি অশ্ব, একখানি তরবারি এবং কতকগুলো রাজকীয় সামগ্রী উপহার দিয়েছে। রাণার সঙ্গে যে সব রাজপুতরা এসেছিল তারাও যথাযোগ্য পুরস্কৃত হয়েছে। রাণার পুত্র পিতার সঙ্গে আসেনি। হিন্দু রাজারা পিতা-পুত্র এক সঙ্গে শত্রুর সামনে উপস্থিত হয় না। শিগগিরই কর্ণকে পাঠাবে বলে সেদিন রাণা বিদায় নিয়েছে। যথাসময়ে কর্ণ খুরমের কাছে উপস্থিত হলে তাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করে আমার দরবারে নিয়ে আসা হয়েছিল। পুত্রের অনুরোধে কর্ণকে আমি আমার ডানপাশে আসন দিয়েছি। কর্ণ একটু লাজুক ধরনের মানুষ। বেশী কথা বলতে ভালবাসে না। আমার কাছে আসার একদিন পরেই আমি তাকে একখানি রত্নমণ্ডিত ছুরিকা উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেছি। তৃতীয় দিনে একটি ইরাবতী হাতী উপহার দিয়ে তাকে নিয়ে আমার বেগম নূরজাহানের নিকট উপস্থিত হই। সেও একটি হাতী ও কতকগুলো মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিয়ে কর্ণকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আমিও সেদিন কর্ণকে একছড়া মুক্তাহার উপহার দিয়েছি। তারপর দিনও একটি হাতী দিয়েছি তাকে। দুষ্প্রাপ্য এবং সুন্দর কোন কিছু পেলেই আমি কর্ণকে উপহার দিতাম। একদিন তাকে আমি তিনটি বাজপাখি এবং তিনটি তুরাপাখি উপহার দিলাম।

আমার রাজত্বের দশম বছরে মোবারিক খাঁকে সঙ্গে দিয়ে কর্ণকে তার জায়গীর চিতোরে পাঠালাম। যাত্রাকালে পঞ্চাশহাজার টাকা মূল্যের

একছড়া মুক্তামালা এবং আরও অনেকগুলো মহামূল্য বস্তু উপহার দিলাম তাকে। যতদিন আমার কাছে ছিল সে ততদিনের মধ্যে আমি তাকে যে-সব বস্তু উপহার দিয়েছিলাম তার আনুমানিক মূল্য দশলক্ষ টাকারও বেশী হবে। এছাড়া আমার পুত্র খুরমের কাছে থেকেও বহু মূল্যবান বস্তু উপহার পেয়েছিল সে। রাণাকে উপহার দেওয়ার জন্যে কর্ণের সঙ্গে একটি হাতী, একটি অশ্ব ও অন্যান্য অনেকগুলো বহুমূল্য সামগ্রী পাঠানো হল।

১০২৪ হিজিরাব্দে ৮ই সফর তারিখে পাঁচহাজারী মসনদদারী পেল কর্ণ। সেই সঙ্গে রাণা দেবমল্ল, তুনগারপুরের সামন্তরাজাদের ওপর আধিপত্য এবং খৈয়ার, ফুলিয়া, বেদনোর, মণ্ডলগড়, জীরন ও ভিনসোর তাকে দেওয়া হল। এই সময় কর্ণ বয়সে নবীন যুবক মাত্র। যথাযোগ্য বন্দনাদির পর তাকে আসন প্রদান করা হল। সাবনের দশ তারিখে বহু মূল্যের উপহার নিয়ে জগৎসিংহ বিদায় নিল। কর্ণর শিক্ষক হরিদাস ঝালার জন্যে মূল্যবান পুরস্কার পাঠানো হল। এই সঙ্গে কর্ণকে ছয়টি স্বর্ণপ্রতিমা উপহার দিলাম।

আমার রাজত্বের একাদশ বৎসরে ২৮এ রবিউল-আউয়ল তারিখে শ্বেতপাথরে খোদাই করা তুটো প্রতিমূর্তি নিয়ে আসা হল আমার কাছে। তার একটি মিবারের রাণা অমরসিংহর, অন্যটি কর্ণর। আমার আদেশেই তৈরি হয়েছিল তা। সেই দিনই আগ্রার বাগানে মূর্তি তুটো প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিলাম। কিছুদিন বাদে এটিমদ খাঁ আমার কাছে বিস্তারিত এক পত্র লিখেছিল। তা থেকে জানতে পারলাম, খুরম রাণার কাছে গিয়েছিল। রাণা ও রাজকুমার তাকে সাতটি হাতী, সাতাশটি অশ্ব ও বহুমূল্য স্বর্ণ রত্নাদি নজরানা দিয়েছে। খুরম তিনটি মাত্র অশ্ব গ্রহণ করে আর সব তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এইদিন ঠিক হয়েছে, প্রয়োজন হলে যুদ্ধের সময় সতের শো রাজপুত অশ্বারোহী নিয়ে খুরমের পাশে উপস্থিত থাকবে কর্ণ।

রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে সিন্দিলা নামে একজায়গায় সভা করতে গিয়েছিলাম। সেখানে রাজকুমার কর্ণ আমাকে জানাল, দক্ষিণ-প্রদেশ জয়ের জন্যে সে আমাকে সাহায্য করবে। একশো মোহর, একহাজার টাকা,

কয়েকটি হাতী, অশ্ব এবং একুশ হাজার টাকা মূল্যের কতকগুলো স্বর্ণরত্নাদি সে আমাকে নজর নিল। আমি অশ্বগুলো তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যগুলো রাজভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিলাম। কর্ণকে একটি সম্মান-সূচক পোশাক, হাতী অশ্ব, ছুরিকা ও তরবারি এবং রাণার জন্যে অশ্ব দিয়ে তাকে বিদায় দিলাম।

চতুদর্শ বৎসরে ১০২৯ হিজিরার ১৭ই রবি-উল-আউল তারিখে রাণার এক পুত্র ভীমসিংহ ও পৌত্র জগৎসিংহ আমার কাছে উপস্থিত হয়ে জানাল, রাণা ইহলোক ত্যাগ করেছে। ভীমসিংহ ও জগৎসিংহকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে অভিষেকের যাবতীয় সামগ্রী পাঠিয়ে দিলাম। কর্ণকে রাণা উপাধি দান করলাম আমি। সাবনের ৭ তারিখ আমার পাঞ্জাপত্র পাঠানো হল। তার পুত্র যেন সসৈন্যে আমার কাছে চলে আসে। বিহারী দাস বর্মণ চিঠিখানা নিয়ে রওনা হয়ে গেল।'

জাহাঙ্গীরের এই আত্মচরিত পড়লেই তার উদার-হৃদয়ের কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতাপসিংহর পুত্র অমরসিংহকে পরাজিত করে অসাধারণ আনন্দ পেয়েছিল সত্যি, কিন্তু সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়নি সে কখনও। নিরুপায়, নিঃসহায়, নিঃসম্বল হয়ে অবশেষে সম্রাটের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছিল রাণাকে। এ তথ্য জাহাঙ্গীরের জানা ছিল। সম্রাটের কাছে উপস্থিত থেকে সেবা করার আত্ম-অবমাননা সহ্য করতে পারবে না বলেই কর্ণকে দরবারে পাঠাবার জন্যে প্রার্থনা করেছিল সে। এ তথ্যও অনুমান করতে পেরেছিল উদার-হৃদয় জাহাঙ্গীর। রাণার হৃদয়ের যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরে বাদশাহর মনও ব্যথিত হয়েছিল।

শিশোদীয় রাজারাই রাজপুতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই রাজবংশকে নিজেদের অধীনে আনার জন্যে তার পিতৃপুরুষরা কত যত্ন, কত চেষ্টা কত অর্থ-ক্ষয়, লোক-ক্ষয় করে গেছে তার পরিমাপ করা সম্ভব না। তবু তারা কৃতকার্য হতে পারে নি। আজ বাদশাহ জাহাঙ্গীর সেই যুগ যুগের ইপ্সিত-ধন করায়ত্ব করতে পেরেছে। এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়? গর্বে বুক ফুলে ওঠে তার।

শুধুমাত্র পশুবল এবং অসি-বলে ভারত শাসন করা সম্ভব না, এ সত্য

মোগলরাই ভাল করে বুঝেছিল। মোগল বাদশাহ অমরসিংহর প্রতি যে সম্মান-সম্ভ্রম প্রদর্শন করেছিল, কোন বিজিত রাজাই কোন কালে কোন জেতার কাছ থেকে সে সম্মান-সম্ভ্রম পায়নি। কিন্তু সে সম্মান-সম্ভ্রমে তেজস্বী অমরসিংহর মন ভিজে নি এক দিনের জন্যেও। বরং যখনই সে এই ভূয়ো সম্মান-সম্ভ্রমের কথা স্মরণ করত, তার সারা দেহমন বিষে জ্বলে যেত। এক এক সময় উন্মত্ত হয়ে জাহাঙ্গীর এবং খুরমের বদান্যতার জন্যে বার বার অভিশাপ দিত। অম্বরের কচ্ছাবহ রাজকুমারীর গর্ভে খুরমের জন্ম। রাজপুত যোদ্ধাদের ওপর তার আন্তরিক ভক্তি ছিল। শুধু এই খুরমের আন্তরিক ভক্তি ও আদরে মুগ্ধ হয়ে রাণা জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হয়েছিল। রাণার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হয়ে খুরম রাণাকে লিখে পাঠাল, 'নগরের বাইরে এসে আপনি যদি একবার বাদশাহর পাঞ্জাপত্র গ্রহণ করেন, সেই মুহূর্তেই আমি আমার সমস্ত সৈন্যকে মিবারের বাইরে পাঠিয়ে দেব। মিবারের মধ্যে আপনি আর মুসলমানের চিহ্ন দেখতে পাবন না।'

খুরমের প্রস্তাবে রাণা সম্মত হতে পারল না। রাণা প্রতাপের পুত্র হয়ে মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করবে কি করে? শুধু বন্ধুভাবে খুরমের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করল সে। এবং অল্পদিন পরেই পুত্রের কপালে রাজটীকা পরিয়ে দিয়ে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে নচৌকির অরণ্য কুটীরে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেখানেই সে কাটিয়ে গেছে। মৃত্যুর পর তার দেহ প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে আসা হয়। রাজস্থানের বহু শিলালিপিতে এবং পাহাড়ের গায়ে অমরসিংহর কাহিনী খোদাই করা আছে।

১১

মিবারের গৌরব মৃতপ্রায়। এক সময়ে বাপ্পাকুলের তেজ ও গৌরবে সারা মিবার ঝলমল করত। আজ মোগলের প্রচণ্ড দাপটে সব ক্ষয়ে ম্লান

হয়ে গেছে। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহর জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণ সিংহাসনে বসল। উপযুক্ত রাজপুত রাজার মোটামুটি সবগুলো গুণই তার ছিল। মোগলের দাসত্ব স্বীকার করে সে বাপ্পার কুলগৌরব নষ্ট করেছে, অনেকে মনে করতে পারে। কিন্তু তার পূর্বপুরুষরা যুদ্ধ করতে করতে মিবারকে শূণ্যভাণ্ড করে ফেলেছিল। সে অবস্থায় ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরামের সর্দারি শুনবে কে? এদিক থেকে মোগলের সঙ্গে আতাঁত রেখে সে মিবারের ওপর সুবিচারই করেছিল। এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। নিজেদের বংশ-গৌরব রক্ষা করতে গিয়ে হাজার হাজার যোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছে একদিন। লক্ষ লক্ষ টাকার যোগান এসেছে প্রজাদের কাছ থেকে। তবু কালের আবর্তে সে বংশ-গৌরব বাঁচানো যায় নি।. যায় না। কোন কিছুই চিরকাল ধরে রাখা যায় না। মানুষ চেষ্টা করবে চিরকাল, কিন্তু শুধু এক বিন্দু নয়নের জল ছাড়া সময়ের চাকার তলায় সবই চাপা পড়ে যায়।

রাণা হওয়ার পর কর্ণ সুরাট আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন এনে মিবারের হারানো শ্রী ফিরিয়ে আনল খানিকটা। অমরসিংহর সঙ্গে বাদশাহর সন্ধির অন্যতম সর্ত ছিল, যতদিন না অমরসিংহর পুত্রদের মধ্যে কেউ রাণা উপাধি ধারণ ক'রে সিংহাসনে বসবে ততদিন তাদের সম্রাটের দরবারে হাজিরা দিতে হবে। রাণা হওয়ার পর তারা এ দায় থোক অব্যাহতি পাবে। রাণা উপাধি ধারণ করার পর আর দিল্লীর দরবারে বসতে হল না কর্ণকে।

কর্ণের কনিষ্ঠ ভীম। সাহসে, তেজে এবং বিক্রমে ভীমের সমান যোদ্ধা তখন খুব কমই ছিল। যে সব শিশোদীয় সর্দাররা মোগল সম্রাটের অধীনে ছিল, ভীম নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সম্রাট এবং খুরম দুজনেই খুব ভালবাসত তাকে। তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে খুরমের অনুরোধে বাদশাহ জাহাঙ্গীর ভীমকে রাজা উপাধি দিয়ে বুনাসের তীরে একটি ছোট জনপদ উপহার দিয়েছিল। তার রাজধানী তোড়া। ভূমিবৃত্তি পাওয়ার পর বুনাসের ধারে সে রাজমহল নামে এক নতুন নগর গড়ে তুলেছিল। রাজমহলের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও পূর্ব-সমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই সময় থেকে বহুকাল পর্যন্ত রাজমহল ভীমের বংশধররা

ভোগদখল করেছিল।

ভীম স্বভাবত তেজস্বী, উগ্রস্বভাব ও নির্ভীক ছিল। তার সহজাত স্বভাব, নিজের গৌরব ও পুরুষত্ব বিকিয়ে দিয়ে রাজউপাধি বা সামান্য ভূমিবৃত্তির পরোয়া করত না সে। তাকে বশে আনার জন্যে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাতে লাগল জাহাঙ্গীর। কিন্তু তাতে ভবী ভুলবার পাত্র না। সে খুরমের অকপট বন্ধু। খুরম মিবারের হৈতষী, আর পারবেজ ছিল রাজপুত বিদ্বেষী। মিবারকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেওয়ার পক্ষপাতী। তাই ভীম চেষ্টা করতে লাগল, জাহাঙ্গীরের পর খুরম যাতে দিল্লীর গদি পায়। বাদশাহ এই ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরে ভীমকে খুরমের কাছে থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে তাকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল। ভীম কিন্তু সে পদ গ্রাহ্য করল না। খুরমের কাছেই সে থাকতে চায়, খুরমের কাছেই সে থাকবে।

ধীরে ধীরে দিল্লীর মসনদ নিয়ে পুত্রদের মধ্যে ঘোর বিরোধ বেধে গেল। অগ্রজ পারবেজ জীবিত থাকতে খুরমের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পথ নাই। তাই সে সব-আগে পারবেজকে খতম করার জন্যে তার বিরুদ্ধে দলবল নিয়ে অভিযান করল। পারবেজ যুদ্ধে অপটু। অনায়াসেই খুরম তাকে হত্যা করে পথের প্রধান কাটা দূর করল। এরপর সে পিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এসময় যারা তার এ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল মারবারের রাজা গজসিংহ তাদের মধ্যে প্রধান। শুধু তার মন্ত্রণাতেই খুরম পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে কুণ্ঠিত হয়নি। সম্পর্কে গজসিংহ খুরমের মাতামহ। দিল্লীশ্বরের মনে কোন প্রকার সন্দেহ না জাগে সে জন্যে সে আড়ালে আড়ালে থেকে গুপ্ত-মন্ত্রণা দিত খুরমকে।

পুত্র খুরমের বিদ্রোহ দমনের জন্য পিতা জাহাঙ্গীরকে সমর-অভিযান করতে হল। এ যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিল জয়পুরের রাজা। গজসিংহ অতি চালাক। সে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। পিছে বাদশাহর মনে কোন সন্দেহ হয় সেজন্যে সে সরাসরি খুরমের হয়ে অস্ত্রধারণ করল না। এ ব্যাপার কিন্তু ভীমের ভাল লাগল না। সে স্পষ্ট ভাষায়

জানিয়ে দিল গজসিংহকে, ‘একি ব্যবহার আপনার, হয় আপনি প্রকাশ্যভাবে খুরমকে সাহায্য করুন না হয় জাহাঙ্গীরের দলে যোগ দিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। এরকম ঢাক ঢাক গুড় তো আমার আদৌ ভাল লাগছে না।’

ভীমের কথায় গজসিংহর মুখোশ খুলে যাওয়াতে চটে গেল সে। ভীমের সঙ্গেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে গেল গজসিংহ। তার বীরত্বের সামনে ভীমের দলবল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে নিজেও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বেচারার সব সাধ শেষ হয়ে গেল।

শক্তাবৎ-সর্দার মানসিংহ এবং তার এক ভাই গোকুলদাস ভীমের প্রধান পরামর্শদাতা ছিল। খৈয়ারের সনওয়ার নগরের শাসনসভার ছিল মানসিংহর ওপর। অমরসিংহর সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখিয়ে শিশোদীয় কুলের মহাযোধ উপাধি পেয়েছিল সে। মানসিংহর প্রাণের বন্ধু ছিল ভীম। ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হল মান তখন রোগ-শয্যায়। এ অবস্থায় ভীমের মৃত্যু সংবাদ দিলে মান সহ্য করতে পারবে না বলেই সে-সংবাদ তখন তাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু যে-বন্ধু অহরহ তার কাছেই থাকে তাকে পুরো একটা দিন চোখের সামনে দেখতে না পেয়ে অধীর হয়ে উঠল। পাঁচক খাবার নিয়ে এসেছিল, তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আমাকে সত্যি করে বল, ভীম কোথায়? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছে কিনা, কেমন আছে?’

পাচককে নিরুত্তর থাকতে দেখে মান সবই অনুমান করতে পেরেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর শোকে হার্টফেল করে মারা গেল সে।

খুরমের ডান হাত ভীম নিহত। তার সেনাদলও বিচ্ছিন্ন। অন্যকোন উপায় না দেখে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসে উদয়পুর প্রাসাদে আশ্রয় নিল। খুরমের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে রাণা কর্ণ উদয়সাগরের মধ্যে দ্বীপের ওপর এক রমণীয় গৃহ তৈরি করে দিল তার চিত্ত বিনোদনের জন্যে।

খুরমের ইচ্ছে অনুসারে সেই অট্টালিকার প্রাঙ্গণে মাদারশাহ ফকিরের স্মরণে এক চৈত্যও তৈরি করে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল দুজনের। বাদশাহ জাহাঙ্গীর যেমন আন্তরিক স্নেহ করত কর্ণকে,

খুরমও তেমনি আন্তরিক ভালবাসত তাকে। খুরম অনেক উপকার করেছিল মিবারের। কর্ণ এই উপকার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছিল। রাজপুতরা একমাত্র ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর সঙ্গেই উষ্ণীষ বিনিময় করে থাকে। খুরমের সঙ্গে তার এতটা সখ্য গড়ে উঠেছিল যে, রাজপুত হয়েও সে মুসলমানের সঙ্গে উষ্ণীষ বিনিময় করেছিল। যেখানে বসে এই উষ্ণীষ বিনিময় হয়েছিল সেই মনোরম অট্টালিকা আজ ধ্বংসস্তূপ মাত্র। শুধু তার সামনে মাদার-শাহর চৈত্যটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। শিশোদীয় বংশধররা এই চৈত্যটি তৈরি করার দিন থেকে একটি প্রকাণ্ড তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। এত ঝড় ঝঞ্ঝা গেছে, এত অভাব অনটন এসেছে, তা সত্ত্বেও এ প্রদীপটি আজও জ্বলছে।

অনিন্দ্য-স্নুন্দর বিলাসভবনে আরামে বাস করেও কিন্তু খুরমের মনে শান্তি এল না। নানা চিন্তা, আশঙ্কা এসে ঘিরে ধরল তাকে। কিছুদিন বাদেই ভারতবর্ষ ছেড়ে পারস্যে চলে গেল সে। অনেকের ধারণা, পারস্যে না গিয়ে খুরম গোলকুণ্ডায় গিয়েছিল। কর্ণর বড় সাধ ছিল, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ-ভবনের মধ্যেই তাকে সম্রাটের আসনে অভিষেক করবে, কিন্তু সে-সাধ তার মিটল না।

আট বৎসর সুখে সচ্ছন্দে রাজত্ব করার পর ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে পুত্র জগৎসিংহকে রাজ্যভার দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিল কর্ণ। তার মৃত্যুর অল্পকাল পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হল। খুরমের ভাগ্য প্রসন্ন হল এতদিনে। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেল সে কর্ণ-পুত্র জগৎসিংহর দূতের কাছে। খুরম তখন সৌরাষ্ট্রে অবস্থান করছিল। সংবাদ পাওয়ামাত্র উদয়পুরে এসে রাণা জগৎসিংহর সঙ্গে দেখা করল সে। সারা উদয়পুর আনন্দে নেচে উঠল। আলোর মালায় সাজানো হল শহর। সমস্ত সামন্ত-রাজারা মিলে খুরমকে সম্রাট শাজাহান নামে অভিষেক করল দিল্লীর সিংহাসনে। সেদিন উদয়পুরের ঘরে ঘরে আমোদপ্রমোদ নাচগানের লহরা চলল। অন্য কোন মোগল বাদশাহর রাজ্যাভিষেকের সময় হিন্দু রাজা-প্রজারা এভাবে আনন্দ উৎসবে মাতেনি কখনও।

জগৎসিংহর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ শাজাহান পাঁচটি জনপদ উদ্ধার করে রাণাকে দান করল। এছাড়া একটি অমূল্যরত্ন পদ্মরাগমণি উপহার দিল তাকে। চিতোরের জীর্ণ দুর্গ ও প্রাসাদগুলোর সংস্কারের জন্যে যা অর্থ প্রয়োজন, জগৎসিংহর হাতে তুলে দিল সে।

রাণা জগৎসিংহ পরম সম্মানীয় রাজা ছিল। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে তার রাজত্বকালের তেমন কোন বিবরণ লেখা হয়নি। এর প্রধান কারণ, মিবারের ভাটরা বীররস প্রিয়। বীররসের বর্ণনা করতেই তারা ভালবাসত। জগৎসিংহর রাজত্বকাল নিরুপদ্রব, শান্তিময়। এই কারণেই তার রাজত্বকালের মহিমা বর্ণনায় তেমন উৎসাহ দেখায়নি কোন ভাটরা। তার ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খচিত অট্টালিকা তৈরি করেছিল রাণা জগৎসিংহ। আজও উদয়পুরের জীর্ণ-প্রায় সেই অট্টালিকার দিকে তাকালে স্থাপত্যবিদ্যায় তার অসাধারণ অনুরাগ অনুমান করা যায়।

পেশোলা লেকের মধ্যে জগমন্দির, লেকের ধারে জগনিবাস তৈরি করেছিল জগৎসিংহ। এই দুই বিলাসভবনের মধ্যে নানারঙের কাঁচ বসিয়ে সুরম্য করে তোলা হয়েছে। এর দরজাগুলো ছিল ধাতুনির্মিত। আয়নার মত স্বচ্ছ এই দরজার কপাটে এসে প্রতিহত হত সূর্যের রশ্মি। সারা ঘরের সাজানো কাচের শোভায় গিয়ে ঠিকরে পড়ত আলো। ঝলমল করে উঠত সারা প্রমোদ-ভবন।

আকবরের দাপটে চিতোরের যে সব সৌন্দর্য একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল জগৎসিংহ তার কিছুটা সংস্কার করেছিল। মালবুরুজা, সিংহদ্বার এবং ছত্রকোট প্রভৃতি আবার সুদৃশ্য করে তুলেছিল সে।

জগৎসিংহর দুইপুত্র। রাজসিংহ জ্যেষ্ঠ। মারবার রাজকন্যার গর্ভে তার জন্ম। জগৎসিংহর মৃত্যুর পর রাজসিংহ রাণা হল। সুখে, সাচ্ছন্দ্যে, ললিতাভ্যাসের মধ্যে মিবারবাসীরা এতকাল দিন কাটিয়ে আসছিল, কিন্তু রাজসিংহর রাজত্বকালে সব সুখ শান্তি কোথায় উবে গেল। আবার অশান্তি, অরাজকতা, অন্তর্বিপ্লব এবং যুদ্ধের হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপতে থাকল।

সম্রাট শাজাহান বৃদ্ধ। তার চার পুত্রের মধ্যে দারা অগ্রজ। পিতা জীবিত থাকতেই জঘন্য উপায়ে সিংহাসন দখল করে বসার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল ভাইদের মধ্যে। কে অগ্রজ কে অনুজ সে চিন্তা করল না কোন ভাই। সবার মনেই দারুণ লোভ। সিংহাসন দখলের লোভ। এই নিয়ে ভাইএ ভাইএ হানাহানি শুরু হল। বৃদ্ধ পিতাকে লাঞ্ছিত করতেও দ্বিধা করল তারা। আর এই ভ্রাতৃ বিরোধের ইন্ধন যোগাতে শুরু করল রাজবাবার রাজারা। মিবারের রাণা রাজসিংহ সাহায্য করল দারাকে। দারা অগ্রজ। বিধি অনুসারে সে-ই রাজত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী। ফতেহাবাদে ভীষণ সংগ্রাম শুরু হল। দারা, সুজা ও মুরাদ পরাজিত হল। অউরঙ্গজেবের ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। দিল্লীর মসনদে চেপে বসল সে।

এইবার সে প্রতিশোধ নেবে। যারা তার বিরুদ্ধাচারণ ক'রে অন্য ভাইদের হয়ে লড়াই করেছিল এবার তাদের নির্মম নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা হতে লাগল। পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি নিজের হাতে নিজের পুত্রকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় নি পাষণ্ড। রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে যে নৃশংসতা এবং পৈশাচিক কাণ্ডের অবতারণা করেছে সে তা মনে করলেও আঁৎকে উঠতে হয়। এর ফলে যে মোগল শাসনের শিকড় শুদ্ধ উপড়ে গিয়েছিল সে কথা সেদিন ভাবেনি অউরঙ্গজেব।

মোগল বাদশাহ আকবর তার পিতামহ বাবরের নীতিতে রাজ্যশাসন করেছিল, এবং এই নীতি অনুসরণ করেই জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান রাজত্ব করেছে। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি এক বিন্দু। কিন্তু দুষ্ট অউরঙ্গজেব তা অনুধাবন করতে পারল না। অন্যান্য মোগল বাদশাহদের মত অউরঙ্গজেবও যদি রাজপুত রাজাদের সঙ্গে আতাঁত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারত তাহলে আরও বহুকাল দিল্লীতে মোগল বাদশাহরাই রাজত্ব করতে পারত। কিন্তু পরধর্ম বিদ্বেষী, সংকীর্ণ হৃদয় অউরঙ্গজেবের সে দূরদর্শিতা ছিল না। রাজপুতদের সঙ্গে সে অসদ্ব্যবহার শুরু করল। তার ফলে শুধু রাজস্থানের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হল না সারা মোগল রাজ্যই জ্বলে উঠল অশান্তির আগুনে।

তাতার রমণীর গর্ভে অউরঙ্গজেবের জন্ম। সুতরাং রাজপুতদের ওপর বিদ্বেষ তার জন্মগত। তার পিতা শাজাহান এবং পিতামহ জাহাঙ্গীর জন্মেছিল রাজপুত কন্যার গর্ভে, সেজন্যে জন্মগত-ভাবেই তারা খানিকটা রাজপুত শুভানুধ্যায়ী ছিল, কিন্তু অউরঙ্গজেবের মধ্যে সে গুণের বালাই ছিল না। তাই যখন সে পিতাকে কারাগারে বন্দী ক'রে, ভ্রাতা এবং পুত্রকে হত্যা ক'রে রাজ্যশাসন করতে শুরু করল তখন সারা মোগল সাম্রাজ্যের রাজা-প্রজারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইল। রাজস্থানের কোন রাজাই সহযোগিতা করল না তার। এমন্ কি কোন কোন রাজা তার শত্রুতাও শুরু করে দিল।

বহুকাল পরে অউরঙ্গজেব তার কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরেছিল। তারপর থেকে সে নিজেকে বাবরের নীতিতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এবং তার সুফলও সে পেয়েছিল হাতে হাতে।

অউরঙ্গজেব বিদ্বান, বীর ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু যে বিদ্যা নিজের এবং অন্যের উন্নতির কাজে সমানভাবে ব্যবহার হয় না তার কোন মূল্য নেই। শঠতা এবং নিচতা এসে তার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। মানুষ হিসেবে তার আসন জন্তু জানোয়ারদেরও নিচে। এপর্যন্ত যতগুলো মুসলমান রাজা ভারতে রাজত্ব করে গেছে অউরঙ্গজেব তাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য প্রকৃতির। ছলনা এবং স্বার্থপরতায় তার তুল্য আর কেউ ছিল না। অউরঙ্গজেবের মত পরধর্ম বিদ্বেষীও খুব কম দেখা যায়। সে কাউকে বিশ্বাস করত না, এমন কি নিজের স্ত্রী পুত্রকেও না। কারো কাছেই সে প্রাণের কথা খুলে বলতে পারত না। নিজের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র এবং আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করে পথের সব কাঁটা তুলে ফেলে নিশ্চিত মনে রাজ্যভোগ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু এত পাপ মাথায় করে কি মনে শান্তি পায় কেউ। এক অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় উন্মত্তের মত সারাজীবন ছটফট করে মরেছে সে। আশঙ্কা, সন্দেহ এবং নানা প্রকার বিভীষিকায় চিত্ত-বিকার ঘটল তার। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হত, এই বুঝি তাকে হত্যা করে তার সব কেড়ে নেবে কেউ। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সভাসদ, আমাত্য সবাই বুঝি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে, সুযোগ পেলেই

তারা গলা টিপে ধরবে তার। এই সব উদ্ভট চিন্তায় অস্থিরভাবে দিন কেটেছে।

শেষে এই জটীল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এক বিস্তৃত উপায় ঠিক করল সে। ঘোষণা প্রচার করা হল, দেশের সমস্ত হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। যারা এর প্রতিবাদ করবে তাদের ওপর রাজবল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না বাদশাহ। অউরঙ্গজেবের ধারণা জন্মেছিল, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করলেই বুঝি আত্মীয়স্বজনরা খুশী-হবে। কিন্তু পরধর্মে হস্তক্ষেপ করায় তারা তো খুশী হলই না বরং এই অমানুষিক বলপ্রয়োগের জন্যেই তার সর্বনাশ হল।

অউরঙ্গজেবের এই নিষ্ঠুর আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক এসে গেল। যাদের সামর্থ্য ছিল তারা তার রাজ্য ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে ধর্মরক্ষা করল। আর যারা পালাতে পারল না তাদের অনেকেই আত্মহত্যা করে পরধর্ম গ্রহণের পাপ থেকে নিজেকে বাঁচাল। রাজ্যের সর্বত্রই হাহাকার, শোক, মর্মভেদী আর্তনাদ। ভয়ঙ্কর অরাজকতায় ছেয়ে গেল দেশ। চুরি ডাকাতি, লুঠতরাজের ফলে স্বল্পকালের মধ্যেই প্রায় শ্মশান হয়ে গেল রাজ্য। সম্রাটের রাজকোষে আর তেমন অর্থ জমা পড়ে না। দেশে প্রজারা বিদ্রোহী। তেমন কর আদায় হয় না। যাও বা হল, যাদের ওপর আদায়ের ভার ছিল তারা আত্মসাৎ করতে থাকল। শেষে রাজভাণ্ডার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ল।

অর্থের অনটন দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল বাদশাহ। হিন্দুদের ওপর নতুন কর বসানো হল। জিজিয়া, মুণ্ডুকর। দারুণ দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে লাগল হিন্দুরা। কিন্তু পাষণ্ড অউরঙ্গজেবের হৃদয়ে একটুও রেখা-পাত করল না তা। এত করেও কিন্তু কারো কোন সহযোগিতা পায় নি সে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটাতে হয়েছে তাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এক-জন হিতৈষীও পাশে এসে দাঁড়ায় নি তার। সারা জীবনব্যাপী বিবেকের দংশনে ছটফট করেছে। তবু নিজেকে সহজ পথে ফেরাতে পারেনি। এক পাপকে চাপা দেবার জন্যে আরও অনেক পাপ করতে হয়েছে তাকে।

পাপে পাপে জীর্ণ হয়েছে পপীষ্ঠর সমস্ত আত্মা। তাই সে মৃত্যুর কিছু-দিন আগে তার পুত্র আজিম এবং কমবকস্‌কে দুখানি পত্র লিখে নিজেকে তাদের সামনে খানিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল। চিঠি দুখানা পড়লে পাষাণের চোখেও জল আসে।

'বৎস আশীর্বাদ করি, সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকো। আমার মন সবসময়ই তোমার কাছে পড়ে আছে। আমার দেহে বার্দ্ধক্য এসেছে, জরা আক্রমণ করেছে। দুর্বল, শক্তিহীন হয়ে পড়ছি দিনে দিনে। দেহের যন্ত্র প্রায় বিকল হয়ে আসছে। এক অপরিচিতের মত আমি এই পৃথিবীতে এসেছি-লাম, আবার এক অপরিচিতের মতই একা আমি বিদায় নেব। কে আমি, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব কিছুই জানিনে। অসার বলগর্বে গর্বিত হয়ে বৃথাই সময় ক্ষয় করেছি। জীবন অনিত্য। আমি এ সংসারে সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে আসি নি, কিছুই নিয়ে যেতে পারব না সঙ্গে করে। তবে এ কি করলাম সারা জীবন ধরে। এখন শুধু মুক্তির কথা ভেবে যন্ত্রণায় জ্বলে মরছি। যে পাপ করেছি আমি, তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। এক মাত্র ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আমার কোন গতি নেই। আজ আর অনু-শোচনা করে কোন লাভ হবে না। তাই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছি। কমবক্স বিজাপুরের দিকে চলে গেছে, শাহআলম বহুদূরে থাকে, পৌত্র আজীম হোসেনও নাই! একমাত্র তুমিই আমার কিছুটা কাছাকাছি আছ। প্রাণাধিক পৌত্র বিদর বক্সকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। এখানেই শেষ করছি। শেষ বিদায়!'

চিঠিখানি লেখা হয়েছিল শাহ আজিমকে। আর একখানি পত্রে আরও কিছু তার হৃদয়ের ছবি ধরা আছে।

প্রাণাধিক পুত্র, এক সময়ে আমি তোমাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কোন পরামর্শ কখনও মেনে চল নি। এখন আমি এক অপরিচিতের মত এ সংসার থেকে বিদায় নিচ্ছি। নিজের হীনমন্যতা চিন্তা করে নিজেই আমি আজ দিশাহারা। তুমি কি আমাকে বলতে পার, সারা জীবন ধরে আমি যে পাপাচার করে এলাম এতে আমার কি লাভ হল?

সব মানুষই অসম্পূর্ণ। আমি এখন সংসার-সমুদ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু তা থেকে কি আহোরণ করলাম আমি? কালকূট। অপূর্ণতা আর পাপের ফল। ঈশ্বরের লীলা কি বিচিত্র। অপরিচিতের মত একাই এসেছিলাম, আবার অপরিচিতের মত একাই চলে যাচ্ছি। মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করেছি, কিন্তু পথ দেখাবার মানুষ কোথায়? এখন যেদিকে তাকাই শুধু ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করি। আমি নিজের কথা কিছুই জানিনে, যাদের রেখে যাচ্ছি তাদের কথা ভেবে আমি আকুল হচ্ছি। এখন আমার জ্বর নেই, তবে দেহ অবশ হয়েছে, পায়ে চলার শক্তি নেই, মেরুদণ্ড কুঁজো হয়ে পড়েছে। সারাজীবনে যে পাপ আমি করেছি তার পরিমাপ করা দুরূহ। সে পাপের পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর তা কল্পনাও করতে পারছিনে আমি। ধার্মিকের প্রতি, পুত্রের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে যত্ন করতে হয়, আমার দুর্ভাগ্য, তা আমি করতে পারিনি। বৎস, শোন আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, জীবনে কখনও ধার্মিকের অবমাননা বা তার প্রাণ-সংহার করো না। ধার্মিকের প্রাণ বধ করলে সে-পাপ আমার ঘাড়ে এসে চাপবে। আমি এখন মহা-প্রয়াণের আয়োজন করছি। তোমাকে, তোমার মাকে, তোমার পুত্রকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। পাপ পুণ্য যা কিছু করেছি তা সবই তোমাদের জন্যে করেছি। তোমার ওপর যে-সব অন্যায় ব্যবহার করেছি তা ভুলে যাও। বারবার তোমার কাছে আমার অনুরোধ, সব ভুলে যাও। না হলে পরলোকে গিয়ে আমাকে তার জবাবদিহি করতে হবে। নিজ আত্মার দেহত্যাগ কি কেউ প্রত্যক্ষ করেছে? আমি তা করছি। ভৃত্য, অনুচর, পারিষদ যতই প্রবঞ্চক হোক, তাদের ওপর অসদ্ব্যবহার করো না কখনও। ভদ্র ব্যবহারে এবং সুকৌশলে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করবে। আমার উপদেশগুলো মনে রেখো। আমি চললাম।'

আগেও বলা হয়েছে, শিশোদীয় কুলের কেউ রাজসিংহাসনে বসলে টীকাডোর প্রথার অনুষ্ঠান করা হত। নানা কাবণে কিছুকাল এপ্রথা স্থগিত ছিল। রাজসিংহের রাজ্য অভিষেকের সময় আবার চালু হল

প্রথাটি। এই টীকাডের প্রথার অনুষ্ঠান করতে আজমীরের কাছে মালপুর নগর আক্রমণ করল সে। নগর লুঠপাঠ করে ধনরত্নাদি এনে তুলল উদয় পুরে। সংবাদ সম্রাটের কানে গেল। রাজবয়স্যরা নানা রঙ চড়িয়ে বাদশাহর কাণে তুলে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল। শাজাহান সব শুনে মৃদু হেসে বললে, আমার ভ্রাতা রাজসিংহ বালক, দুষ্টুমী করে একটা কাজ করে ফেলেছে, তাই বলে কি তাকে আমি মারবো ?

সবারই মুখ চূণ।

যেসব গুণ থাকলে একজন রাজপুত রাজাকে আদর্শ বলা হয় তার সব কিছুই ছিল রাণা রাজসিংহর মধ্যে। তার মত মহাবীর তেজস্বী রাজা তখন-কার দিনে সারা রাজস্থানে ছিল না। ছোট বেলা থেকেই অউরঙ্গজেবকে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখত সে। যেদিন সে দিল্লীর সিংহাসনে চেপে বসল সেদিন থেকে তার ক্রোধের জ্বালা আরও হাজার গুণে বেড়ে গেল। শঠ অউরঙ্গজেবের কবল থেকে মিবারকে উদ্ধারের উপায় ভাবতে লাগল।

মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে রূপনগর নামে একটি নগর আছে। মারবারের রাঠোর বংশের এক শাখার কিছু রাজকুমাররা নিজের রাজ্য ছেড়ে সেখানে গিয়ে এক উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। মোগলের অধীনে তারা সামান্য সামন্ত রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। অউরঙ্গজেব যখন দিল্লীর বাদ-শাহ তখন রূপনগরের সামন্ত রাজাদের এক পরমা-সুন্দরী যুবতী কন্যার সংবাদ দিল্লীতে এসে পোঁছয়। সেই অলোকসামান্য নবযোবনউদ্ভিন্না রূপ-লাবণ্যবতীর নাম প্রভাবতী। দুরাচার অউরঙ্গজেব প্রভাবতীর জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল। কিন্তু কি উপায়ে কার্যসিদ্ধি হতে পারে! বদমাইশ বাদশাহ ঠিক করল, বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে হবে। তা-ছাড়া তাকে পাওয়া সম্ভব না। নিজের অহঙ্কারে ডুবে সে ভেবেছিল, দিল্লীর বাদশাহ বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে একেবারে গলে যাবে তারা। দুহাজার সৈন্য-সহ রাজদূত এল রূপনগরে। প্রভাবতীর পিতার কাছে সম্রাটের প্রস্তাব পেশ করল তারা। ভয়ে শিউরে উঠল সামন্তরাজা। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কিভাবে এ দারুণ সংকট থেকে উদ্ধার পাবে সে, কোন কিনারা করতে

পারল না। পিতার অসহায় অবস্থা দেখে নিজেই নিজের মুক্তির উপায় চিন্তা করতে বসল প্রভাবতী। এই বিপদের মুহূর্তে কে এসে পাশে দাঁড়াবে তাদের। রাজবারার প্রায় সব রাজাই তো মোগলের দাস। কে বাদশাহকে চটাতে চাইবে। সুতরাং কারো কাছে সাহায্য চাওয়া বৃথা। তবে কি কোন পথ নেই। পথ অনেক আছে। শানিত ছুরিকা, প্রজ্বলিত চিতা, কালকূট, উদ্বন্ধন। এসব তো হাতের কাছেই আছে। এর জন্যে কারো অনুগ্রহ বা বদান্যতার প্রয়োজন হবে না। প্রভাবতী ভাবল, এরই একটি উপায় সে বেছে নেবে। এমন সময় কেন যেন তার মনে হল, মিবারের রাণা রাজসিংহ তাকে উদ্ধার করতে পারে।

রাজসিংহকে এক পত্র লিখল প্রভাবতী। 'যদি আপনি এই মহাসঙ্কটের মধ্যে থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারেন তবে আমি জনমে মরণে আপনারই হবো। রাজপুত কুলের কুমারী কি ম্লেচ্ছর উপভোগ্য হবে? পদ্মিনী কি মুণ্ডকের ঘর করবে? রাজহংসী কি ভেকের সহচরী হতে পারে? ঐ জানোয়ার মুসলমানটার হাত থেকে আপনি যদি আমাকে রক্ষা না করেন, মিবারের রাণা হয়ে যদি বংশের মর্যাদা লঙ্ঘণ করেন তবে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আত্মহত্যা করেই আমি এ বিপদ থেকে মিজের কুলধর্ম, সতীত্বকে বাঁচাব।'

চিঠিখানা পড়ে রাজসিংহর রক্ত টগবগ করে উঠল। অউরঙ্গজেবের ওপর এতদিনের ক্রোধে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। দিল্লীর বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল রাজসিংহ। রণবীর সর্দার ও সৈন্যরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে রূপনগরের দিকে ছুটে চলল। আরাবল্লী পাহাড়ের নিচে এই রূপনগর। হিন্দু মুসলমানে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। বাপ্পার বংশধর রাজসিংহব সামনে টিকতে পারে তেমন যোদ্ধা মোগল সৈন্য-দলে কোথায়। মোগলের অসংখ্য সৈন্য দলিত মথিত ও সংহার করে জয়ডঙ্কা বাজাল রাজসিংহর সৈন্যরা। রাণার এই অদ্ভুত সাহস এবং বীরত্ব দেখে সবাই সাধু সাধু করতে লাগল। বাদশাহ অউরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে এই প্রথম যুদ্ধ ঘোষণা।

প্রভাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এল রাজসিংহ। সে-দিন মিবারের প্রতিটি গৃহ আলোর মালায় সাজানো হয়েছিল। আনন্দে গানে মুখর হয়ে উঠেছিল দেশের প্রতিটি লোক।

এই সময় জয়পুরের রাজা জয়সিংহ এবং মারবারের রাজা যশোবন্তসিংহ এই দুই বীর বাদশাহর বেতন-ভোগী ছিল। এরা বাদশাহর বশ্যতা স্বীকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু নিজেদের আর্যধর্মে জলাঞ্জলি দেয়নি কেউ। এই দুই তেজস্বী বীর-পুরুষকে হাতের খেলার পুতুল বানিয়ে রাখবে, এমন সাধ ছিল অউরঙ্গজেবের। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি। শুধু এই দুই রাজপুত বীরের তেজস্বীতার কল্যাণেই আরও অনেক পৈশাচিক কাণ্ড থেকে নিরস্ত হতে বাধ্য হয়েছিল অউরঙ্গজেব। স্বৈরাচারে পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এরা, সম্রাট আর সহ্য করতে পারছিল না। অন্য কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে শেষে ঠিক করল, গুপ্তভাবে হত্যা করে পথের কাটা সরাবে সে। এই জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে যখন তার মাথায়, মহারাজা যশবন্ত সিংহ তখন কাবুলে আর অম্বর রাজা জয়সিংহ দাক্ষিণ্যাত্যের শাসনভার নিয়ে বাস করছিল। দুজয়াগাতে গুপ্তচর পাঠানো হল। গোপনে বিষ খাইয়ে এই দুই যোদ্ধাকে হত্যা করল অউরঙ্গজেব। এরা সম্রাটের বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট করেনি কোন দিন। অউরঙ্গজেব নানা সময়ে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছে এদের দিয়ে। তারই উপযুক্ত পুরস্কার দিল পাষণ্ড মুসলমান বাদশাহ।

সম্রাটের ধারণা ছিল, জয়সিংহ এবং যশোবন্তকে সরাতে পারলেই পথের সব কাঁটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তা ভুল। রাজা রাজসিংহর অমিত-বিক্রমের সামনে বিরাট মোগল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করেই সে ক্ষান্ত হল না, তার শিশুপুত্রকেও বন্দী করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। কিন্তু যশোবন্ত সিংহর বিধবা মহিষী বাদশাহর এই দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে পেরে জ্যেষ্ঠপুত্র অজিতকে নিয়ে মিবারের রাণা রাজসিংহর আশ্রয়ে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করল। আড়াই শো রাজপুত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে মিবারে যাত্রা করল রাজকুমার অজিত। যখন তারা আরাবল্লীর দুর্গম পাহাড়ী পথ দিয়ে চলেছে তখন পাঁচ হাজার মোগল সৈন্য আক্রমণ করে

অজিতকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মাত্র আড়াই শো রাজপুত যোদ্ধার সামনে পাঁচহাজার মোগল সৈন্য নির্মমভাবে দলিত মথিত হয়ে গেল। কৈলাবার এক রাজপ্রাসাদে পরম আদর যত্নের মধ্যে লালিত হতে লাগল অজিত।

অজিতের জননীর চেষ্টায় মিবার, মারবার ও অম্বরের মধ্যে এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামী-হত্যাকারী অউরঙ্গজেবকে কিভাবে সমুচিত শাস্তি দেওয়া যায়, এই তার একমাত্র চিন্তা। কিন্তু মারবার মহিষীর এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। আবার শিশোদীয়, রাঠোর ও কুশাবহদের মধ্যে কলহবিবাদ দানা বেঁধে উঠল। এদের এই একতা যদি শ'খানেক বছরও স্থায়ী হত তাহলে ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতি হয়ে যেত সন্দেহ নেই।

অউরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর বসাল। এসংবাদ শোনামাত্র রাজসিংহ দারুণ প্রতিবাদ করে এক পত্র পাঠাল দিল্লীতে। একে প্রভাবতীকে মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তার ওপর রাজ-আজ্ঞার অবমাননা, অউরঙ্গজেব ক্রোধে ফেটে পড়ল।

—'এত বড় স্পর্ধা, এক সামান্য জায়গীরদারের। জড়ো কর আমার সব সৈন্য, আমি মিবার ছারখার করে দেব।'

সে সময় বাদশাহপুত্র আকবর বাঙ্গলায় এবং আজম কাবুলে বাস করছিল। পিতার আদেশে তারাও সৈন্যসামন্ত নিয়ে জড়ো হল দিল্লীতে। জ্যেষ্ঠপুত্র মৌজাম তখন মহারাষ্ট্রে বিদ্রোহ দমন করছিল, তাকেও সব বন্ধ রেখে দিল্লীতে আসতে বলা হল। এইভাবে বিরাট মোগলবাহিনী সাজিয়ে মিবার অভিযানে চলল অউরঙ্গজেব। রাণার সেনাবল নেহাতই নগন্য, তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না রাজসিংহ, দুর্গম পাহাড়ের এক নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হল শিশোদীয়দের। মোগল সৈন্যরা সহজেই চিতোর, মণ্ডলগড়, জীরন, মন্দীসন ও আরও কতকগুলো দুর্গ অধিকার করে ফেলল। এরপর রাজসিংহকে আক্রমণ করার জন্যে আরাবল্লীর দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে গিয়ে হানা দিল মোগল সৈন্য। মিবারের পশ্চিমদিকে বনের মধ্যে পলিন্দ ও পলিপত

আদিবাসীদের বাস। তারাও হিন্দুরাজাদের মান সম্ভ্রম এবং রাজকন্যাদের সতীত্ব রক্ষার জন্যে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাণা রাজসিংহ তার সৈন্যদের তিনটি ভাগে বিভক্ত করল। জেষ্ঠ-রাজপুত্র জয়সিংহ একটি দল নিয়ে আরাবল্লীর সানুদেশে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সুন্দরভাবে সৈন্য সাজালো সে যাতে দুদিক থেকেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। গুর্জর ও তার আশে পাশের দেশগুলোর ভীলদের সঙ্গে সম্বন্ধ অব্যাহত রাখার জন্যে অন্য পুত্র ভীমসিংহকে পাহাড়ের পশ্চিমদিকে নিযুক্ত করা হল। এবং প্রধান সেনাদল নিয়ে রাণা রাজসিংহ নৈনাক নামে এক গিরি পথে অপেক্ষা করতে লাগল। শক্তাবৎ-সর্দার গরীবদাসের কৌশল অনুসারে এইভাবে সৈন্যদল সাজানো হয়েছিল।

দোলারী নামে ভীল অধ্যুষিত এক জায়গায় শিবির গেড়ে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে উদয়পুরের দিকে পাঠানো হল আকবরকে। বিনা বাধায় সে রাজধানী দখল করল। একটিমাত্র প্রাণীও সেখানে ছিল না সেদিন। তখনকার সমস্ত অধিবাসীরাই যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে এখবর আগেই জানা ছিল আকবরের। উদয়পুরে উপস্থিত হয়ে বিলাস-ব্যাসনের মধ্যে নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে লাগল আকবর। তার সৈন্য সামন্তরাও হৈহল্লায় মেতে উঠল দিনে দিনে। এমন সময় রাণার পুত্র জয়সিংহ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করল আকবরকে। এই হঠাৎ-আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিরাট মোগল বাহিনী। সামান্য কিছু রাজপুত সৈন্যর সামনে পঞ্চাশ হাজার মুসলমান সৈন্য টিকতে পারল না। রাজপুতের তরবারির আঘাতে বেশীর ভাগই প্রাণ হারাল। বাকিগুলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। এদিকে পিতার সাহায্য পাওয়ার আশায় দৈশূরির দিকে এগোতে লাগল আকবর। কিন্তু তাতে বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। সেই গিরিপথ রোধ করে ছিল রাণার এক দল সৈন্য। আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই দেখে তখন সে গোগুণ্ডার মধ্যে দিয়ে মারবারের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বেরুবার চেষ্টা করল। কিন্তু এ পথে এসে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনল আকবর। ভীল সৈন্যরা রোধ করে ছিল সে পথ।

চারদিকেই রাজপুত সৈন্য। পালাবার কোন পথ নেই। কয়েকটি দিন কেটে গেল। সঙ্গে যা রসদ ছিল তা শেষ। এখন না খেতে পেয়ে মরতে হবে সকলকে। নিরুপায় হয়ে জয়সিংহর করুণা প্রার্থী হল আকবর। আকবরের দুর্দশা দেখে, তার সকাতর প্রার্থনা শুনে বাপ্পার বংশধরের মন গলে গেল। তখুনি সে আকবরকে পথ ছেড়ে দিয়ে নির্বিঘ্নে চিতোরে ফিরে যেতে দিয়েছিল।

এদিকে আরএক দল সৈন্য নিয়ে দেলহির খাঁ এগিয়ে আসছিল দৈশূরী দুর্গের মধ্যে দিয়ে। অনেকে মনে করে, আকবরকে উদ্ধার করার জন্যেই সে এগিয়ে আসছিল। পাহাড়ী অঞ্চলে ঢোকার মুখে কেউই তাকে বাধা দিল না, কিন্তু যেমনি সে দুর্গম পাহাড়ী পথ ধরে ভিতরে ঢুকে পড়েছে অমনি রূপনগরের শোলাঙ্কিরাজা এবং গনোরনগরের অধিপতি গোপীনাথ রাঠোর আক্রমণ করল তাকে। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হতভাগ্য দেলহির খাঁর সৈন্যরা নিহত হল।

যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্যে বাদশাহ অউরঙ্গজেব দোবারি গ্রামে অপেক্ষা করছিল। অলীক সুখ-স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়েছিল সে, এমন সময় রাণা রাজসিংহ তাকে আক্রমণ করল। তার বীরত্বের সামনে মোগলের অসংখ্য সৈন্যরা খড়কুটোর মত ভেসে গেল। রাঠোর যোদ্ধা দুর্গাদাস মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে পৈশাচিক ভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে অউরঙ্গজেবের সব সৈন্যবাধা নির্মম অসির আঘাতে খানখান করে দিয়ে বাদশাহর অনুসন্ধানে ছুটে বেড়াতে লাগল। এদিকে নিরুপায় হয়ে মোগলের শেষ অস্ত্র কামান চালাতে লাগল গোলন্দাজরা। আগুনের হলকা ছিটকে বেরুতে লাগল কামানের মুখ থেকে। আকাশ বাতাস ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু রাজপুত যোদ্ধারা বেপরোয়াভাবে মোগল সৈন্যদের কচুকাটা করতে করতে কামানগুলো অধিকার করে ফেলল। পাপীষ্ঠ বাদশাহ তখন, ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অন্যকোন উপায় না দেখে সে যে-কজন সৈন্য তখনও জীবিত ছিল তাদের সঙ্গে নিয়ে চিতোরের দিকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচল। মোগলদের অসংখ্য হাতী, অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য নানারকম

যুদ্ধসামগ্রী রাজপুতদের হস্তগত হল। ১৬৮০ সালের ১লা জানুয়ারীতে এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে রাজাসিংহর কাছে ভারত-সম্রাট অউরঙ্গজেবের শোচনীয় পরাজয় হল।

পরাজিত ও অবমানিত হয়েও বাদশাহ কিন্তু দমল না। চিতোরে প্রধান ঘাঁটি গেড়ে আবার যুদ্ধের আয়োজন চলতে লাগল। এবার মহারাষ্ট্রে শিবাজীর বিদ্রোহ দমন বন্ধ করে সুলতান মৌজামকে চিতোরে আসতে বলা হল। কিন্তু বাদশাহর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জয়মল্লর বংশধর সুবলদাস একদল রাজপুত নিয়ে চিতোর ও আজমীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল। মোগল-সেনা দেখা-মাত্র তারা আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে থাকল। এ সব দেখে ভয় পেয়ে গেল বাদশাহ অউরঙ্গজেব। শেষে নিজের জীবনও বুঝি যায়, আর কোন উপায় না দেখে আজমীরের দিকে পালাতে লাগল বাদশাহ। পালাবার সময় আজিম এবং আকবরের হাতে যুদ্ধের দায়িত্ব দিয়ে গেল সে। যতক্ষণ না অন্য মোগল বাহিনী এসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় ততক্ষণ কি নীতিতে যুদ্ধ চালাতে হবে তাও বলে দিয়ে গেল।

যে উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধর আগুন জ্বালিয়েছিল বাদশাহ তা সফল হল না। দারুণ দুশ্চিন্তায়, ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। বারবার পরাজিত, অবমানিত হয়েও সে ক্ষান্ত হতে পারল না। আজমীরে এসে আবার বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পুত্রদের সাহায্যে পাঠিয়ে দিল। রাঠোর বীর সুবলদাসকে দমন করার জন্যে রোহিলা খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান হল। কিন্তু সুবলদাসের বীরত্বের সামনে মোগল সৈন্য বাহিনী পিঁপড়ের মত মরতে লাগল। যারা প্রাণে বাঁচতে চাইল তারা আজমীরের দিকে পালিয়ে গেল।

রাণা রাজসিংহ তার পুত্র ও অন্যান্য বীরপুরুষদের সঙ্গে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ফিরে এল যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে। এদিকে রাজকুমার ভীমসিংহর রণ-পিপাসার নিবৃত্তি না হওয়াতে সসৈন্য গুর্জর আক্রমণ করল। অনায়াসেই ইদর জয় করে সেখানকার নবাব হুসেনকে তাড়িয়ে দিল। বীর নগরের

মধ্যে দিয়ে চাওন নগরে গিয়ে উপস্থিত হল সে। পত্তন সে-দেশের রাজধানী। পত্তন লুঠ করল। এইভাবে সিদপুর, মৌরসা ও অন্যান্য আরও কয়েকটি নগর অধিকার করল। তার অমানুষিক অত্যাচারে ভীত হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা যে যেদিকে পারল পালাতে থাকল। ওদেশের প্রজাদের এই দুর্দশার কথা শুনে রাজসিংহ ব্যথিত হল। পুত্র ভীমসিংহকে তখনি ফিরে আসতে আদেশ করল সে।

দয়ালসা নামে রাণা রাজসিংহর এক বিচক্ষণ দেওয়ান ছিল। তার অসাধারণ কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাণা। মোগল সম্রাটের ওপর জাতক্রোধ ছিল দয়ালসার। কি ভাবে পাপীষ্ঠকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া যায় এই চিন্তাই সে করেছে এতকাল। এই উপযুক্ত সময়। রাণার আদেশে একদল অশ্বারোহী নিয়ে মোগল অধিকৃত মালব-রাজ্য লুঠপাঠ করতে লাগল। তার বাহুবলের কাছে কোন মোগল সৈন্যই এগোতে পারল না। ক্রমে ক্রমে সারস্থপুর, দেবাস,সারঞ্জ, মান্দু, উজ্জীন ও চান্দেরী প্রদেশও অধিকার করে বসল সে। এই সমস্ত নগরে যেসব মোগল সৈন্য ছিল তাদের প্রায় সকলকেই সংহার করল সে। দয়ালসার ভয়ঙ্কর অত্যাচারে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। রাজপুতরা কখনও কারো ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করে নি। কিন্তু দয়ালসা এ বিধি মানল না। মুসল-মানদের ধরে ধরে দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে দিতে লাগল এবং পুড়িয়ে ফেলতে লাগল ওদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ। দয়ালসার নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে একজন মুসলমানও রেহাই পায়নি সেদিন। মালব-রাজ্য পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল সে। একটিমাত্র জনপ্রাণীও আর সেখানে ছিল না। এই সব রাজ্য লুঠ করে যে সব ধনরত্ন পাওয়া গেল প্রভুভক্ত দয়ালসা তার সবটাই মিবাররাজের ধনভাণ্ডারে ঢেলে দিয়েছিল।

জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে জয়সিংহর সঙ্গে মিলিত হয়ে দয়ালসা বাদশাহ পুত্র আজিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করল। মাক্ষম ও গঙ্গা শক্তাবৎ, শালুম্ব্রাপুত্র চন্দাবৎ, সদ্রিপতি ঝালা চন্দ্রসেন, বৈদলার চৌহান সুবল সিংহ, বিহোল্লীর পুয়ার বেরিশাল ও খীচি বীররা এসে যোগদিল দয়ালসার

সঙ্গে। রাজপুতদের তেজে ছারখার হয়ে গেল বিরাট মোগল বাহিনী। হাজারে হাজারে নিহত হল, হাজারে হাজারে পদদলিত হল এবং হাজারে হাজারে উর্ধশ্বাসে পালাতে লাগল আজমীরের দিকে। সে এক ভীষণ দৃশ্য। বাদশাহপুত্র নিরুপায় হয়ে রিন্থন্‌বোর নগরে পালাল। রাজপুতরা পিছু ধাওয়া করল তার। অসংখ্য মোগল সৈন্য হত্যা করতে করতে তাদের তাড়া করে নিয়ে চলল রাজপুত যোদ্ধারা। রাণা রাজসিংহ বিজয় পতাকা উড়াল। কিন্তু তবু তার মনে শান্তি নেই। ভারতের মাটি থেকে মুসলমানের শিকড়টুকু পর্যন্ত সে উপড়ে ফেলতে চায়। কিছুদিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করল সে। কিন্তু নাবালক রাজপুত্র অজিতসিংহর স্বার্থরক্ষার জন্যে আবার তাকে যুদ্ধে নামতে হল। রাজা যশোবন্তসিংহকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর কুমার অজিতকেও বন্দী করার ষড়যন্ত্র করেছিল অউরঙ্গজেব। তার সে-আশা, ষড়যন্ত্র বানচাল করে, অজিতকে মিবারের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে বিধবা অজিত-জননী রাজ্যশাসন করতে লাগল। যে দক্ষতা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সে দিয়েছে তা একবাক্যে প্রশংসার। কত কতবার কত বিপদ এসেছে কিন্তু অজিত-জননী অদ্ভুত কৌশলে সে-সব বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। বাপ্পা বংশে তার জন্ম, বীরঙ্গনা সে। তার মত গুণবতী কন্যা সে-সময়ে রাজবারায় আর দ্বিতীয় ছিল না।
এবার দারুণ সঙ্কটে পড়ল সে। অউরঙ্গজেব যে ধরনের অত্যাচার শুরু করবে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সাধ্য ছিল না তার। তাই সে সাহায্য চাইল রাজসিংহর। মিবার ও মারবারের সৈন্য একত্রিত করে গাধবারের গানোর নামে এক জায়গায় মোগলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেধে গেল দু'দলে। রাজপুত যোদ্ধাদের বীরত্ব বহ্নিতে অসহায় কীটপতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হতে লাগল মুসলমানরা। মোগল সেনাকটক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রাণভয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগল তারা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মোগল সৈন্য পরাজিত হল।

বিপুল সহায়, অর্থ ও বল থাকা সত্বেও বারবার নিদারুণভাবে পরাজিত হতে লাগল অউরঙ্গজেব। রাজস্থানের সব রাজা মিলে ঠিক করল,

অউরঙ্গজেবকে সিংহাসনচ্যুত করে তার পুত্র আকবরকে সম্রাট করবে। আকবরকে খবর পাঠানো হল। বৃদ্ধ পিতা শাজাহানকে সিংহাসন চ্যুত করে যে জঘন্য উদাহরণ তৈরি করেছিল আকবরকে দিয়ে তারই পুনরাভিনয় করাতে হবে। রাজ্যলোভ বড় সাংঘাতিক। রাজপুতদের প্রস্তাবে রাজি হল আকবর। এবং এই শুভ কাজ যাতে খুব তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে তাগাদা করতে লাগল।

রাজপুতরা আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। অভিষেকের দিনও ঠিক হয়ে গেল। গোপনে গোপনে সব আয়োজনই প্রস্তুত। কিন্তু নিজের অসাবধানতার জন্যে সম্রাটপুত্র অভীষ্ট সফল করতে পারল না। এত চেষ্টা এত যত্ন সব ব্যর্থ হয়ে গেল। বিশ্বাস ঘাতক গণৎকার অভিষেকের শুভদিন ঠিক করে দিয়েছিল। অউরঙ্গজেবের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত ফাঁস করে দিল সে। সব শুনে গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল বাদশাহ। ভেবে দেখল, কিছু দেহরক্ষী ছাড়া তার আর সহায় নেই কেউ, মৌজাম ও আজীম অনেক দূরে থাকে। এদিকে আকবর এসে হাজির হল ব'লে। আজমীর থেকে দিল্লীর মাঝখানে আর মাত্র এক দিনের পথ। এমন কোন মোগল বীর তার পাশে নেই যে এ সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারে তাকে।

বহুক্ষণ কূটচিন্তার পর একটা কৌশল বের করল সে। আকবরের নামে একখানা চিঠি লিখল, রাজপুত নায়ক দুর্গাদাসের তাঁবুর মধ্যে ছুড়ে দিয়ে এল তার এক বিশ্বাসী গুপ্তচর। চিঠিখানায় লেখা ছিল ঃ

'বৎস তোমার সুকৌশলের বিষয় অবগত হয়ে আমি পরম প্রীত হলাম। কিন্তু খুব সাবধান, একজন রাজপুতও যেন ঘুর্ণাক্ষরে জানতে না পারে আমাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা। আমি রাজপুতদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তাদের আক্রমণ করবে।'

লুনার নদীর ধারে দ্রুনার নামে এক অঞ্চল। দুর্গাদাস সেখানকার শাসনকর্ত্তা ছিল। অউরঙ্গজেবের শকুনি-দৃষ্টির হাত থেকে দুর্গাদাসই নাবালক কুমার অজিতকে উদ্ধার করে রক্ষা করেছিল। ঔরঙ্গজেবের গুপ্তচর দুর্গা-দাসের তাবুর মধ্যে চিঠিখানা ফেলে গিয়েছিল। চিঠিখানা পড়ে বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে গেল সে। শাহজাদা আকবরের ওপর সন্দেহ এবং ঘৃণা হল। কৃতঘ্ন কেউটে মুসলমানকে অভিশাপ দিতে দিতে দল-বল নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল দুর্গাদাস।

হঠাৎ রাজপুতদের এই মতিগতি পালটানোর কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে আকবরও অবাক হয়ে গেল। টাইবার খাঁও কিছু অনুমান করতে পারল না। তার বড় সাধ ছিল, আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে সে তার প্রধান-সেনাপতি হয়ে থাকবে। কিন্তু সবই শূন্যে মিলিয়ে গেল। অন্য কোন উপায় না দেখে সম্রাটকে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল সে। কিন্তু তাতেও সে সফল হতে পারল না। এই সূত্রে তাকেই ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হল। এই সময় মৌজাম ও আজিম এসে উপস্থিত হল, সাহস পেয়ে সম্রাট উত্তেজিত হয়ে উঠল। মৌজাম ও আজিমের ভয়ে আকবর গিয়ে আশ্রয় নিল রাজপুতদের কাছে। এতদিনে ধূর্ত অউরঙ্গজেবের চাল ধরা পড়ল রাজপুতদের কাছে। তারা বুঝতে পারল, আকবর নির্দোষ। আবার তারা আশ্রয় দিল তাকে। কিন্তু পিতার চরিত্র জানা ছিল আকবরের। কোন ভাবেই যে তাকে জীবিত থাকতে দেবে না সে, এ সত্য সে বুঝতে পেরেছিল। তাই রাজপুতদের আশ্রয়ও তার কাছে নিরাপদ মনে হল না। মিবার ও ডুঙ্গারপুরের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, নর্মদা পার হয়ে, পালবগড়ে উপস্থিত হয়ে মারাঠাবীর শম্ভুজীর কাছে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানেও সে থাকতে চাইল না। ইংলণ্ডগামী এক জাহাজে চড়ে পারস্যের দিকে পাড়ি দিল।

সম্রাট চিন্তা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। রাজপুতদের সঙ্গে সন্ধির চিন্তা করতে লাগল সে। কিন্তু সামনে বিরাট বাধা—পদমর্যাদা। দেলহির খাঁর অধীনে এক বিচক্ষণ রাজপুত সৈনিক ছিল। ভট্টকবিরা একে বিকানির রাজা শ্যামসিংহ বলে বর্ণনা করেছে। রাণা রাজসিংহর কাছে গিয়ে সে বললে, 'হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই বিরোধে কারুরই লাভ হচ্ছে না, শুধু দেহের রক্তে মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে। সম্রাটের খুব ইচ্ছে, একটা সন্ধি হোক, কিন্তু তিনি ভারতের অধিপতি, তার পক্ষে তো আগে থেকে এ প্রস্তাব করা

সম্ভব না। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনি প্রস্তাব পাঠালে সাদরে গৃহীত হবে।'

কোন দ্বিধা, কোন চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে রাণা বললে, 'ঠিক আছে তাই হবে, আমিই সন্ধির প্রস্তাব পাঠাবো।'

বদমাইশ অউরঙ্গজেবের চাল কিন্তু অন্য ছিল। টালবাহানা করতে করতে সময়কে টেনে নিয়ে চলল। এদিকে বর্ষা নামল। সুতরাং যুদ্ধ-বিগ্রহ সব বন্ধ রাখতে হল রাণাকে। রাণা একরকম ধরে নিয়েছে, সম্রাট সন্ধি করবে। আর সম্রাট তখন ভিতরে ভিতরে সমর আয়োজনে ব্যস্ত। বর্ষাও কেটে গেল। বাদশাহ একটা সন্ধির খসড়াও তৈরি করল। তাতে কিন্তু 'জিজিয়া' কর বসানো হবে না এমন কোন সর্ত ছিল না। শুধু ছিল, মিবারের সমস্ত অঞ্চল পাবে রাণা। সন্ধিপত্র লেখা হল বটে, কিন্তু সই সাবুদের আগেই রাণা রাজসিংহ ইহলোক ত্যাগ করল।

প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী অমরসিংহ, কর্ণ বা জগৎ সিংহ কেউই মিবারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু রাণা রাজসিংহ নিজের বাহুবলে সারা-জীবন ধরে মোগল বাদশাহ অউরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিবারের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। মহারাণা প্রতাপের যোগ্য বংশধর রাজসিংহ।

রাজধানী থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে আরাবল্লী পাহাড়ের দুমাইল দূরে রাজসমুন্দ হ্রদ। সেখান দিয়ে খরস্রোতা গোমতী পাহাড়ী নদী বয়ে যেত। এক বিশাল বাঁধ দিয়ে নদীর গতি অবরোধ করে এই হ্রদটি তৈরি করা হয়েছিল। রাণা নিজের নামানুসারে নাম রেখেছিল তার রাজসমুদ্র (রাজ সমুদ্র)। আগাগোড়া শ্বেত পাথরদিয়ে বাঁধানো এই বাধটির ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত এক সুরম্য সোপান। হ্রদের দক্ষিণ দিকে রাজনগর নামে এক দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। বাঁধের ওপরে শ্বেত পাথরের তৈরি এক কৃষ্ণ-মন্দির আজও দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের দেওয়ালে নানা রঙের ছবিতে ভরা। কোথাও বা রাণার ধারাবাহিক বংশ-বিবরণ। প্রায় ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল এই হ্রদটি তৈরি করতে। সেকালের

সামন্ত রাজারাও এর আংশিক ব্যয়ভার বহন করেছিল।

মিবার রত্নগর্ভা। রাজস্থানের এই অমরাবতীতে কখনও অনটন হয়নি, কিন্তু দুর্ভাগ্য, রাজসিংহর রাজত্বকালে, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, মিবারে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী হয়েছিল। সে শোকাবহ ঘটনা বহুকাল আতঙ্ক হয়েছিল মিবারবাসীদের কাছে।

আষাঢ় মাস শেষ হয়ে গেল, আকাশে একটুকরো মেঘ নেই, এক ফোঁটা বৃষ্টি নামল না। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দিল রাণা। কিন্তু কোনই ফল হল না। শ্রাবণ-ভাদ্রও চলে গেল, তবু বৃষ্টি নামল না। হাহাকার পড়ে গেল চারদিকে। একমুঠো অন্নের জন্যে ছুটে বেড়াতে লাগল মানুষ। গাছের পাতা, লতা গুল্ম যা পেল তাই খেতে শুরু করল খিদের জ্বালায়। পিতামাতা সন্তানকে, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করে প্রাণের আশায় পালতে শুরু করল। স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্ত্রী পুত্র বিক্রী করতে লাগল লোকে। ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের দারুণ বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। এর ওপর আবার পশ্চিমদিক থেকে আগুনের হলকার মত এক বাতাসের ঝড় বইতে শুরু করল। সেই বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শে সব পুড়ে খাক হয়ে গেল। সমস্ত জনপদ জনশূন্য শ্মশান হয়ে গেল। আর ঠিক এই সময়েই মোগল কুলাঙ্গার অউরঙ্গজেব যুদ্ধের দামামা বাজাতে শুরু করে দিয়েছিল।

১২

১৬৮১ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহর দ্বিতীয় পুত্র জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে বসল। জয়সিংহর জন্মের সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল, তা থেকে রাজপুত জাতের আচার আচরণ সম্পর্কে খানিকটা জানতে পারা যায়! রাণা রাজসিংহর দুই মহিষী। তার মধ্যে একজনের ওপরই তার অনুরাগ বেশী। তার গর্ভেই জয়সিংহর জন্ম। জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ আগে অন্য

মহিষীও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল। তার নাম রাখা হয় ভীম। রাজপুতদের প্রথা আছে, নবকুমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই অমরধব নামে এক প্রকার ঘাসের বালা পরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস, এই তৃণবলয় হাতে থাকলে শিশুর স্বাস্থ্য-হানীর কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজসিংহও পুত্রের হাতে অমরধব পরিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগল। কিন্তু রাণা, কি কারণে জানা যায় না, তৃণবলয় নিয়ে শুধু পুত্র জয়সিংহর হাতেই পরিয়ে দিল। অন্যপুত্র ভীমসিংহর বাহু শূন্য রইল। কেউ কেউ মনে করল, রাণা বুঝি ভুল করে ভীমের হাতে বলয় পরিয়ে দেয় নি।

দুই ভাই একই সঙ্গে হেসে খেলে বড় হতে লাগল। শৈশব কাটিয়ে তারুণ্যে পা দিয়েছে ওরা। রাণার মনে শুধু আশঙ্কা, কনিষ্ঠের ওপর তার বেশী অনুরাগ বুঝতে পেরে যদি পুত্র ভীম ব্যথিত হয়। ভীমকে কাছে ডাকল রাণা। নিজের তরবারি তার হাতে তুলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে রাণা রাজসিংহ, 'যদি ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের ইচ্ছা থকে, তবে এই নাও তরবারি, এই মুহূর্তে তোমার ভাইএর প্রাণ বধ করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেল।'

দারুণ আত্মদহনে উন্মত্ত হয়ে পিতা যে এই সিদ্ধান্ত করেছে সে কথা বুঝতে বুদ্ধিমান ভীমের এক মুহূর্তও সময় লাগল না। ভীম বললে, 'বাবা, আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না, এই সিংহাসন স্পর্শ করে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মিবারের সিংহাসনে ভবিষ্যতে জয়সিংহই বসবে। আমি আমার সমস্ত সত্ব জয়সিংহকে সমর্পণ করলাম। আপনার পা ছুঁয়ে আজ আমি বলে যাচ্ছি, যদি আপনার ঔরসেই আমার জন্ম হয়ে থাকে তবে আর এই দেবারি পাহাড়ী অঞ্চলে এক বিন্দু জলও স্পর্শ করব না।'

তখনি নিজের সৈন্য সামন্ত নিয়ে ভীমসিংহ উদয়পুর ছেড়ে চলে গেল। গ্রীষ্মকাল। দারুণ দ্বিপ্রহর। খাঁ খাঁ করছে রোদ। দুর্গম গিরিপথ বেয়ে চলেছে ভীমসিংহ। সঙ্গে তার অনুরক্ত কিছু সৈন্য সামন্ত। পিপাসায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়ল তারা। আর বেশি দূর এগোন গেলনা। এক বট

গাছের ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করতে লাগল সকলে। জন্মভূমির দিকে চেয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগল ভীমসিংহ। হঠাৎ লক্ষ্য করল, দুগাল বেয়ে নেমেছে অশ্রুধারা। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড সে-ই হাতে পেত একদিন। কিন্তু বিধিবিড়ম্বনায় আজ আর তা সম্ভব না। আজ সে অনির্দিষ্টের পথে পা বাড়িয়েছে, ভাগ্যে কি আছে কে জানে।

পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে, একজন ভৃত্য এক পাত্র ঠাণ্ডা জলএনে দিল ভীমসিংহকে। জলের বাটিটা মুখে ছোঁয়াতে গেছে এমন সময় আগের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হল। এবং তৎক্ষণাৎ সব জলটুকু ঢেলে, বাটিটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বনদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে বললে, 'দেবি, অপরাধ, ক্ষমা কর। আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। দোবারি পাহাড়ী অঞ্চলে আমার জলগ্রহণ করার অধিকার নাই।'

আর একমুহূর্তও দেরি না করে ঘোড়ায় চেপে সদলে দোবারি অতিক্রম করার জন্যে ছুটে চলল। মিবার ছেড়ে সে এসে আশ্রয় নিল বাদশাহ অউরঙ্গজেবের এক পুত্র বাহাদুরের কাছে। যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাকে প্রায় সাড়েতিন হাজার সৈন্যদলের অধিনায়ক নিযুক্ত করল বাহাদুর। ঐ সমস্ত সৈন্যসামন্তর ভরণ-পোষণের জন্যে বাহান্নটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দিল।

লোকে বলে, অসাধারণ অশ্বচালনার কৌশল জানত ভীম। দ্রুতবেগে চালিত অশ্বের ওপর থেকে লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে ঝুলতে পারত সে। ভবিষ্যতে এই রকম কৌশল দেখাতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছিল।

মোগল সেনাপতির সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় সে বাহাদুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সিন্ধুর ওপারে চলে গিয়েছিল। সেই সুদূর কাবুল রাজ্যেই তার জীবনের শেষ সময় কেটেছে।

জয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে বসে রাণা উপাধি গ্রহণ করল। অল্প-কাল পরেই সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি হল। দেলহির খাঁর সঙ্গে বাদশাহর পুত্র সন্ধিপত্র নিয়ে এল। সংবাদ পেয়ে রাণা দশহাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিক নিয়ে মিবারের এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগল। আজীম ও দেলহির খাঁ আসার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত মিবারবাসীরা জয়ধ্বনি

করে স্বাগত জানাল তাদের। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে রাজসিংহর করুণায় দেলহির খাঁ মুক্তিলাভ করেছিল। সে কথা তুলে স্বর্গীয় রাজসিংহর উদ্দেশে সাধু সাধু করতে লাগল তারা।

বাদশাহ-জাদার আগমনে কয়েক হাজার সৈন্য ও হাজার হাজার মিবারবাসী সমবেত হয়েছিল। তা দেখে আজীমের প্রাণে কিছু ভয় জন্মেছিল। কিন্তু দেলহির খাঁ বিন্দুমাত্র ভীত হল না। সে জানত, রাজপুতরা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

সন্ধির কাজ সমাধা হল। সম্রাটের বিরুদ্ধে রাণা আকবরের সহায় হয়েছিল। তার দণ্ডসরূপ তিনটি জনপদের সত্ব সম্রাটকে নজর দিল জয়সিংহ। সেদিন থেকে ঠিক হল, মিবারের রাণারা লালবর্ণের শিবির এবং রাজছত্র ব্যবহার করতে পারবে না। আজিমের মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্যে সন্ধির সময় দেলহির খাঁর পুত্ররা আজিমের দেহরক্ষী হিসেবে রাণার কাছে উপস্থিত ছিল।

সন্ধি হল ঠিকই, কিন্তু তা সত্বেও নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে পারল না জয়সিংহ। মাত্র পাঁচবৎসর পরেই আবার তাকে অস্ত্র ধরতে হল। আবার রাজধানী ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হল তাকে। অবিরত যুদ্ধে মেতে থাকতে থাকতে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ল রাণা। রাজ্যের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠল। এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও কিন্তু সে কতকগুলো কীর্তিস্তম্ভ গড়ে তুলেছিল। আজও তার অনেক নিদর্শন মিবারে দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতে যতগুলো সরোবর আছে তার মধ্যে জয়সমুন্দ সব চেয়ে বড়। এর পরিধি প্রায় ত্রিশ মাইল ব্যাপী। এই হ্রদের কল্যাণে তার আশে পাশের অঞ্চলে চাষ আবাদের সুবিধে হয়েছিল যথেষ্ট। এর বাধের ওপরে এক মনোরম অট্টালিকা তৈরি করেছিল রাণা। প্রিয়তমা মহিষী কমলা দেবীর সঙ্গে সে এই প্রমোদভবনে বসবাস করত। প্রাচীন প্রমার-বংশে কমলাদেবীর জন্ম। পিত্রালয়ে সে রাণী নামে পরিচিত ছিল।

রাণা জয়সিংহর শেষ জীবন দারুণ শোচনীয়। গৃহ-বিবাদে জড়িয়ে

পড়ে তার মানসিক সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাণার স্ত্রৈণতাই এই বিবাদের মূল। এর জন্যে তার মান, সম্ভ্রম, গৌরব সব ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। জয়সিংহর অনেকগুলো রাণী। তার মধ্যে বুন্দির হাররাজকুমারীই জ্যেষ্ঠ। ধর্ম অনুসারে তার ওপরই বেশী অনুরাগ দেখানো কর্তব্য, কিন্তু রাণা তখন যুবতী রাণী কমলাবতীর প্রেমে মুগ্ধ। ফলে জ্যেষ্ঠার ওপর অবিচার ও বিরাগ প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করত না সে। স্বামীর সোহাগে মাটিতে পা পড়ত না কমলাদেবীর। অন্য কাউকে সে আমলই দিত না। হাররাজকন্যাকে কারণে অকারণে অসম্মান অপমান করত। এবং এই কারনেই বিদ্বেষের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। রাণার রাজপরিবারের এই ঘরোয়া কলহে যে শক্তির অপচয় হতে লাগল, একটা বিরাট যুদ্ধেও বোধহয় তার প্রয়োজন হয় না। প্রতিপত্তি ও যশের লোভে রাজস্থানের অন্য রাজাদের মধ্যে বহু সময় গৃহবিবাদ বেধেছে এবং তার ফলে নানা অনর্থও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাপ্পার নীতি ছিল আদর্শ। তার বংশে এ ধরনের নিচতা ছিল না, যার ফলে বাপ্পার বংশধররা এতকাল মাথা উঁচু করে নিজেদের গৌরব ঘোষণা করে এসেছে। কিন্তু জয়সিংহর আচার ব্যবহারে শিশোদীয়কুলের মুখে চুণ-কালি পড়েছিল।

অন্তঃপুরের বিষ এমনই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, রাণা জয়সিংহ আর টিকতে পারল না সেখানে। মোগলের সঙ্গে মহামহা যুদ্ধে নানা কৌশল দেখিয়েছে সে, কিন্তু নিজের ঘরের এই কলহে তার কোন কৌশলই কাজ করল না। পুত্র অমরসিংহর জননীকে ত্যাগ করে কমলাদেবীকে নিয়ে সে জয়সমুন্দ বাঁধের বিলাসভবনে ভোগ এবং আলস্যে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু প্রিয়তমা কমলাদেবীর সঙ্গে সুখসম্ভোগ বেশী দিন সইল না তার কপালে। কিছু দিন বাদে আবার তাকে ফিরে আসতে হল উদয়পুরে।

একদিন হাতী নিয়ে খেলা করতে করতে তরুণ অমরসিংহর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠেছিল। একটি পাগলা হাতীর বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছিল সে। এই কারণে পাঞ্চোলী মন্ত্রী রাজকুমারকে তীরস্কার করেছিল একটু। অমর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রীকে অপমান করল। এ সংবাদ রাণা জয়সিংহর কানে

গেল, আর নির্জন-বাসে চুপ করে বসে থাকতে পারল না সে। এদিকে জননীর উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে মাতুল হাররাজের কাছ থেকে দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে উদয়পুরে হাজির হল। চিতোরের সর্দাররাও অমরের পক্ষে। রাণা সঙ্কটে পড়ল। কী উপায়ে এই গৃহ-বিবাদ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় তার কোন কিনারা করতে না পেরে আরাবল্লী পার হয়ে গাদবারে পালিয়ে গেল জয়সিংহ। অমরকে শান্ত করার জন্যে গাদবারের সামন্তরাজাকে পাঠাল উদয়পুরে। কিন্তু রাজ্যের প্রায় সব সামন্ত সর্দার প্রজা তার দিকে। অমর কোন কথায় কর্ণপাত করল না। সঙ্গে সঙ্গে কমলমীর দুর্গ আক্রমণ করল। কিন্তু অসীম সাহসী যোদ্ধা দেপ্রা-সর্দারকে পরাজিত করতে পারল না। এদিকে সুযোগ বুঝে রাঠোররা গাদবার আক্রমণ করার তোড়জোড় করতে লাগল। এ ছাড়া রাণার অনুগত বিজোল্লীর বিহারিশাল, শালুমব্রার কুন্তলসিংহ, গানোরের গোপীনাথ, দৈশূরীর শোলাঙ্কি প্রভৃতি যোদ্ধারা জীলবারা রক্ষার জন্যে তৈরি হতে লাগল। চারদিকেই বিদ্রোহের আগুন। সব দেখেশুনে কুমার অমরসিংহ বিচলিত হল। ভয় পেল হয়তো বা। অগত্যা সে পিতার সঙ্গে সন্ধি করতে রাজি হল। ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে পিতাপুত্রে মিলিত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল। সন্ধির সর্তে ঠিক হল, যতদিন রাণা জীবিত থাকবে ততদিন অমরসিংহ জয়সমুন্দে বসবাস করবে। এবং রাণা জয়সমুন্দ ছেড়ে উদয়পুরে বাস করবে।

জয়সিংহ কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেছিল। প্রথম যৌবনে যেসব সৎ গুণের অধিকারী ছিল সে শেষ জীবনেও যদি তা থাকত তা হলে মোগলের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারত। কিন্তু স্ত্রৈণতাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। যদি ঐ বিশাল জয়সমুন্দ হ্রদটি সে তৈরি না করে যেত তবে মিবারের ইতিহাসে আজ তার নামই খুঁজে পাওয়া দায় হত।

রাণা জয়সিংহর মৃত্যুর পর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসল অমরসিংহ। মিবারের সিংহাসনে সে 'দ্বিতীয় অমরসিংহ' নামে পরিচিত। পূর্ব-পুরুষ প্রথম অরসিংহর মতই তেজস্বী ও সুশাসক ছিল সে। পিতার সঙ্গে

বিরোধের ফলে যে মহাক্ষতি হয়েছিল রাজ্যে তার জন্যে পরে অনুশোচনা করেছিল রাণা অমর।

সিংহাসন লাভের পরই সে সম্রাটের ভাবী-উত্তরাধিকারী শা-আলমের সঙ্গে এক সন্ধির প্রস্তাব করল। এই সন্ধি-প্রস্তাবের মধ্যে তার অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময়ে সে রাণা হল তখন মোগল সিংহাসন নিয়ে অউরঙ্গজেবের পুত্রদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। ভাই ভাইএর বুকে ছুরি চালিয়ে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র করছে। এই রকম একটা গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়েই অমর ভাবী সম্রাট শা-আলমের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। শা-আলম এক সময় সিন্ধুর পশ্চিমপারে গিয়েছিল, তখন রাণার শক্তাবৎ সর্দার একদল রাজপুত সৈন্য নিয়ে তাকে সাহায্য করেছিল। লোকে বলে, ওখানেই শা-আলমের সঙ্গে সন্ধির সর্তাদি ঠিক হয়েছিল।

ভারতবাসী চিরকালই রাজভক্ত ছিল। এই সার কথাটা আকবর জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল বলেই সুকৌশলে প্রজাদের মনোরঞ্জন করে তাদের কাছ থেকে ভক্তি অর্ঘ্য আদায় করতে পেরেছিল। কিন্তু পাপীষ্ঠ অউরঙ্গজেব এই সূক্ষ্ম কূটনীতির ধারে কাছে ঘেঁসে নি। সে নিয়ত অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে প্রজাদের, তাই প্রজারা ভক্তির বদলে জানিয়েছে ঘৃণা। শুধু অউরঙ্গজেবের অপরিণাম-দর্শিতার ফলেই ভারতের মাটিতে আর এক বিদেশী, ইংরেজ, খুঁটি গাড়ার স্বপ্ন দেখতে সাহস করেছিল। তারা দেখল, প্রজারা বারুদ হয়ে আছে। মুসলমান শাসনের অবসান আসন্ন। এই সুবর্ণ সুযোগ। সে-সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে নি তারা। অউরঙ্গজেবের ঘোষিত নীতির মধ্যে দুটি মারাত্মক। এক হিন্দুদের ইসলামের ধর্মে দীক্ষা নেবার নির্দেশ, আর এক জিজিয়া, মুণ্ডুকর। রাণা রাজসিংহর দাপটে প্রথমটায় তেমন কৃতকার্য হতে পারেনি, কিন্তু জিজিয়ার অত্যাচারে হিন্দুরা জ্বলে মরেছে সারা জীবন।

যদি কোন রাজপুত নিজের ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হতে পারত তবে সে বাদশাহর নেকনজরে পড়ত। এই লোভে দুচার জন রাজপুত যে মুসলমানধর্মে দীক্ষা নেয় নি তা নয়। শিশোদীয় বংশের এক শাখায়

গোকুলরাও নামে এক সামন্ত রাজা ছিল। চম্বলের ধারে রামপুরের শাসনকর্তা ছিল সে। নিজের পুত্রের হাতে শাসনভার দিয়ে কিছুদিনের জন্যে গোপাল দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল। কিন্তু পিতার অনুপ-স্থিতির সুযোগে, সম্রাটের ভাণ্ডারে না পাঠিয়ে, রাজ্যের যাবতীয় রাজস্ব আত্মসাৎ করে বসে রইল। গোপাল ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত ঘটনা অউরঙ্গ-জেবের কাছে পেশ করল। গোপালের পুত্র দেখল সমূহ বিপদ। প্রাণ যায় যায়। তখন সে হঠাৎ হিন্দুধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমান হয়ে গেল। অব্যর্থ ফল ফলল। তার সব অপরাধ ক্ষমা করল অউরঙ্গজেব। শুধু তাই না, মুসলমান হওয়ার ইনাম হিসেবে সে পিতার রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হল। কুলাঙ্গার পুত্রের এই ব্যবহারে গোপাল রাও ক্রোধে জ্বলতে লাগল। উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করতে থাকল। সমুচিত শিক্ষা দেবে সে পুত্রকে। রামপুর অবরোধ করল গোপাল। কিন্তু তার এ চেষ্টা সফল হল না। উপায় না দেখে সে এসে আশ্রয় নিল অমরসিংহর কাছে। গোপালকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে অমরকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হল। রাণার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে পুত্র আজীমকে মালব রাজ্যে পাঠাল বাদশাহ। রাণা অমরসিংহকে সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হল। মালব-রাজা সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আজিম তখন নর্মদার ওপারে বাস করছে। ওখানে মারাঠীরা বিদ্রোহ করেছে। নিমসিন্ধিয়া নামে এক মারাঠীর নেতৃত্বে দারুণ বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ১৭০৬-৭ সাল। অউরঙ্গ জেবের অন্তিম সময় আসন্ন। এদিকে সারা রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। অউরঙ্গজেবের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে লাগল। অন্যদিকে ঘরে পুত্ররাও বিদ্রোহী। এই নিদারুণ দুঃসময়ে, জরায়,, চিন্তায় ১৭০৭ সালে অউরঙ্গাবাদে অউরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

বাদশাহর মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র তার পুত্র পৌত্ররা সবাই সিংহাসনের লোভে দিল্লীর দিকে ছুটল। মৃতের জন্যে এক মুহূর্ত শোক করার ফুরসৎ পেল না কেউ। সব আগে দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র আজিম সিংহাসন অধিকার করে বসল। জ্যেষ্ঠ মৌজাম দিল্লীতে আসছে,

সংবাদ শোনামাত্র ধাত ও কোটার রাজাদের সহযোগিতায় সসৈন্যে আগ্রায় এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল সে। জাজো নামে এক জায়গায় লড়াই হ'ল দুই ভাইএ। কিন্তু অগ্রজের বিক্রমের সামনে টিকতে না পেরে কোটা ও ধাতনগরের দুই রাজা এবং নিজের পুত্র বিদরসহ যুদ্ধে প্রাণ দিতে হল তাকে। মিবার, মারবার এবং রাজবারার অন্যান্য রাজারা মৌজামের পক্ষ নিয়েছিল। অনুজকে নিহত করে শাহ-আলম বাহাদুরশাহ নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসল মৌজাম।

মৌজামের গুণে রাজবারার সব রাজাই আন্তরিকভাবে মুগ্ধ হয়েছিল। বাহাদুরশাহর মধ্যে সদগুণের অভাব ছিল না। রাজপুতরা তাকে ভালও বাসত খুব। কিন্তু একটা জায়গায় খটকা ছিল, বদমাইশ অউরঙ্গজেবের পুত্র কি পিতার কোন পাপেরই উত্তরাধিকারী হবে না! তারা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি। সে-ও যে আবার তার বাবার রূপ ধরে রাজপুতদের শোষণ করতে শুরু করবে না তা পুরো-পুরি মেনে নিতে পারছিল না তারা। পিতার অপকর্মে তার সব গুণ বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু চেষ্টার কসুর করেনি বাহাদুর। কিন্তু রাজপুতরা আর তেমন করে তাকে নিজেদের মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারল না।

রাজপুতদের আচার আচরণ দেখে বাহাদুরের মনে হল, বিপদে আপদে সামান্যই সাহায্য সে পেতে পারে। ঠিক এই সময়ই দাক্ষিণাত্যে কম্‌বকস্ বিদ্রোহী হল। সে নিজেকে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করল। বাহাদুর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দেবার সঙ্কল্প করছে, এমন সময় পঞ্চনদের শিখরা বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের স্বাধীন বলতে লাগল। সব ফেলে বাহাদুর ছুটল শিখদের দমন করতে। গুরু নানক এদের প্রধান। গুরু নানকের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এক শো বছর ধরে বল বিক্রম আয়ত্ব করে ধীরে ধীরে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিল। বাহাদুরশাহর রাজত্বকালে সারা মোগল সাম্রাজ্যে তখন শিখরাই একমাত্র স্বাধীন জাত। প্রবলপরাক্রান্ত শিখদের জ্বলন্ত উদাহরণ চোখের সামনে দেখে রাজপুতরা আবার সবাই এক জায়গায় জড়ো হল। তাদের শান্ত করার জন্যে

বাহাদুরশাহ তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজপুতদের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই তারা শান্ত হল না। বাদশাহর অনুমতি না নিয়েই তারা সবাই গিয়ে মিলিত হল উদয়পুরের রাজপ্রাসাদে। সবাই মিলে এক সন্ধির মন্ত্রে দীক্ষা নিল তারা। পতিত রাজারা আবার জাতে উঠল। সেদিন মিবারের রাণা অমরসিংহ সামন্ত রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বসে একত্রে আহার করে এতদিনের বাধা ভেঙ্গে দিল। ঠিক হল, পতিত রাজাদের সঙ্গে আবার শিশোদীয়দের বিবাহাদির সম্বন্ধ হতে পারবে। তবে সর্ত এই, শিশোদীয় কন্যার গর্ভে যদি কোন পুত্র হয় তবে সে-ই হবে রাজা, আর যদি কন্যা হয় তবে সম্ভ্রান্ত রাজকুলে তার বিবাহ দিতে হবে। রাঠোর এবং কুশাবহরা এই সর্তে স্বাক্ষর করল ঠিকই, কিন্তু এর ফলে তাদের গৃহে অনিষ্টের সূত্রপাত হল। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অগ্রজই রাজ্য পায়। এখন থেকে এই নিয়ম বাতিল হয়ে গেল। এর ফলে ভবিষ্যতে যে অন্তর্বিপ্লবের কালো ছায়া নেমে এসেছিল তা সহজে বিদায় নেয় নি।

রাও গোপালের কুলাঙ্গার পুত্র রতনকে বাদশাহ অউরঙ্গজেব রক্ষা করেছিল। নিরুপায় হয়ে গোপাল উদয়পুরে এসে রাণার আশ্রয় নিল। তার ভূমিবৃত্তি উদ্ধার করে দেওয়ার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাণা। এতদিন চুপচাপ ছিল, এবার সুযোগ বুঝে রাঠোর ও কুশাবহদের সহযোগিতায় এগিয়ে গেল সে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হল না। রাজা মুসলিম খাঁ (রতনসিংহ মুসলমান হয়ে এই নাম গ্রহণ করেছিল) তাদের সব উদ্যম-আয়োজন ব্যর্থ করে দিল। বাদশাহ উপযুক্ত পুরস্কার দিল মুসলিম খাঁকে। এমন সময় খবর এল রাণার সুবলদাস নামে এক কর্মচারী পুরমণ্ডলের শাসনকর্তা ফিরোজ খাঁকে অক্রমণ করেছিল। ফিরোজ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে আজমীরে পালিয়ে গেছে। এদিকে সসৈন্য দুর্গাদাস এসে যোগ দিল রাণার সেনা বাহিনীতে। এর ফলে রাণার সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেল। রাণা যখন মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে এইভাবে সমর-আয়োজন করছে সে-সময় কোন এক অজ্ঞাত আততায়ীর দেওয়া বিষপান করে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ

করে শা-আলম বাহাদুর। বাহাদুরশাহ কিন্তু মানুষ হিসেবে সৎ এবং চরিত্রবান ছিল। কিন্তু পিতার পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হল। হিন্দুকুশ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যে তখন দারুণ বিশৃঙ্খলা। বাহাদুরশাহ ভেবেছিল, ধীরে ধীরে সব বিশৃঙ্খলা দূর করে এক আদর্শ সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে সে। কিন্তু অঙ্কুরেই সব শেষ হয়ে গেল।

এরপর এক এক করে কয়েকজন মোগল সিংহাসনে বসেছিল বটে, কিন্তু তাদের কারুর ভাগ্যেই বেশীদিন টিকেনি রাজাভোগ। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে রেবা নামে এক নগর ছিল। সেখানকার হোসেন আলী ও আবদুল্লা খাঁ এই দুই সৈয়দভ্রাতা তখন মোগল বাদশাহকে হাতের পুতুল বানিয়ে রেখেছিল। তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে, তারা যাকে সিংহাসনে বসাত সেই হত মোগল বাদশাহ। আবার তাদের খেয়ালখুশীমতই সিংহাসন-চ্যুত হত তারা। এই দুই সৈয়দভ্রাতাকে যে সব মোগল বংশধররা সন্তুষ্ট করতে পারত তারাই কিছুদিনের জন্যে বাদশাহ হত। যারা, বিধি অনুসারে বাদশাহ হওয়ার অধিকারী তারা কোথায় ভেসে গেল।

মোগল বাদশাহর বিরুদ্ধে যখন রাজস্থানের তিনশক্তি একত্রিত হয়েছে তখন সৈয়দভ্রাতারা ফিরকশিয়রকে মোগল বাদশাহ বানিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে কঠোরতম অত্যাচার সহ্য করেও রাজপুতরা চুপ করেছিল, কিন্তু মোগল সিংহাসন নিয়ে এই ব্যাভিচার আর সহ্য করল না তারা। মুসলমানরা হিন্দুদের বহু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ তৈরি করেছিল। এবার তারা সেই সব মসজিদ ভেঙ্গে চুরমার করে আবার সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। মৌলবীদের ওপর অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিল, এবং মোগল দেওয়ানদের ওপর নিষ্ঠুর ব্যবহার শুরু করল। একাজে রাজপুতদের মধ্যে বিশেষ করে রাঠোররাই অগ্রণী ছিল। বহুকালের গচ্ছিত স্বাধীনতা এতদিন পরে আবার তারা মোগলের হাত থেকে কেড়ে নিল। মারবার থেকে মোগলদের বিতাড়িত করে দিল অজিতসিংহ। এই উপলক্ষ্যে রাজস্থানের তিন প্রধান শক্তির এক বৈঠক বসল সম্বর হ্রদের তীরে। এই হ্রদ তিনটি রাজ্যের সীমা রেখা হিসেবে চিহ্নিত হল।

মোগলরা রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান করল। আমির-উল-ওমরা (হোসেনআলীর আর এক নাম) দলবল নিয়ে অজিতসিংহকে আক্রমণ করল। এই সময় অজিতসিংহ বাদশাহর এক গুপ্ত পত্র পেল। তাতে লেখা ছিল, অজিতসিংহ যেন তার সর্বশক্তি দিয়ে হোসেনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। দরকার হলে সে গোপনে তাকে সাহায্য করবে। বাদশাহ ফিরকশিয়র বুঝতে পেরেছিল, তার রাজ্যভোগও শেষ হয়ে এসেছে। এবার সৈয়দরা আবার কাউকে এনে বসাবে মোগল সিংহাসনে। তাই সে এই সৈয়দভ্রাতাদের সর্বনাশ করার উপায় চিন্তা করছিল।

অজিতের সঙ্গে গোপনে গোপনে বাদশাহর যে সখ্যতা জন্মেছে সেকথা সৈয়দভ্রাতারা আদৌ বুঝতে পারল না। তাই বাদশাহর ইচ্ছা অনুসারে অজিতের সঙ্গে সন্ধি করল হোসেন আলী। অজিতসিংহও বাদশাহকে নিয়মিত কর এবং তার একটি কন্যা দান করতে রাজি হয়ে গেল।

ঠিক এমনই সময়ে বৃটীশদের প্রভুত্বের পথ পরিস্কার হয়ে গেল। বাদশাহর সঙ্গে মারবার রাজকুমারীর বিবাহ ঠিক। দিন তারিখও ঠিক। তিথি লগ্নও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সব বানচাল হয়ে গেল। বাদশাহর পিঠে এক দুষ্টব্রণ ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল সে। কত হেকিম, কবিরাজ এল, কিন্তু কেউই সারাতে পারল না। এদিকে বিবাহের বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ, বিবাহের লগ্নও সমাগত, কিন্তু সম্রাট শয্যাশায়ী, কি করে বিবাহ হবে? সবাই চিন্তিত হল। তবে কি এই বিরাট আয়োজন তার অন্ত্যেষ্টির কাজেই লাগাতে হবে! এই সময় সুরাটের বৃটীশ বণিকদের এক দূত মোগল দরবারে উপস্থিত ছিল। সে একজন ডাক্তার। নাম হ্যামিল্টন। অবশেষে তাকে ডাকা হল। মোগল অন্তঃপুরে ঢুকল বিদেশী খৃষ্টান। তার চিকিৎসার গুণে বাদশাহ আরোগ্য লাভ করল। তারপর মহাধুমধামের সঙ্গে মারবার দুহিতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশাহর।

বাদশাহ খুশী হয়ে হ্যামিল্টনকে বললে, 'আপনি আমার কাছে কি পুরস্কার চান বলুন, আমি দেব।'

চতুর হ্যামিল্টন বললে, 'শাহন-শা, ধন, মান, উচ্চতম পদ-গৌরব কিছুই আমি চাইনে। আমরা বহু দূর-দেশ থেকে বানিজ্য করতে এসেছি। আপনারা এই বিশাল সাম্রাজ্যে আমাদের পা রাখার মত একটু জায়গা দিন। এবং অবাধে যাতে আমরা ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারি এ ধরনের কোন সত্ব আমাদের দেওয়া হোক। বাদশাহ প্রীত হয়ে বললে, 'এ আর এমন বেশী কি, এখনি আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সেইদিন ভারতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বীজ পোঁতা হয়েছিল কালে তাই বিশাল বটবৃক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

হ্যামিল্টনের স্বার্থত্যাগ আজ সবাই ভুলে গেছে। চাইলেই অতুল ধনরত্ন পেত, কিন্তু যে বৃটীশের জন্যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকটা অনুমাত্র চিন্তা করেনি সেই বৃটীশরাই কি তাকে মনে রেখেছে? কিছু মাত্র না। সেদিন কলকাতায় তার মৃত্যু হয় সেদিন এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার দেহটা সমাধীস্থ করেই বৃটীশরা তাদের কর্তব্য শেষ করে দিয়েছে। সামান্য একটি স্মৃতি ফলকও দাঁড় করানো হয় নি তার সমাধীর ওপর।

রাজপুতদের আশা ছিল, মারবার রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ হলে বাদশাহ তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং উল্টোটাই হল। বিয়ের কিছুদিন বাদেই আবার সেই কুখ্যাত জিজিয়া কর ধার্য করল বাদশাহ। হাজার প্রতি সাড়ে ছয় টাকা হারে এই কর আদায় করতে লাগল। মোগলদের ওপর যেটুকু শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস এত দিনে ফিরে আসছিল তাও ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। জিজিয়া ছাড়াও স্ট্যাম্পকর ধার্য করল বাদশাহ। সঙ্গর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বাবর এই করের প্রবর্তন করেছিল। কৌশল করে অজিতসিংহকে ত্রি-শক্তি থেকে সম্রাট বিচ্ছিন্ন করে ভেবেছিল রাজপুতদের মধ্যে একতায় ভাঙ্গন ধরেছে। কিন্তু মিবারের রাণা ওতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বাদশাহর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। রাণা অমরসিংহর এই বিক্রমের কাছে মোগল বাদশাহকে মাথা হেঁট করতে হয়েছিল। নিচের এই সন্ধি

পত্র তার প্রমাণ।

১। সপ্তসহস্রের মনসব। (সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যর অধিনায়ক হওয়া হিন্দুদের পক্ষে উচ্চতম পদ)

২। জিজিয়া কর রহিত হবে। হিন্দুদের ওপর আর কোন কারণেই কখনও ধার্য করা হবে না।

৩। দাক্ষিণাত্যের জন্য সহকারী এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য থাকবে।

৪। হিন্দুদের ধর্মমন্দিরগুলো পুনর্গঠিত হবে। হিন্দুরা স্বাধীনভাবে ধর্মানুশীলন করতে পারবে।

৫। আমার মাতুল, পিতৃব্য, ভ্রাতা বা সর্দাররা যদি বাদশাহর কাছে যায় তবে তারা কোন প্রকার আশ্রয় বা উৎসাহ পাবে না।

৬। আমার সর্দাররাই আমার সেনাবল। যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আপনার সেনাবল প্রয়োজন হবে আমি সাধ্যমত তা সংগ্রহ করে পাঠাবো। কিন্তু তাদের ভরণপোষণ করার দায়িত্ব বাদশাহর থাকবে। এবং কাজ শেষ হলেই তাদের পাওনা-কড়ি মিটিয়ে দিয়ে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

৭। দেবল, বাঁশবারা, ডুঙ্গারপুর শিরোহী ও অন্যান্য যে সব স্থানের ওপর আমি আধিপত্য পাব তারা কোন সময়ের জন্যেই আপনার আজ্ঞাবহ হবে না।

৮। যে সব জমাদার, মনসবদার আন্তরিকভাবে আপনার সেবা করে তার পুরো তালিকা আমাকে দিতে হবে। যারা আপনার অবাধ্য আমি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব। এর জন্যে যদি কোন পয়মল (সেনাদল স্থানান্তরে যাওয়ার সময় যে শস্যাদি নষ্ট হয় তাকে পয়মল বলে) হয় তবে আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না।

তিন কোটী দেম (চল্লিশ দেমে এক টাকা) পুরস্কারের মধ্যে প্রমাণ-পত্রের জন্যে দু'কোটী, দাক্ষিণাত্যের সেনাদলের বেতন এক কোটী এবং শিরোহীর পরিবর্তে আরও দুই কোটী দেম আপনি দিয়েছেন। সে সব জনপদ আমি চাই সেগুলো ইদর, কেক্রী, মণ্ডল, জিহাপুর ও মালপুর।

সন্ধিপত্র খানা পাঠ করে আপাতভাবে মনে হতে পারে, অজিতসিংহর

প্রতি অবমাননা করা হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, তা ঠিক না। যে সময় মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে সে সময় দিল্লীর কাছে জাটরা জেগে উঠেছিল। আগেই বলা হয়েছে, এই জাটরা প্রাচীন জিৎদের এক শাখা। মোগলদের এই শোচনীয় অবস্থার সুযোগে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করল। ধীরে ধীরে তারা তাদের জয় পতাকা দিল্লীর সিংহদ্বারে ওড়াল। সিন্সির অবরোধ-কাল থেকে বহুদিন যাবৎ এই জয়পতাকা উড়েছিল। শেষে বৃটিশদের কূটনৈতিক চালে যে দিন ভরতপুর দুর্গ বিধ্বস্ত হয়ে গেল সেদিন থেকে তারা হারাল তাদের স্বাধীনতা।

সেই সন্ধিবন্ধনই অমরসিংহর জীবনের শেষ কাজ। এর অল্পদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেছিল সে। মিবার রাজ্যের অসংখ্য স্মারকস্তম্ভে তার গৌরব ও কীর্তি কাহিনী খোদাই করা আছে। আজও রাজপুতরা প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে রাণা দ্বিতীয় অমরসিংহ নাম উচ্চারণ করে থাকে। সে-ই শিশোদীয় কুলের শেষ গৌরব। তার সঙ্গে সঙ্গেই শিশোদীয়কুলের সব গৌরব শেষ হয়ে যায়।

১৩

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করল সংগ্রামসিংহ। সংগ্রামসিংহ বলতে সাধারণত যার কথা মনে আসে সে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, মহাযোদ্ধা। তার বীরত্ব-গাথা মিবারের নানা জায়গায় খোদাই করা আছে। রাজপুত বাসীরা আজও যার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সে সংগ্রামসিংহর পূর্বপুরুষ। এই দ্বিতীয় সংগ্রামসিংহ যখন রাণা মহম্মদ তখন বাদশাহ। এই সময় বিরাট মোগল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। মোগল, পাঠান, সিয়া, সুন্নী, মারাঠা ও রাজপুতরা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে লাকল। শুধু মোগলের

তাঁবে আর রইল না কেউ। ঠিক এই সুযোগই খুঁজছিল বৃটিশরা।

হতভাগ্য মোগল বাদশাহর সামনে ঘোর দুর্দিন। যে সব সেনাপতি এবং প্রতিনিধিদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা সবাই একে একে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে শুরু করল। এর ফলে বাঙ্গলা, অযোধ্যা হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য রাজ্যগুলো মোগল অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মোগল সামন্ত-সেনাপতিরা যে রাজ্যগুলো আত্মসাৎ করেছিল তাও তারা বেশীদিন ভোগদখল করতে পারেনি। কেন পারেনি, তারও যথেষ্ট কারণ আছে। রাজ্যগুলো হাতে পেয়ে তারা যদি আদর্শ রাজনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করত, যদি প্রজার মঙ্গলের কথা চিন্তা করত তাহলে কিছুতেই বিপদ কাছে ঘেঁসতে পারত না।

প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজীর বংশধররা যে রাজনীতিতে এত অজ্ঞ হবে তা ভাবা যায় না। অদ্ভুত রণ-কৌশল ও বিচক্ষণতায় মোগল-কবল থেকে যে বিশাল অংশ-বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল মহাবীর শিবাজী, তা যদি ঠিক ঠিক রক্ষা করেও চলতে পারত তার বংশধররা, তাহলে বিদেশীরা ভারতে খুঁটি গাড়তে পারত না। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ধার কাছ দিয়েও চলত না তারা। মুসলমানরা দেশ আক্রমণ করেছে, অত্যাচারও যথেষ্ট করেছে সত্যি কিন্তু মারাঠাদের মত নির্মমভাবে তছনছ করে নি দেশের সম্পদ। এই কারণেই মুসলমান রাজত্বকালের চেয়ে মারাঠা রাজত্বকালে দেশের বেশী ক্ষতি হয়েছিল। মোগলের দাপট কমতে না কমতেই মারাঠারা নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করল। ফলে দেশের প্রজারা অন্তঃসার শূন্য, হীনবল হয়ে পড়ল। আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

ফিরক্‌শিয়রের দারুণ দুর্ভাগ্য। সৈয়দভাইদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে ইনায়েৎ উল্লাকে নিজের মন্ত্রী করেছিল। দুধ দিয়ে কালসাপ কে পোষে! অউরঙ্গজেবের আমলের বৃদ্ধ মন্ত্রী ইনায়েৎ আবার মন্ত্রিত্ব পেয়ে সেই অউরঙ্গজেবীয় নীতির স্টীম-রোলার চালাতে লাগল দেশের হিন্দুদের ওপর। বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠল। সবাই বৃদ্ধ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে খাঁড়া উচিয়ে ধরল। শেষে সৈয়দ ভ্রাতাদের কোপে পড়ে

বদমাইশ মুসলমানরা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। বাদশাহ ফিরকশিয়র ইনায়েতের পরামর্শে তাদের প্রভুত্ব কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রসিদ্ধ যোদ্ধা নিজাম-উল-মুলুককে আসতে বলা হল। এই নিজামই বিশাল হায়দারাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এর আগে মুর্শিদাবাদের শাসনকর্তা ছিল সে। তার কর্মদক্ষতা, রণপাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজধানীতে এনে তার হাতে মালব-রাজ্য তুলে দেওয়া ঠিক করল বাদশাহ। সব খবরই যথাসময়ে সৈয়দভাইদের কানে গেল। তখনি তারা দশ হাজার মারাঠা সৈন্য সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হল। কিছুদিনের মধ্যেই মিরকাশিম পদচ্যুত হল। এই ঘোর বিপদের দিনে প্রায় সবাই বাদশাহকে ত্যাগ করল, শুধু অম্বর ও বুন্দির রাজারা ছাড়া। প্রকাশ্য যুদ্ধে বীরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে বাদশাহকে বারবার অনুরোধ করল তারা, কিন্তু কাপুরুষ বাদশাহ কিছুতেই রাজি হল না তাদের প্রস্তাবে। অম্বর ও বুন্দির রাজারা বাদশাহর এই কাপুরুতা দেখে দিল্লী ছেড়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে গেল। হতভাগ্য ফিকরশিয়রের শেষ আশাটুকুও ফুরিয়ে গেল। শত্রুরা অন্তঃপুর বিধি লঙ্ঘন করবে না এই আশা পোষণ করে বেগম-মহলে অবস্থান করতে লাগল। দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ, কেউই প্রবেশ করতে পারল না। মন্ত্রী এবং অজিত সিংহ ছাড়া দুর্গের মধ্যে আর কেউ ছিল না। নাগরিকরা দারুণ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। এদিকে আমির-উল-ওমরা দশহাজার মারাঠা সৈন্য নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। কয়েকদিন পরে বাদশাহর পদচ্যুতি ঘোষণা করা হল। এর পরে রুফে-উল-দিজারাৎকে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে বসানো হল। তখনকার মুসলমান-প্রথা অনুসারে গলায় দড়ির ফাঁস এঁটে বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছিল।

নতুন বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেই মুণ্ডুকর তুলে দিল। অজিত সিংহ ও অন্যান্য রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল সে। রাজপুতদের খুশী করার জন্যে সৈয়দভ্রাতারা মন্ত্রী ইনায়েৎকে পদচ্যুত করে রাজা রতনচাঁদকে দেওয়ানের পদে বহাল করল। কিন্তু

রুফে-উলের ভাগ্যে রাজ্যভোগ ছিল না। মাত্র তিনমাস রাজত্ব করার পর দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করল। কয়েকমাসের মধ্যে আরও দুইজন বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসতে পেয়েছিল। সৈয়দ ভাইদের নিষ্ঠুর চক্রান্তে তারা নির্মমভাবে নিহত হয়। এরপর বাহাদুরশাহর প্রথম পুত্র রসুন আকতার মহম্মদশাহ নাম নিয়ে ১৭২০ সালে বাদশাহ হল। তিরিশ বৎসর রাজত্ব করেছিল সে। এর সময়েই মোগল রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যগুলো মোগল শাসন থকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাজ্যের মধ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা চলতে থাকে, এই সুযোগে মারাঠিরা এবং পাশ্চাত্য আফগানরা ভারতের বিভিন্ন নগর-গ্রাম লুঠপাঠ করতে শুরু করল। লুঠের মাল নিয়ে মারাঠি এবং আফগানদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝগড়া বেধে গেল। একে দেশের মধ্যে এই রকম অরাজকতা তার ওপরে সৈয়দ-ভাইদের নিষ্ঠুর অত্যাচার, ফলে দেশের মধ্যে এক বিভৎস কাণ্ডের অভিনয় চলছিল। যারা সৈয়দদের সহায় ছিল তারাও বিরক্ত হয়ে উঠল। এমন কি নিজের অভিজ্ঞতায় যে নিজাম মালবের অসাধারণ উন্নতি করেছিল সে-ও সৈয়দদের অত্যাচারে হতাশ হয়ে পড়ল।

নিজাম যে একজন সুদক্ষ সেনাপতি সৈয়দরা তা জানত। মালব উদ্ধারের সময় সে যে বীরত্ব দেখিয়েছিল এবং মালবের উন্নতির জন্যে সে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল সেসব স্মরণ করে তারা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। নিজেদের স্বার্থ কায়েম করার জন্যে সৈয়দরা যাকে খুশী সিংহাসনে বসিয়ে বাদশাহ তৈরি করছিল। এইসব বাদশাহদের ওপর ভক্তি এবং অনুরাগ দেখানো তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে নিজেকে সে স্বাধীন নবাব হিসেবে ঘোষণা করল। এই সময়ে সে আশীর ও বুরহানপুর দুর্গ দখল করে। এই সব শুনে সৈয়দরা ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু বিদ্রোহীকে দমন না করে তো বাঁচার পথ নাই। তাই তারা কোটা ও মারবারের সৈন্য সামন্তদের সাহায্যে প্রচণ্ড-ভাবে আক্রমণ করে নর্মদার ধার থেকে নিজামকে বিতাড়িত করার তোড়-জোড় করতে লাগল। এই সূত্রে কোটারাজের প্রাণ গেল। নিজাম

স্বাধীনতা ঘোষণার অল্পকাল পরেই অযোধ্যাও স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করল। বিয়ানার সেনাপতি সৈদতখাঁ সৈয়দদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে এক ষড়যন্ত্র করে আমীর-উল-ওমরাকে হত্যা করার চেষ্টা করতে লাগল। নিজামকে দমন করার জন্যে সসৈন্যে সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রাকালে হায়দারখাঁর নির্মম অসির আঘাত পাপিষ্ঠ আমীরের ইহলীলা শেষ করে দিল। এক-জনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল, এবার বাদশাহ অন্য সৈয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। এ সংবাদ শোনা-মাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর ইব্রাহিমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে দিল। ভ্রাতৃহন্তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সসৈন্য তার বিরুদ্ধে অভিযান করল। এই সময় রতনচাঁদের শিরচ্ছেদ করা হয়। এত সব কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে কিন্তু রাজপুতরা নিরবে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার কিন্তু তারা আর শুধুমাত্র দর্শক হয়ে রইল না। ঘোরতর সংগ্রাম বেধে উঠল। জ্যেষ্ঠ সৈয়দকে ধরে তারা গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করল। এই সকল ষড়যন্ত্রের পুরস্কার সরূপ বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে সৈদতখাঁকে অযোধ্যার সম্পূর্ণ শাসনভার ছেড়ে দিল। এ সময় তাকে 'জঙ্গ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাজপুতরা বিজয়ী বাদশাহর প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাল। বাদশাহও সবাইকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিল। যুদ্ধকালে অম্বররাজ জয়সিংহ ও যোধপুররাজ বাদশাহর পক্ষ নিয়েছিল, সেজন্যে জয়সিংহকে আগ্রা ও অজিতসিংহকে গুজরাট ও আজমীরের শাসনকর্তার পদ দিল। মারাঠাদের অত্যাচার বন্ধ করার কথা ভেবে গিরিধারী দাসকে নিযুক্ত করা হল মালবের শাসনকর্তা। আর বাদশাহর প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে হায়দারাবাদ থেকে ডেকে পাঠানো হল নিজামকে।

সম্রাটের এই রাজনৈতিক নীতি পরিবর্তনের সময়ে মিবারের রাজ-নৈতিক অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মিবারের রাণা তখন নিজেদের সমস্ত সর্দার ও প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান ভক্তি পেয়েই গদগদ হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে অন্যান্য রাজারা যখন রাজ্য-সীমা বাড়িয়ে নেবার তালে আছে তখন সে শুধু তার অধিকারের আবু, ইদর, ডুঙ্গারপুর, বংশ

ঝরা প্রভৃতির ছোট ছোট অধিনায়কদের কৃতাঞ্জলি পেয়েই খুশী হয়ে রইল। রাণা সংগ্রামসিংহর অদূরদর্শিতার দোষেই মিবারের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ল। এই সময় শক্তাবৎ ও চন্দাবৎ সর্দারদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। শক্তাবৎরা চায় রাজ্যের সীমা বাড়াতে কিন্তু চন্দাবৎ তার বিরোধিতা করতে লাগল। এ সময় মিবারের কোন সামন্ত রাজ্যের মধ্যে দুর্গ তৈরি করতে পারত না। কারণ, কোন সামন্তকেই তিন বৎসরের বেশী সময়ের জন্যে পাট্টা দেওয়া হত না। বাকী জীবনের ভরণ-পোষণের জন্যে তাদের জন্যে কিছু ভূসম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল। মোগল আধিপত্যের অবসান হতে আরম্ভ করলে আত্মরক্ষার দিকে তেমন আর গা লাগায়নি মিবারের রাণা। কিন্তু কিছুদিন বাদেই দুর্দান্ত মারাঠি ও পাঠানরা যখন দেশের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগল তখন সর্দাররা চারদিক দিয়ে দুর্গের মালা তৈরি করে ফেলল।

রাণা সংগ্রামসিংহর রাজত্বকালেও মিবারের অনেক গৌরব কীর্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। শত্রুর হাত থেকে কয়েকটি রাজ্যও পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল সে। রাণা বিহারীদাসকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছিল। তার মত সুদক্ষ, বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রী মিবারে আগে কখনও ছিল না। বিহারীদাস তিনটি রাণার শাসনকাল ধরে এই মন্ত্রীর পদে বহাল ছিল। সংগ্রামসিংহর মৃত্যুর পর মারাঠিরা যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধরে মিরার আক্রমণ করল তখন কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাদের প্রতিরোধ করতে পারল না বিহারীদাস।

রাণা সংগ্রামসিংহর চরিত্র সম্বন্ধে অনেকগুলো কিংবদন্তী আছে। একজন বিজ্ঞ, ন্যায়বান ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাজা ছিল সে। একবার কোন কাজ আরম্ভ করলে শেষ না করে ক্ষান্ত হত না।

কোতারিওর চৌহান মিবারের এক প্রথম-শ্রেণীর সর্দার। রাজ-সভায় তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। একদিন সে রাণার সাজসজ্জায় আরও খানিকটা জমক বাড়ানোর প্রার্থনা জানাল। প্রচলিত শিষ্টাচার অনুসারে রাণা তার প্রার্থনা পূরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আনন্দে গদগদ হয়ে ঘরে ফিরে এল চৌহান-সামন্ত। এ দিকে রাণা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিল,

কোতারিওর ভূমিবৃত্তি থেকে দু'খানা গ্রাম পৃথক করে নিতে। এ সংবাদ শোনামাত্র ছুটে এল কোতারিও-সামন্ত।

'—কি অপরাধ করেছি মহারাজ! কেন আপনি রুষ্ট হয়ে দণ্ড বিধান করলেন!'

মৃদু হেসে রাণা বললে, 'কিছুই না রাওজী। তবে আপনি আমার সাজসজ্জার জাকজমক বাড়াবার জন্যে অনুরোধ করেছেন, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, সে জন্যে ঐ দুখানি গ্রামের বাড়তি আয় না পেলে তার খরচ কুলানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। আপনি তো জানেন আমার রাজ্যের আয় যেমন ব্যয়ও তেমনি। সুতরাং আপনার অভিলাষ পূরণ করার এ ছাড়া তো দ্বিতীয় কোন উপায় দেখি না।

রাণার একথা শুনে কোতারিওর চৌহান একেবারে চুপ। মাথা নুইয়ে সুড়সুড় করে সরে পড়ল সেখান থেকে।

রাজ্যের যাবতীয় খরচের জন্যে পৃথক পৃথক ভূমি নির্দিষ্ট ছিল। সেই সকল ভূমিকে 'থুয়া' বলা হত। প্রত্যেক থুয়ার ভার এক-একজন কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত ছিল। সে-সমস্ত কর্মচারীরা 'থুয়াদার' নামে পরিচিত হত। থুয়াদাররা নিজের নিজের আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করত প্রধান মন্ত্রীর কাছে। এর মধ্যে রাণা এক সময় একজন থুয়াদারের একখানি থুয়া আলাদা করে নিয়েছিল, কেন তার কোন কারণ জানা যায় না। রাণা একদিন তার সামন্ত সর্দারদের সঙ্গে বসোরা-গৃহে আহারে বসেছে, পরিবেশক একের পর এক সমস্ত খাদ্য পরিবেশন করছে। এক-সময় দই পরিবেশন করা হল। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউই চিনি নিয়ে এল না। রাণা কর্মাধ্যক্ষকে তিরস্কার করল এ জন্যে। তখন সে করযোড়ে রাণাকে নিবেদন করল, 'মহারাণা, মন্ত্রী মহাশয় বলছেন, চিনির জন্যে যে গ্রাম নির্দিষ্ট ছিল, তা মহারাজ স্বতন্ত্র করে নিয়েছেন।'

'ঠিক…ঠিক বটে' বলে চিনি ছাড়াই দই খেয়ে উঠে পড়ল রাণা।

সংগ্রাম যখন নাবালক তখন তার জননী রাজকর্ম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিল। প্রাপ্ত-বয়সে সংগ্রামসিংহ সিংহাসনে বসে। কোন

কারণে একসময়ে দেরিয়াবুর্দ সর্দারের বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছিল সে। রাণার কাছে কোন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পায় না, সকলেই জানত। দোষীর ওপর একবার শাস্তির আদেশ দিলে সহসা ক্ষমা করত না সে। এই কারণে দেরিয়াবুর্দ সর্দারের হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে সাহস করল না কেউ। বৃত্তিচ্যুত সর্দার বহু কষ্টে দুই বৎসর কাটিয়ে অবশেষে একদিন বন্দারীণদের (রাজপুত রমণীদের সহচরী) সাহায্যে একখানি পত্র পাঠাল রাজমাতার কাছে। আবেদন পত্রের মধ্যে সে দুই লক্ষ টাকার একখানি তমসুক পাঠিয়েছিল। সহচরীদেরও বহু অর্থ পুরস্কার দিয়েছিল সর্দার। মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে প্রতিদিন জননীকে প্রণাম করতে যেত রাণা। এক দিন সে মায়ের কাছে উপস্থিত হলে বৃত্তিচ্যুত সর্দারের বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে পুত্রকে অনুরোধ করল রাজমাতা। কাউকে কোন ভূসম্পত্তি দিতে হলে প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর কাছে নির্দেশ পাঠাত রাণা। যে দিন আদেশ দেওয়া হত তার আট দিন পরে দানপত্র হস্তান্তরিত করা হত। কারণ সেই আট দিনে দানপত্রের ওপর আটটি মোহরের ছাপ দেওয়া হত। মিবারে আটজন মন্ত্রী ছিল। যথা নিয়মে তারা আটদিনে আটজন স্বাক্ষর করত। এ মিবারের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু সংগ্রাম সিংহ সে-নিয়ম লঙ্ঘন করে সেই মুহূর্তেই সর্দারকে দানপত্র অর্পণ করতে প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ দিয়ে দিল। তখনি দানপত্র তৈরি করে রাণার কাছে আনা হল। মায়ের চরণে দানপত্রখানি রেখে রাণা বললে, 'সর্দারকে এটা দিয়ে তমসুকখানা ফেরৎ দিও।'

পরদিন এক ঘণ্টা আগেই আহারের আয়োজন করতে নির্দেশ দিল রাণা। কিন্তু সেদিন আর মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল না সে। সবাই অবাক হল। সেদিন গেল, পরদিনও গেল, এমনিভাবে আরও অনেকদিন চলে গেল, পুত্রের আর দর্শন পায় না রাজমাতা। শেষে রাণার কাছে লোক পাঠাল সে। রাণাও বিনীতভাবে উত্তর পাঠাল, 'আমার অবসর অল্প, কাজেই যেতে পারছিনে।'

পুত্রের বিরাগ দেখে ভীত হল রাজমাতা। নানা ভাবে পুত্রকে প্রসন্ন

করার চেষ্টা করল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। শেষে তীর্থ যাত্রায় যাওয়ায় ইচ্ছে প্রকাশ করল সে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল সব। সংগ্রাম-জননী ভেবেছিল বিদায়-বেলায় পুত্র হয়তো সামনে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু না, সংগ্রাম এল না। অগত্যা বিষন্ন মুখে তীর্থ যাত্রায় বেরুলো। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের জন্যে মথুরার দিকে যাত্রা করল। বাহকরা জয়পুরের পাশ দিয়ে শিবিকা নিয়ে চলেছে। জয়পুর তার জামাতার রাজ্য। জামাতার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছায় জয়পুরে প্রবেশ করতে বাহকদের আদেশ করল। খবর পেয়ে জামাতা জয়সিংহ অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল। তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে কিছুক্ষণের জন্য শিবিকা কাঁধে ধরল সে। রাজপুতদের এ এক চিরকালের প্রসিদ্ধ নিয়ম। শাশুড়ীমাতার মুখে পুত্রের কথা শুনে জয়সিংহ তাকে প্রবোধ দিল, 'আপনি নিশ্চিন্তে তীর্থযাত্রায় যান। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি ফিরে এলে আমি উদয়পুরে গিয়ে রাণাকে শান্ত করব।'

নানাতীর্থ ঘুরে আবার অম্বরে ফিরে এসে জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে উদয়পুরে এল রাজজননী। রাজপুতদের মধ্যে অতিথি সৎকারের নিয়ম বড় কঠোর। আতিথেয়তার সামান্যমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি মহা অপরাধের সমান। অম্বররাজ জয়সিংহ কি অভিপ্রায়ে আজ উদয়পুরে আসছে তা বুঝতে সংগ্রামের দেরি হল না। সে জানত, ভগ্নীপতির কোন অনুরোধই এড়াতে পারবে না, তাহলে অতিথি অবমাননার দায়ে সে অভিযুক্ত হবে। তাই আগে থেকেই সে-বিষয়ে প্রস্তুত হয়েছিল সংগ্রাম। ভগ্নী-পতিকে অনুরোধ করার অবকাশ না দিয়েই আগে গিয়ে মায়ের চরণে প্রণাম করল। মায়ের ঐ আচরণে মনে সে একটু ব্যথা পেয়েছিল, তা যেমন কাউকে কোনদিন বুঝতে দেয়নি আজ তার কাছে আশীর্বাদ নিতে যাওয়ার কথাও তাই কেউ জানতে পারল না। সকলেই বুঝল, জয়সিংহকে যথাবিহিত সম্মান দেখানোর জন্যে রাণা রাজভবন থেকে বের হল। কিন্তু রাণা প্রথমে সে দিকে না গিয়ে সোজা মায়ের শিবিকার দিকে এগিয়ে গেল। মাকে প্রণাম করে, তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাজভবনে পৌঁছে দিয়ে এল

রাণা। তারপর এসে জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। সময়ান্তরে এ সম্পর্কে রাণার মুখ থেকে একটি মাত্র কথাই শোনা গিয়েছিল, 'ঘরের কথা ঘরের মধ্যে থাকাই উচিত। পরের কাছে প্রকাশ করা নীতি বিরুদ্ধ।'

একদিন দুপুরে আহারে বসেছে রাণা, এমন সময় খবর এল, মালবের পাঠানরা মুন্দীসরের অন্তর্গত কতকগুলো গ্রাম লুঠতরাজ করেছে। এখন নাকি তারা মিরার আক্রমণের জন্যে এগিয়ে আসছে। আর খাওয়া হল না। সঙ্গে সঙ্গে রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নাগরা-ধ্বনি করতে নির্দেশ দেওয়া হল। দারুণ ঝঙ্কারে নাগারা বাজতে লাগল। সর্দাররা সাজ-সাজ রবে বেরিয়ে এল। হঠাৎ এই যুদ্ধ-ঘোষণায় সবাই অবাক। তখনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাসাদের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে সমবেত হল সব। রাণা তাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ করল, কিন্তু সর্দাররা বাধা দিয়ে বললে, 'মহারাজ সামান্য একটা শত্রুকে দমন করার জন্যে আপনার যাওয়ার কি প্রয়োজন। এই তুচ্ছ ব্যাপারে আপনি বিচলিত হলে আপনার গৌরব-হানি হবে।'

রাণা সর্দারদের কথা ঠেলতে পারল না। সব সর্দাররা রণ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে কানোড়ের সর্দার রণ-বেশে উপস্থিত হল। তার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন, পাণ্ডু। চোখে জ্যোতি নাই। তবু রাজ-আজ্ঞা পালন করার জন্যে সে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে বলে এসেছে। তার দেহের অবস্থা দেখে রাণা তাকে বারবার নিষেধ করল, 'আপনার এই দেহে যুদ্ধে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

'—যতক্ষণ হাতে তরবারি ধরার ক্ষমতা আছে ততক্ষণ এ বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনা। তাতে আমার অধর্ম হবে, অমঙ্গল হবে মহারাজ। আমাকে যেতে দিন।'

রাণা আর বাধা দিতে পারল। সে-যুদ্ধে মিরারের যোদ্ধারা জয়ডঙ্কা বাজিয়েই ফিরে এসেছিল, কিন্তু কানোড় সর্দার আর ফেরেনি। রাজভক্ত কানোড় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। সর্দাররা আনন্দে হর্ষ-ধ্বনি করতে করতে রাজধানীতে ফিরে এল। রাণার মুখে কিন্তু ফুল্লের হাসি

নেই। পাণের বীরা হাতে অপেক্ষা করছে কনোড় সর্দারের পুত্রের জন্যে। নিহত কানোড় সর্দারের আহত পুত্রকে নিজের হাতে বীরা প্রদান করল রাণা। এই নিদারুণ শোকের মুহূর্তেও আনন্দের অশ্রু ঝরেছিল সর্দার-পুত্রের চোখে।

—'মহারাজ, আজ আমি পিতার জীবনের বিনিময়ে এক অমূল্য রত্নের অধিকারী হলাম। আমার মত ভাগ্যবান ক'জন আছে?'

পাঠানদের পরাজিত করে ফিরে আসার দিনই এক চাটুকার শালুম্‌ব্রা সর্দারের বিরুদ্ধে রাণার কাছে কি একটা বলতে গিয়েছিল। রাণা তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'তোমার সব ধারণাই ভুল। শালুম্‌ব্রা আমাকে অন্তর থেকে ভক্তি করে, সে কথা আমি জানি।'

চাটুকার বললে, 'মহারাণার এই জানায় বোধহয় কিছু ক্রটি আছে।'

রাণা আর কোন কথা না বাড়িয়ে শালুম্‌ব্রাকে ডেকে পাঠাল। শালুমব্রা সর্দার তখনও তার বাড়িতে প্রবেশ করেনি। স্ত্রীপুত্র কন্যারা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। শালুম্‌ব্রা সবে এসে উপস্থিত তাদের সামনে। ছেলে মেয়েরা আনন্দে নেচে উঠেছে। শান্ত সমাহিত স্ত্রী স্বামী সন্দর্শনের জন্যে প্রটিতি মুহূর্ত অধীর হয়ে কাটিয়াছে। এমন সময় রাণার প্রতিহারী এসে একখানা চিঠি হাতে দিল শালুম্‌ব্রার। পত্রখানা পড়েই আবার ঘোড়ায় চেপে বসল সর্দার। স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা হলনা, পুত্র-কন্যাদের মুখ শুকিয়ে গেল। শালুমব্রা মাত্র দুজন অশ্বারোহী নিয়ে রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হল। রাত তখন অনেক। রাণা তাদের আগমন সংবাদ পেয়ে সকলের জন্যে আহার্য তৈরি করে পাঠিয়ে দিল। সে-রাত রাজপ্রাসাদের এক ঘরে বিনিন্দ্র ভাবে কাটল। পরদিন সকালে রাণা রাজসভায় এসেই শালুমুব্রাকে বললে, 'আপনার ওপর আমি খুব খুশী হয়েছি, আপনাকে আমি একটি জমিদারী উপহার দিলাম।'

হঠাৎ রাণার এ রকম অনুগ্রহের কোন কারণ খুঁজে পেল না শালুম্‌ব্রা। গম্ভীর হয়ে বিনীত ভাবে বললে, 'মহারাজ এমন কি কাজ

করেছি আমি যার জন্যে আপনি আমাকে এই পুরস্কার দিচ্ছেন! যদি কোন অসাধ্য সাধনও করে থাকি তার জন্যেও কোন পুরস্কার আমার প্রাপ্য নয়। কারণ সে-ও আমার কাজের মধ্যে। তাই আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনার এ উপহার আপনি ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন।'

কিন্তু রাজা যখন বারবার তার আগ্রহ দেখাতে লাগল তখন শালুমব্রা-সর্দার বললে, 'এ ক্ষেত্রে আপনার দান একেবারে গ্রহণ না করা আপনার অসম্মান হবে। তাই আমি এক প্রস্তাব করছি, আজ রাত্রে আমরা যখন রাজপ্রাসাদে এসে অবস্থান করছিলাম তখন মহারাণা স্বয়ং যেমন আমাদের আহার্য পাঠিয়েছিলেন ভবিষ্যতে আমি বা আমার কোন বংশধররা যদি রাত্রিকালে রাণার প্রসাদে আহূত হন তবে যেন তাদের জন্যেও এই ধরনের আহার্যের ব্যবস্থা করা হয়।'

রাণা প্রীত হয়ে তার অনুরোধে সম্মতি দিল। সেই দিন থেকে চণ্ডর বংশধররা ঐ সম্মান পেয়ে আসছে।

সংগ্রামসিংহর মহান চরিত্রের এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তার আঠারো বৎসর রাজত্বকালে আঠারোটি যুদ্ধবিগ্রহ লিপ্ত থাকতে হয়েছিল। সংগ্রামসিংহ পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাত না, দেশের ভিতরে প্রজারা সুখে শান্তিতে বাস করবে এই ছিল তার ইচ্ছা। এবং সে দিক থেকে রাণা দেশের এবং প্রজাদের অনেক মঙ্গল সাধন করেছিল। একারণে স্বদেশে বিদেশে সম্মান লাভ করেছে সে। বাপ্পা বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাণা এই সংগ্রামসিংহ। তার মৃত্যুর পর থেকে মারাঠাদের নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু হয়।

রাণার চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় জগৎসিংহ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসল। দ্বিতীয় অমরসিংহ রাজস্থানের তিন প্রধান শক্তিকে একত্রিত করার যে প্রয়াস করেছিল অজিতসিংহর নির্বুদ্ধিতার জন্যে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। জগৎসিংহর চেষ্টায় আবার তারা একজোট হল। সবাই শপথ করল, মুসলমানদের সঙ্গে কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ রাখবে না, এবং এ

একতার বন্ধন কোন কারণেই তারা ছিন্ন করবে না। মিবারের হুরলা নামে এক শহরে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই ত্রিশক্তির প্রধান নায়কের মর্যাদা দেওয়া হল মিবারের রাণাকে। তারই হাতে সমস্ত রাজপুত সৈন্যর অধিনায়ত্ব দেওয়া হল। এরপর সৈন্য-সংগ্রহর কাজ চলতে লাগল। সামনে বর্ষাকাল। সবাই মিলে ঠিক করল, দারুণ বর্ষার মধ্যে মোগলের বিরুদ্ধে অভিযান করা হবে। সব আয়োজনই প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আয়োজন আর কাজে লাগনো গেল না। আবার ত্রিশক্তিতে ভাঙ্গন ধরল। ক্ষমতার কাড়াকাড়িতেই এত উদ্যোগ এত আয়োজন সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। মোগলের অধঃপতনের সুযোগে অম্বর ও মারবারের রাজারা যথেষ্ট ক্ষমতা অর্জন করে মিবারের সমকক্ষ হয়েছিল। রাজা কনকসেনের আমল থেকে সারা রাজবারায় মিবার সব দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে আসছে। এ জন্যে এত কাল ধরে অন্যান্য রাজাদের মধ্যে এক চিরকালীন ঈর্ষার আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছিল। এতদিন পরে অম্বর এবং মারবার ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে, তাই মিবারের একাধিপত্য তারা আর মানতে রাজি না। নিজেদের মধ্যে এই ধরনের দলাদলির জন্যে, মোগল সাম্রাজের অধঃপতনের অপূর্ব সুযোগ সামনে থাকা সত্বেও, নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারল না তারা।

নিজাম-উল-মুলুক মোগলের অধীনতা ছিন্ন করে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। মোগল সেনাপতি মেবারিজ খাঁ নিজামের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। নিজাম আগে মোবারিজ খাঁর সৈন্য বাহিনীতে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে যখন কোন কাজ হল না তখন সম্মুখ-সমরে নেমে পড়ল সে। তার মত যোদ্ধার সামনে মোবারিজ খাঁ অসহায় পতঙ্গের মত সদলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চতুর নিজাম মোবারিজের মুণ্ডটা দিল্লীতে পাঠিয়ে বাদশাহকে বলে পাঠাল, 'দুর্বৃত্ত রাজদ্রোহী হয়েছিল, তাই তার মাথাটা কেটে আপনার চরণে পাঠালাম।'

মহম্মদশাহ নিজামের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। কিন্তু এর প্রতিফল দেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারল না। এ দিকে নিজাম রাজপুতদের

সঙ্গে দোস্তি করে ফেলল। এবং মালব ও গুর্জর আক্রমণ করার জন্যে মারাঠিদের উৎসাহিত করতে লাগল। তার উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে মারাঠি-যোদ্ধা বাজিরাও প্রথমে মালব আক্রমণ ক'রে সেখানকার মোগল শাসনকর্তা দয়ারাম বাহাদুরকে (মালবের আগের শাসনকর্তা, গিরিধর সিংহর ভ্রাতুস্পুত্র) নিহত করে নিজামের ইচ্ছা-পূরণ করল। অম্বরের রাজা জয় সিংহর হাতে তুলে দেওয়া হল মালবরাজ্য। কিন্তু জয়সিংহ নিজে না রেখে বাজিরাওকেই তা দিয়ে দিল। এই ভাবে দুর্ধর্ষ মারাঠিদের হাতের মুঠোয় চলে গেল মালব। এর পরে গুর্জর রাজ্যেরও সেই দশা ঘটল। এর আগে মোগল বাদশাহ অজিতসিংহকে গুর্জর রাজ্যটি দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখনকার বাদশাহ সে-চুক্তি নাকচ করে দিয়ে আবার যখন গুর্জর ফিরিয়ে নিতে চাইল তখন অজিতসিংহর পুত্র অভয়সিংহ গুর্জর আক্রমণ করে সেখানকার শাসনকর্তা শির বুলান্দখাঁকে বিতাড়িত করে দিল। এই সুযোগে মারাঠিরা গিয়ে গেড়ে বসল সেখানে। রাঠোররাজ অভয় সিংহ সে-দিকে দৃকপাত করল না, সে শুধু উত্তর দিকের অঞ্চলটুকু নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্যে এই রকম সংঘর্ষ চলছে, এদিকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় একাধিপত্য করছে সুজাউদ্দোলা এবং তার প্রতিনিধি আলিবর্দি খাঁ। অযোধ্যায় সৈদতখাঁর পুত্র সফদরজঙ্গ শক্ত ভাবে ঘাঁটি তৈরি করতে লাগল। মোগল বাদশাহর ইচ্ছা অনুসারেই অযোধ্যায় সার্বভৌম নবাব হয়েছিল সৈদত খাঁ। বাদশাহর এই বদান্যতার প্রতিদান দিয়েছিল সে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিষ্ঠুর নাদির শাহকে অভ্যর্থনা করে ডেকে এনেছিল সে। আর তারই ফলে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হয়ে গেল।

মালব এবং গুর্জর অধিকারে এসেছে, এবার মারাঠিরা নর্মদা পার হয়ে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে পঙ্গপালের মত সারা উত্তরাঞ্চল ছেয়ে ফেলল তারা। হোলকার, সিন্ধিয়া এবং পুয়ার এদের মধ্যে বিখ্যাত। এদের অসীম তেজের সামনে

রাজপুতরাও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না। সারা দেশ লুঠপাট করে তছনছ করে ফেলল। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে বাজিরাওর অধিনায়কত্বে মারাঠি সৈন্যরা দিল্লীর তোরন-দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। সুরোম্য দিল্লী নগরী ভঙ্গে চুরমার করে ফেলতে লাগল তারা। প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল লোকে। অবশেষে বাজিরাওকে প্রচুর টাকা চৌথ দিয়ে অব্যাহতি পেল। বাদশাহর এই কাপুরুষের মত ব্যবহার দেখে নিজামের মনেও ভয় ঢুকে গেল। বাদশাহকে পরাজিত করে শেষে বুঝি তার রাজ্যও আক্রমণ করে বসবে সে! এই আশঙ্কা করে মালব থেকে মারাঠিদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করতে লাগল। মালবে যদি মারাঠিরা শক্ত করে ঘাঁটি তৈরি করে ফেলে তবে আর তাদের সেখান থেকে তাড়ানো যাবে না। তা হলে উত্তর ভারতের সঙ্গে তার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে। সুতরাং আর দেরি না করে তখনি মালব আক্রমণ করে বাজিরাওকে পরাজিত করে মালব মারাঠি-শূন্য করে ফেলল নিজাম।

ঠিক এই সময় খবর এল, দুর্জয় নাদিরশাহ ভারত আক্রমণ করেছে। নিজাম শঙ্কিত হল। মালব ছেড়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এল নিজাম। নাদিরের প্রচণ্ড তুর্যনাদে সারা মোগল সাম্রাজ্য থরথর করে কাঁপতে লাগল। মহম্মদশাহ আশা করেছিল এই দারুণ বিপদের দিনে রাজপুতরাই তার পাশে এসে দাঁড়াবে। মোগল সাম্রাজ্যের এই বিশাল বিস্তার লাভের জন্যে দায়ী একমাত্র রাজপুতরা। অন্য সব বড়ঝাপটা থেকে মোগল সাম্রাজ্যকে এতদিন রক্ষা করেও এসেছে এই রাজপুতরা। তাই মহম্মদ শাহর আশা ছিল. এ বিপদেও রাজপুতরাই এগিয়ে আসবে, তারাই বাঁচিয়ে রাখবে মোগল বাদশাহর গদি। কিন্তু তা আর হল না। একজন রাজপুতও আর এল না সাহায্য করতে। ফলে কর্ণালের যুদ্ধে মোগল বাদশাহর ময়ূর সিংহাসন নাদির শাহর অধিকারে চলে গেল। কর্ণাল-যুদ্ধের শোচনীয় পরিণাম দেখে নিজাম ও সৈদতখাঁর মনে দারুণ ভয় ধরে গেল। নাদিরের ভয়ঙ্কর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে মোগল সেনাপতিকে সাহায্য করতে লাগল কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। আমির-উল-ওমরা

নিহত হল। নিরুপায় হয়ে নিজামকে দূত করে নাদিরের কাছে পাঠানো হল। সন্ধির সর্ত ঠিক হয়ে গেল। নাদিরকে মন্ত্রণা দিল সৈদত, 'নিজাম আপনাকে ঠকাচ্ছে, রাজভাণ্ডারে প্রচুর ধনরত্ন আছে, আপনাকে তার সামন্যই তারা দিতে চায়। যে অর্থ আপনাকে ওরা দিতে চায় তা নিজাম একাই দিয়ে দিতে পারে। তার জন্যে মোগল-রাজকোষে হাত দিতে হবে না।'

সৈদতএর কথা শুনে নাদিরের লোভ গেল বেড়ে। সন্ধি বাতিল করে দিল। বাদশাহর কাছে কোষাগারের চাবি চাইল সে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে নাদিরের নামাঙ্কিত মুদ্রা চালু করা হল দেশে।

মোগল সাম্রাজ্যের ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের ফলে প্রচুর ধনক্ষয় হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অতুল ঐশর্য ছিল। কিন্তু পাষণ্ড নাদিরের তাতে মন উঠল না। চারদিকে ঘোষণা করে দিল, আরও আড়াই কোটি টাকা না পেলে সে ভারত ছেড়ে যাবে না। যে ভাবেই হোক এই টাকা সংগ্রহ করবে সে। ঘোষণা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে নাদিরের পারসী সৈন্যরা দেশ-নগর লুঠ-পাঠ করতে লাগল। তাদের পাশবিক অত্যাচারে হাহাকার পড়ে গেল চারদিকে। যে যেদিকে পারল পালিয়ে পাণরক্ষা করতে চাইল। কিন্তু পালাবে কোথায়, যম আছে পিছে। সেই পৈশাচিক অত্যাচার উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে এমন বীর তখন কেউ ছিল না। শুধু যে নিরীহ দেশের লোকের ধনরত্ন কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল তা না, বাড়ির মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করল তারা। প্রজাদের জীবন, ধন, মানমর্যাদা শত্রুর পায়ের তলায় দলিত হয়ে গেল। যারা সম্ভ্রান্ত, শত্রুর হাতে মান-ইজ্জৎ বিকিয়ে দেওয়ার আগে, সপরিবারে আত্মহত্যা করল। আর যারা তা পারল না, ধনরত্ন সহ ঘরের মেয়ে-বৌকে ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হল।

এই সময় জনরব উঠল, নর-রাক্ষস নাদিরশাহর মৃত্যু হয়েছে। দেখতে দেখত হাজার হাজার নাগরিক উন্মত্ত হয়ে তরবারি হাতে ধরে বেরিয়ে এল। প্রাণের মমতা করল না কেউ। পাষণ্ডদের প্রতিফল দেবার জন্যে সবাই এক-জোট হয়েছে। নাগরিক এবং পারসীদের মৃতদেহে পথ ঘাট

ছেয়ে গেল। রক্তের স্রোতে পথের ধুলো কাদা হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর গেল নাদিরশাহর কাছে। দুর্বৃত্ত নাদির একটি মসজিদের চূড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে নিজের সৈন্যদের উৎসাহিত করতে লাগল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা যাকে পাবে তাকেই হত্যা করবে, এই আদেশ পাওয়ামাত্র নাদিরের সৈন্যরা অসহায় সাধারণ নাগরিকদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল। নর-নারীর মর্মভেদী আর্তনাদ আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। এ দিকে নাদিরের সৈন্যরা দিল্লীর প্রতিটি গৃহে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের লেলিহান শিখার ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল জীবন্ত, মৃত, অর্ধমৃত নরনারীকে। শ্মশানের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দিল্লী নগরী। সেই বীভৎস, শোকাবহ কাণ্ডের মধ্যে যদি স্বল্পক্ষণের জন্যেও ও কোন প্রীতিকর দৃশ্য ঘটে থাকে তা শুধু সৈদতখাঁর শোচনীয় পরিণাম।

এই সময় নাদিরশাহ পাষাণ্ড সৈঙ্গৎখাঁর মন্ত্রীকে নির্দেশ দিল, 'তোমার এবং সৈদতের যা কিছু ধনসম্পত্তি আছে তার প্রকৃত তালিকা পেশ কর আমার কাছে।'

নিজাম আড়াই কোটি টাকা মুক্তিপণ দিতে চেয়েছিল। বিভীষণ সৈদতখাঁ সে পণ গ্রহণ না করতে মন্ত্রণা দিয়েছিল নাদিরকে। এখন সৈদতখাঁর কাছ থেকেই আড়াই কোটি টাকা চেয়ে বসল নাদির। চোখে অন্ধকার দেখল সৈদত। নিজের পায়ে নিজেই যে সে কুড়োল মেরেছে, এতদিনে বুঝতে পারল। কোন দিকে কোন কুলকিনারা করতে পারল না লোকটা। শেষে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হল তাকে। তার দেওয়ান মজলিশরাও-ও তার পথ অনুসরণ করে নাদিরের কোপ থেকে অব্যাহতি পেল। এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে নরখাদক নাদির মহম্মদশাহর সন্ধি-প্রস্তাব অনুয়ায়ী যথা-সর্বস্ব নিয়ে শ্মশান-সদৃশ দিল্লী ছেড়ে স্বদেশে চলে গেল। সন্ধির সর্তানুসারে কাবুল, টাট্টা, সিন্ধু ও মুলতান প্রভৃতি পশ্চিমের রাজ্যগুলো নাদিরের অধিকারে গেল।

নাদিরের অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর মনোবল, চরিত্রবল এবং ধর্মবলের সমাধী হয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষা এবং আত্মচিন্তাই তখন লোকের

ধ্যান জ্ঞান। দয়া মায়া মমতা ভালবাসা মানব মনের এই সব সুকুমার বৃত্তিগুলা একেবারে মরে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সারা দেশটাই অবনতির অতলে তলিয়ে যেতে লাগল, আর উঠতে পারল না।

এই ধরনের মহা সংঘর্ষের মধ্যেও কিন্তু রাজপুতরা নিজের নিজের রাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। আজও বৃটিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তারা বেশ নিশ্চিন্তে রাজ্য ভোগ করে আসছে। দশম শতাব্দীতে দুর্ধর্ষ মহম্মদ গজনন যখন মিরার আক্রমণ করেছিল তখন এর রাজ্য-সীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল আজ সাতশো বছর পরেও সে সীমা এতটুকু সঙ্কুচিত হয়নি। বুন্দি, আবু, ইদর দেবল প্রভৃতি কতকগুলো করদরাজ্য হাত ছাড়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে মিবারের প্রাচীন সীমার বিশেষ কোন হের ফের হয়নি।

পশ্চিমে গাদবার, উত্তরে আরাবল্লীর দুর্ভেদ্য পাহাড়, পূর্বে চম্বলনদ এবং এবং দক্ষিণে মালব এই ছিল মিবারের সীমা। লম্বায় একশো চল্লিশ এবং চওড়ায় একশো ত্রিশ মাইল। প্রায় দশহাজার গ্রাম-নগর নিয়ে এই মিবার। মিবারের মাটির স্তর উর্বর।

কুচক্রী মন্ত্রীদের কথায় যেদিন সম্রাট মহম্মদশাহ রাজস্বের চার ভাগের একভাগ মারাঠিদের হাতে তুলে দিল সেদিন থেকে বিশাল রাজবারায় ওদের প্রভুত্বের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। এ ঘটনা ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দের। রাজস্থান মোগল বাদশাহর অধীন, সেই মোগলবাদশাহর কাছ থেকেই যখন চৌথ আদায় হল তখন তার অধীনের রাজাদের কাছ থেকে পণ আদায় করা এমন কি শক্ত। যার বিরুদ্ধেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সেই তাদের পায়ের কাছে মাথা নত করে চৌথ দিতে রাজি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে রাজপুতরা আর কত শক্তি ধরে, তাদের কাবু করতে মারাঠিদের তেমন কিছু বেগ পেতে হবে না, এই রকম একটা ধরণা বদ্ধমূল ছিল ওদের।

জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে মারাঠিরা প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করতে থাকল, এবং ধীরে ধীরে জয়লাভও হতে লাগল। এ দিকে রাজপুতদের মনেও বেশ ভয় ধরে গেল। আবার তারা একজোট হওয়ার জন্যে জড়ো হল। তাদের চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে

এই একতা গড়ে উঠল। রাণা মারবারের উত্তরাধিকারী বিজয়সিংহর হাতে কন্যা সম্প্রদান করল। মারবার এবং অম্বরের মধ্যে যে এতদিনের বিবাদ ছিল তার মীমাংসা হয়ে গেল জগৎসিংহর মধ্যস্থতায়। কিন্তু এক জোট হওয়াতেও তেমন কোন লাভ হল না। শত্রুতা হাড়েমাসে জড়ানো, সে বস্তু কি হঠাৎ কোন এক মীমাংসায় উবে যায়।

মারাঠিরা মালব অধিকার করে নিল। সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে চৌথ সংগ্রহ করতে লাগল। এদিকে বাজিরাও সসৈন্যে মিবার আক্রমণ করল। সারা মিবার ভয়ে কাঁপতে লাগল। রাণা বাজিরাওর সঙ্গে দেখা করল না। প্রধানমন্ত্রী বিহারী দাস ও শালুম্ব্রা সর্দারকে তার কাছে পাঠানো হল। মন্ত্রী বিহারী দাসকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যে ক'টি চিঠি লিখেছিল রাণা তা থেকে দুখানি এখানে উদ্ধার করে দেওয়া হল।

'স্বস্তিশ্রী ঃ মন্ত্রিপ্রবর পাঞ্চোলীজি! আমার জহর (নিম্নপদস্থের প্রতি উচ্চপদস্থের সম্ভাষণ) জানবেন। আমি সর্বদাই আপনার চিন্তা করি। দাক্ষিণাত্য বাপারে আপনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ যদি অনিবার্য হয় তবে তা যেন দেবল জনপদের ওদিকে হয়। সৈন্য-সংখ্যা কমিয়ে দেবেন। ভগবানের আশীর্বাদে টাকার অভাব হবে না। গত বছরের মত রামপুরের বন্দোবস্ত করবেন। দৌলতসিংহকে জানাবেন, এমন সুবিধে আর মিলবে না। জননী এখন অসুস্থ। গারারো ও গজমাণিক যুদ্ধে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে, এবং সুন্দর গজ হাজার রকমের কৌশল দেখিয়েছে। আপনার অনুপস্থিতির জন্যে বিশেষ দুঃখিত। এখন শোভারামকে কি ভাবে পাঠাবো? ইতি—৬ই আষাঢ়, সংবৎ ১৭৯১ (১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ)।'

'এতে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। অতএব তাদের প্রাপ্য টাকার তালিকা এবং কতকগুলো সাক্ষ্য পাঠাবেন। বাজিরাও এসেছে। জমি ছাড়াও সে আমার কাছে থেকে প্রচুর পণের টাকা আদায় করে নিজের প্রতিপত্তি দেখাতে চায়। অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে আমার রাজ্য থেকে বিশ

গুণ টাকা দাবি করেছে। যদি নিয়মিত হয় রাজি হতে পারি। গতবছর মূলহর এসেছিল। সে তো বাজিরাওএর চেয়েও শক্তিমান, ভগবান যদি আমার সহায় থাকেন তবে সে আমার জমি কেড়ে নিতে পারবে না। আর আর সব দেবীচাঁদের কাছে জানবেন। ইতি, বৃহস্পতিবার, ১৭৯২ সংবৎ।'

এদিকে বাজিরাওকে কি ধরনের সম্মান জানানো হবে তাই নিয়ে মহা গণ্ডগোল শুরু হল। নানা তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল, রাজসিংহর পুত্র ভীমসিংহর বংশধর যে আসনে বসে সে-আসন দেওয়া হবে বাজিরাওকে। পরে এই আসনটিতে বসত বৃটিশের এজেন্ট।

বাজিরাওর সঙ্গে কয়েকটি সর্তে সন্ধি হল। নিয়মিত বার্ষিক এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা কর দিতে রাজি হল রাণা। এই সন্ধির সর্ত অনুসারে দশ বছর ধরে ঐ হারে কর গ্রহণ করেছিল মারাঠিরা। কিন্তু আর তারা সে সর্ত মেনে চলল না। মিবারের সবটুকুই তারা গ্রাস করতে চায়।

ত্রিশক্তি সম্মেলনের সময় রাণা অমরসিংহ অম্বররাজ জয়সিংহর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিযেছিল। তখন সর্ত ছিল। অগ্রজ হোক আর নাই হোক তার পুত্রই রাজা হবে। অম্বররাজ এ সর্তে রাজি হয়েছিল। কিন্তু জয়সিংহর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরীসিংহ রাজা হল। অমরসিংহর ভাগিনেয় মধুসিংহকে সিংহাসনে বাসানোর জন্যে রাণা অম্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করল। কিন্তু সে-যুদ্ধে মিবারের সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে চলে এল। যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে রাণা সৈন্য সামন্তদের তিরস্কার করে বলেছিল, 'শিশোদীয়ের এতদিনের সম্মান গৌরব একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সৈন্য সামন্তর হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কি লাভ।' এই বলে গিহ্লোট বংশের সেই প্রকাণ্ড অসি নামিয়ে নিয়ে এসে এক বারাঙ্গনার হাতে তুলে দিয়ে রাণা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'মিবার দিন দিন যে অধঃপতনের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় এ অস্ত্র রমণীরই ব্যবহার্য।'

গত যুদ্ধে কোটা ও বুন্দির হাররা রাণার সহায় হয়েছিল। তার উপযুক্ত প্রতিফল দেবার জন্যে আপজি সিন্ধিয়ার সহযোগিতায় তাদের

আক্রমণ করল ঈশ্বরীসিংহ। হাররা সে আক্রমণ ব্যর্থ করে দিল। সে যুদ্ধে আপাজী সিন্ধিয়ার একটি হাত কাটা পড়েছিল। যুদ্ধে দুপক্ষেকেই কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। দুই রাজাই সিন্ধিয়াকে তুষ্ট করার জন্যে কিছুকিছু কর দিতে স্বীকার করল। তুষের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করতে লাগল রাণা। মূলহররাও হোলকারের সাহায্য চাইল শেষে। সর্তে ঠিক হল, হোলকার যদি ঈশ্বরীসিংহকে রাজ্যচ্যুত করতে পারে তবে রাণা চৌষট্টি লক্ষ টাকা পণ দেবে। এ সংবাদ ঈশ্বরীসিংহর কানে যেতেই হতভাগ্য নিরুপায় হয়ে বিষ খেয়ে আত্ম-হত্যা করল। এরপর অম্বরের সিংহাসনে বসল মধুসিংহ। হোলকার আপনার প্রাপ্য টাকা নিয়ে সমগ্র রাজবারা প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করল। রাজপুতদের শোচনীয় অধঃপতনের এইটেই প্রধান কারণ। এই জন্যেই শিশোদীয়, রাঠোর, কুশাবহরা দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতে থাকল।

রাণা জগৎসিংহ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইহালোক ত্যাগ করল। আঠারো বৎসর রাজত্ব করেছিল সে। শিশোদীয় কুলের সে অযোগ্যতম রাজা। হাতীর লড়াই দেখে বৃথা সময় নষ্ট করত। মারাঠিদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেয়ে ক্রীড়াযুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকাই শ্রেয় মনে করত। তার একমাত্র গুণ, সে শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। যে সব আলস্য ও বিলাস-ব্যঞ্জক উৎসব অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আজও মিবারে চলে আসছে তার প্রায় সবগুলোই দ্বিতীয় জগৎসিংহর আমল থেকে চালু হয়।

১৪

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতাপসিংহ (দ্বিতীয়) মিবারের সিংহাসনে বসল। রাণা প্রতাপসিংহ ইতিহাসের এক জ্বলন্ত অধ্যায়। তার চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর এক কণাও ছিল না এই দ্বিতীয় প্রতাপের মধ্যে। তার তিন

বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ সে করে যেতে পারেনি যে কারণে লোকে তাকে মনে রাখবে। এই তিন বৎসরের মধ্যে মারাঠিরা পরপর তিনবার আক্রমণ করেছিল মিবার। সত্যজী, জানকীজি এবং রঘুনাথরাও এই তিন যোদ্ধা ছিল মারাঠিদের নেতা। এদের সকলের কাছেই পরাজিত হয়ে প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্ধি করতে হয়েছিল প্রতাপকে। অম্বরের রাজা জয়সিংহর এক কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয় তার। অম্বর রাজকন্যার গর্ভে তার দ্বিতীয় রাজসিংহ নামে একটি পুত্র জন্মেছিল।

প্রতাপের রাজত্বের পর দ্বিতীয় রাজসিংহ রাণা হয়েছিল। সেও পিতার মত অপদার্থ। সেও মহারাণা রাজসিংহ নাম গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এর রাজত্বকাল সাত বৎসর। এই সাত বৎসরে মধ্যে উপর্যুপরি সাতবার মারাঠি আক্রমণে মিবারের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৮১২ সংবতে রাজাবাহাদুর, ১৮১৩ তে মূলহররাও হোলকার, ভিলিরাও, সদাশিবরাও বুনাজী যাদুন এবং ৮১৪ সংবতে রাণাজী বুর্তিয়ার অত্যাচারে দেশের প্রজারা সর্বস্বান্ত হয়েছিল। রাণার এমন আর্থিক দুরবস্থা হয়েছিল যে বিবাহের জন্যে একজন মন্ত্রীর কাছে টাকা ধার করতে হয়েছিল তাকে। রাঠোর রাজকুমারীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সাত বৎসর রাজত্ব করার পর রাজসিংহর মৃত্যু হল। এরপর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে বসল তার কাকা অরিসিংহ।

জগৎসিংহর চাঞ্চল্য, দ্বিতীয় প্রতাপের কাপুরুষতা এবং দ্বিতীয় রাজসিংহর অযোগ্যতা মিবারকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার উপর অরিসিংহর উগ্রতা আরও অনর্থ ডেকে আনল। এবং সেই অনর্থ থেকেই সর্বনাশ হল মিবারের। এর আগে মারাঠিরা মিবার আক্রমণ করে টাকা পয়সা ধনরত্ন প্রচুর নিয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু মিবার রাজ্যের কোন অঞ্চল তারা দখল করে নেয়নি। এবার অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ বুঝে মারাঠিরা কিছু কিছু অংশ মিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে লাগল। অরিসিংহর অত্যাচারে প্রজারা দারুণ ক্ষুব্ধ। মারাঠিরা প্রজাদের প্রাণের শুভানুধ্যায়ী সেজে নিজেদের কাজ হাসিল করতে লাগল।

প্রতাপকে রাজ্যচ্যুত করে তার কাকা নাথজীকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে মিবারের সর্দাররা মূলহররাও হোলকারকে ডেকেছিল। সে সুযোগে হোলকার মিবারের খানিকটা অংশ নিজের রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিল। এবার আরও মহা সুযোগ। এর সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেনি সে।

ভাগিনেয় মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে বসনোর ব্যাপারে মিবারের রাণাকে অনেক হাঙ্গামা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু মাতুলের উপকার ভুলে গিয়ে কৃতঘ্নের মত রামপুর জনপদটি মূলহররাও হোলকারকে দিয়ে দিল সে। রামপুর মিবারের একটি অংশ। মধুসিংহর মাতার বিবাহ উপলক্ষে মিবারের রাণা অম্বররাজকে যৌতুক দিয়েছিল। রামপুর হোলকারের অধীনে চলে যাওয়া সত্বেও এর খানিকটা অংশ বেশ কয়েক বছর মিবারের অধীনে ছিল। বাজিরাও মিবারের কাছ থেকে চৌথ ও দশমুখী পেয়ে আসছিল। এ সব আদায়ের ভার দেওয়া হল হোলকারের ওপর। রাণা যখন মধুসিংহকে অম্বর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হোলকারের সঙ্গে সন্ধি করেছিল তখন চৌষট্টি লক্ষ টাকায় রফা হয়েছিল। এবং এও ঠিক হয়েছিল যে, ঐ টাকা পেলে সে মিবারকে আর কখনও আক্রমণ করবে না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হোলকার সে-সব বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে আবার চৌথ চেয়ে বসল। রাণা আগের সন্ধির কথা তুলে চৌথ দিতে অস্বীকার করল। যে কোন উপায়ে রাজ্যবিস্তার এবং রাজ্যের ধনরত্ন বাড়ানোই মারাঠিদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ জন্যে মিথ্যাচার করতেও তারা কুণ্ঠিত না। রাজনীতি এবং ধর্মনীতি তাদের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। সুতরাং রাণার কথায় কর্ণপাত করল না হোলকার। পরপর কয়েকখানা পত্রে নানা রকম ভয় দেখাতে লাগল। শেষে চম্বলের তীরে বুদনু প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে বাকী-কর আদায়ের ছলে আবার তারা মিবার আক্রমণ করল। দুর্দান্ত হোলকার অন্তলা দুর্গ পর্যন্ত এগিয়ে আসায় অত্যন্ত ভীত এবং চিন্তিত হয়ে পড়ল রাণা।

মারাঠা দস্যুর আক্রমণে উদয়পুরও হয়তো ছারখার হয়ে যাবে, এই আশঙ্কায় একান্ন লক্ষ টাকা সহ বৈমাত্রেয় ভাইদের সঙ্গে কোরাবারের

অর্জুনসিংহকে হোলকারের কাছে পাঠাল। এই টাকার বিনিময়ে অন্তলায় বসে হোলকার সন্ধি করল রাণার সঙ্গে। টাকাটা সংগ্রহ করতে মিবারের দারুণ দুরবস্থা ঘটল।

মিবারের যখন এই রকম দুর্দশা সে-সময় ভয়াল দুর্ভিক্ষ এসে গ্রাস করল দেশ। ১৮২২ সংবতে এই ঘটনা। সামান্য তুচ্ছ জিনিষও স্বর্ণ-মূল্যে কিনতে হত। এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে না পেতেই চার বৎসর বাদে আবার অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়ে গেল দেশে। সে সুযোগে মারাঠিরা আবার দেশ লুঠপাঠ করতে লাগল। শেষে ১৮২৭ সালে বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে মারাঠি দস্যুদের হাত থেকে মিবারকে রক্ষা করল রাণা।

সর্দাররা কেন বিদ্রোহ করেছিল তার পরিস্কার কারণ জানা যায় না। অনেকের ধারণা, মারাঠা অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে অক্ষম রাণাকে সিংহাসনচ্যত করার জন্যেই তারা বিদ্রোহী হয়েছিল। আবার কেউ বলে, সর্দার ও সামন্তরা পরস্পরে ঈর্ষান্বিত হয়ে এই অনর্থ বাধিয়েছিল। কিংবদন্তী শোনা যায়, রাণা অরিসিংহ অন্যায়ভাবে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছিল বলেই নাকি এই বিদ্রোহ। নানা কারণে চরিত্রহীন রাণার ওপর সন্দেহ করা যেতে পারে, কিন্তু সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিবারের চিরপ্রচলিত উত্তরাধিকারিত্ব বিধির বিপর্যয় ঘটলে দেশে নানা রকম অমঙ্গল এবং অনর্থের সৃষ্টি হয়। মিবারের সিংহাসনে বসার মত কোন অধিকারই অরিসিংহর ছিল না। বহু-কাল ধরে সে শিশোদীয় সর্দারদের নিচের আসনে বসে আসছিল। এবং শিশোদীয় কুলের রাজকুমার বলে বার্ষিক ত্রিশহাজার টাকার এক ভূমিবৃত্তি বরাদ্দ ছিল তাব জন্যে। যে-সব সর্দাররা এতকাল তার ওপরের আসনে বসে আসছিল হঠাৎ আজ তারা কি করে তার সামনে মাথা নত করবে! রাজোচিত সম্মানসম্ভ্রম কি ভাবে সে পেতে পারে তাদের কাছ থেকে! সেই থেকে অধিকাংশ সর্দাররাই তাকে ঘৃণা করতে লাগল। তার রুঢ়, অভদ্র আচরণ এতকাল তারা লক্ষ্য করে এসেছে। রাজার কোন গুণই

তার মধ্যে নেই। এ সবই সর্দাররা ভাল করে জানত। এ ছাড়া তার চরিত্রের কলঙ্কের দিকটাও খুব ভাল করে জানা ছিল তাদের। এক্ষেত্রে তাকে মহারাণার যোগ্য সম্মান দেখানো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হল না।

যে উদার-হৃদয় ঝালা সর্দার হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপের প্রাণ রক্ষা করে দেশের এবং দশের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল সেই সদ্রিপতি প্রধান সর্দারকে মিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল অরিসিংহ। এদিকে দেব-গড়-পতি যশোবন্ত সিংহকে অপমান করায় চিরদিনের জন্যে তার কোপে পড়ে রইল রাণা। যশোবন্তসিংহ বিক্রমশালী চণ্ডর বংশধর।

একেএকে সকলেরই বিদ্বেষভাজন হয়ে পড়ল অরিসিংহ। সর্দাররা তাকে পদচ্যুত করার চক্রান্ত করতে লাগল। রতনসিংহ নামে এক ব্যক্তিকে খাড়া করে মিবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা প্রচার করল। রতনসিংহ নাকি রাজসিংহর ঔরসে গোগুণ্ডা সর্দারের কন্যার গর্ভে জন্মেছিল। কিন্তু একথা কতটা সত্যি তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক, অরি-সিংহর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মিবারের ষোলজন সর্দারের বেশীর ভাগই রতনের পক্ষ সমর্থন করে অরিসিংহর বিরোধিতা করতে লাগল। শুধু শালুমব্রা, বিজোল্লি, অনৈত, গানোর ও বেদনোরের পাঁচজন সর্দার রাণার পক্ষে রইল। এর মধ্যে শালুমব্রা প্রথমে রতনের দিকে ছিল, কিন্তু পরে মত বদলে সে রাণার পক্ষ সমর্থন করেছিল। তার প্রধাণ কারণ, শক্তাবৎসর্দার রতনের পক্ষে ছিল। কিন্তু শক্তাবৎদের সঙ্গে শালুমব্রাদের চির-বিরোধ। শালুমব্রা ভেবেছিল, অরিসিংহর পক্ষ অবলম্বন করলে রাণার ওপর তার একাধিপত্য বিস্তারে সুবিধে হবে। যে-সব সর্দাররা রতনের পক্ষে ছিল তাদের মধ্যে ভিণ্ডির, দেবগড়, সদ্রি, গোগুণ্ডা, কৈলবারা, বৈদলা, কোতারিও কানোড়ের সর্দাররা পরাক্রান্ত।

বসন্তপাল নামে দেপ্রাগোত্রের এক ব্যক্তি রতনসিংহর প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হল। কমলমীর অধিকার করে সেখানে রতনসিংহকে মিবারের রাণা বলে অভিষেক করা হল। মিবারকে পুরোপুরি দখলে আনার অন্যকোন উপায় না দেখে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সিন্ধিয়ার সাহায্য নিল সে।

মিবারে যখন এই রকম ভয়ঙ্কর শোচনীয় অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়েছে সে-সময় এক রাজপুত মহাযোদ্ধা জলিমসিংহর আবির্ভাব হয়। জলিমসিংহ রাজপুতনায় বিশেষ করে মিবারে যে বীরত্ব, উদারতা, মহত্ব, তেজস্বিতা এবং রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল মুক্তকণ্ঠে তার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

মধুসিংহকে অম্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জগৎসিংহ ও ঈশ্বরীসিংহর মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। সে সময় সিন্ধিয়া মাধোজি কোটা আক্রমণ করে। জলিম এই যুদ্ধে মারাঠিদের রণনীতি খুব মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করেছিল। এবং পরে সেই নীতি অনুসরণ করেই তার জীবনের বাকী পঞ্চাশ বছর কাটিয়ে গেছে সে। কোন কারণে কোটা-রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে জলিমসিংহ এসে মিবারে আশ্রয় নিয়েছিল। অরিসিংহ তাকে সসম্মানে সর্দারদের মধ্যে জায়গা করে দেয়। এবং 'রাজরণ' উপাধিতে ভূষিত করে ছত্রীখরী ভূমিবৃত্তি লিখে দিয়েছিল। জলিমের পরামর্শের মারাঠি সেনাপতি রম্বু পৈগওয়ালা ও দৌলামিয়া নিজেদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিবারে চলে আসে। এদিকে রাণা প্রাচীন মন্ত্রী পাঞ্চোলীকে মন্ত্রীর গদি থেকে সরিয়ে উগ্রজি মেহতাকে বহাল করল। এই সময় মাধোজি সিন্ধিয়া উজিন গড়ে অবস্থান করছিল। তার সাহায্য নেবার জন্যে মিবারের রাণাও প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, কিন্তু রতনসিংহর প্রস্তাব আগে গ্রহণ করে নিয়েছিল সে। অরিসিংহর সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

অগত্যা রাণার নিজের যা সৈন্যবল ছিল তাই নিয়েই সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাণার সৈন্যদের বীরত্বের সামনে টিকতে না পেরে সিন্ধিয়ার সৈন্যরা উজ্জয়িনীর দিকে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে আবার নতুন করে বাহিনী সাজিয়ে আক্রমণ করল। সাময়িকভাবে একটা যুদ্ধে জিতেই গর্বে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল মিবারের রাণা। একবার ভেবে দেখল না, সিন্ধিয়া অত সহজে ছেড়ে দেবে না তাদের। প্রতিশোধ সে নেবেই। রাণার সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল না। সবাইকে এক জায়গায় জড়ো

করে বাহিনী সুসজ্জিত করার আর কোন অবকাশ পেলনা তারা। মাধোজির প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে শালুমব্রা, শাপুর ও গানোররে সর্দাররা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ করল। এবং দৌলমিয়া, নিরবের পদচ্যুত রাজা রাজামান, সদ্রির উত্তরাধিকারী কল্যাণরাও দারুণ-ভাবে আহত হল। জলিমসিংহও আহত। তার অশ্ব নিহত হওয়ায় যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালাতে পারল না। শত্রুর হাতে বন্দী হল। বন্দী হয়েও কিন্তু জলিম অসাধারণ সম্মান ও সৌজন্য ব্যবহার পেয়েছিল মারাঠিদের কাছ থেকে। ত্র্যম্বকজি-নামে এক মারাঠি তাকে সেবা ও যত্ন করেছিল অন্তর দিয়ে। এই ত্র্যম্বকজি প্রসিদ্ধ অম্বজির পিতা। পরাজিত ও অপমানিত হয়ে উদয়পুরে পালিয়ে এল রাণার সেনাদল। এদিকে রতনসিংহর পক্ষ থেকে, উদয়পুর আক্রমণ করে ঐ সিংহাসনে রতনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবার জন্যে, সিন্ধিয়াকে বারবার উত্তেজিত করতে লাগল। এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে উদয়পুর অবরোধ করল সিন্ধিয়া। এবারে রাণা হতাশ হয়ে পড়ল। একমাত্র ভরসা শালুমব্রার উত্তরাধিকারী ভিমসিংহ। তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে নগর এবং রাজ্যরক্ষার ভার দেওয়া হল। এই সঙ্কট-সময়ে অমরচাঁদ বারোয়া নামে এক বৈশ্য-জাত বিচক্ষণ অধিনায়কের নেতৃত্বে মিবার রক্ষা পেয়েছিল। রাজ্যের মধ্যে অরিসিংহর অবিবেচনার ফলে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলছিল শুধু অমরচাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরেই তার কিছুটা আয়ত্বের মধ্যে এসেছিল। এর আগে সে মিবারের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই অরিসিংহর সময়েই সে-পদ থেকে বিচ্যুত হয় সে। তারপর দশটা বছর কেটে গেছে। সর্দারদের সঙ্গে কলহ বেড়েছে রাণার। রতনসিংহ নামে তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। বেশীর ভাগ সর্দার এবং সৈন্যরা রতনসিংহর দলে যোগ দেওয়ায় ভাড়া-করা সিন্ধি-সৈন্য এনে পুরতে হচ্ছে। রাজ্যের তেমন কোন আয় নেই আর। অথচ যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-বিবাদ লেগেই রয়েছে। জলের মত অর্থব্যয় হয়ে যাচ্ছে। সিন্ধি-সৈন্যদের মাইনে দেবার টাকা নেই। তারা তাগাদা করে চলেছে অভদ্রের মত। সব মুখ বুজে রাণাকে সহ্য করে

যেতে হয়। আর সহ্য না করেই বা উপায় কি?

উদয়পুর সুরক্ষিত ছিল না। একমাত্র প্রাকৃতিক পাহাড়ী-প্রাকার ছাড়া আর কিছু সহায় নেই। দক্ষিণ দিকে একলিঙ্গগড় নামে একটি পাহাড়। এরই মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসার পথ। বলতে গেলে উদয়পুরের তোরণ-দ্বার এটি। সুতরাং এই পথ প্রাচীর তুলে বন্ধ করে দিয়ে ওপরে কামান বসালে নগর সুরক্ষিত হবে বলে মনে করল রাণা। কিন্তু একলিঙ্গগড় দুরারোহ এবং বন্ধুর। রাণার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। এই সময় অমর-চাঁদকে ডেকে পাঠাল রাণা। যথোচিত সম্মান দেখিয়ে সে পাশে বসালো তাকে। আজ এই বিপদের দিনে তার মূল্যবান পরামর্শ অপরি-হার্য। তাই তাকে এত খাতির করে ডেকে এনেছে রাণা। অমরচাঁদ বুঝল সবই, মুখে কিছু বলল না। রাণা বললে, 'আপনার কি ধারণা, ঐ পাহাড়ের ওপরে কামান বসানো সম্ভব? প্রাচীর তুলে ওপথ বন্ধ করা যেতে পারে! এতে অর্থ এবং সময়েরই বা কতটা প্রয়োজন হতে পারে আপনি আমাকে বলুন।'

অমরচাঁদ গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'অসম্ভব কিছুই না। কিছু শস্য এবং কয়েকটি দিন সময়ই যথেষ্ট। সব আমি করে দিতে পারি। কিন্তু একটা সর্ত আছে।'

সাগ্রহে রাণা বললে, 'বলুন কি সর্ত, আমি রাজি।'

'—আমি যে ভাবে কাজ করতে চাই তাতে কারো কোন হস্তক্ষেপ করা চলবে না। যা করব, ভাল হোক চাই মন্দ হোক তার জন্যে কারো কাছে কখনও আমি জবাব দিহি করতে রাজি নই। আমার এই প্রস্তাবে যদি রাজি থাকেন তাহলে বলুন, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

রাণা জানত, অমরচাঁদের আত্মবিশ্বাস অপরিমেয়। যে কাজে হাত দেবে তা সফল করবেই করবে। তাই এক-কথায় রাজি হয়ে গেল রাণা, 'আপনার যে-কোন সর্তেই রাজি আমি। সম্পূর্ণ কাজ আপনার অধি-নায়কত্বেই হবে। তাতে কখনই কেউ কোন কথা বলতে যাবে না। আমিও না।'

অমরচাঁদ চাষীমুজুরদের জড়ো করে কাজে নামল। অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই একলিঙ্গগড়ের চূড়া থেকে কামান দেগে রাণাকে অভিবাদন করল। রাণা বিস্ময়ে হতবাক।

দুর্ধর্ষ মাধোজি সিন্ধিয়া উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক অবরোধ করে রইল। পশ্চিম দিকটা সে অবরোধ করতে পারল না, তার কারণ উদয়সাগর। উদয় সাগরের বিস্তৃত জলরাশি এবং তার তীরের পাহাড় ও বন দারুণ বাধা হয়ে দাঁড়াল। শুধু এই পশ্চিম দিক দিয়েই লোকজন প্রয়োজন মত যাতায়াত করত। ভীলরা নৌকায় উদয়সাগর এপার ওপার করে রসদের যোগান দিতে লাগল। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে! সিন্ধিসৈন্যরা মাইনের জন্যে চরম নোটিশ দিয়েছে। আর সময় দিতে চায় না তারা। 'কড়ি ফেল। নইলে শত্রু-নিধন করার জন্যে যে অস্ত্র হাতে তুলে দিয়েছ, তোমাদের সে অস্ত্র দিয়ে তোমাদেরই সাবাড় করব আমরা।'

একদিন রাণা রাজভবনে প্রবেশ করছে এমন সময় কয়েকজন সৈন্য সামনে এসে দারুণভাবে অপমান করল তাকে। তার গায়ের উত্তরীয় ধরে টান দিল একজন। সঙ্গে সঙ্গে রাণা চেপে ধরে ফেলেছিল, তাই সবটা কেড়ে নিতে পারেনি, কিন্তু খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে নিল তারা। রাণা চিন্তিত, ভীত হয়ে পড়ল। শেষে কি নিজের সৈন্যদের হাতেই তাকে মরতে হবে! অপমানে ক্ষোভে রাণা কাতর হয়ে পড়ল। কিন্তু এই সমূহ বিপদের মুহূর্তে অধীর হলে চলবে না, উপায় ঠিক করতে হবে এবং এখনি। আর দেরি করা নিরাপদ নয়।

রাণার এক 'ধাই ভাই' ছিল, তার নাম রঘুদেব। সে পরামর্শ দিল, 'এসময়ে উদয়পুরে থাকা নিরাপদ না, তুমি উদয়সাগর পার হয়ে মণ্ডল-গড় দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমরা দেখছি কতদূর কি করা যায়।'

কিন্তু রঘুদেবের এই কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে রাজি হতে পারল না রাণা। শালুমব্রাকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু শালুমব্রা মাথা হেঁট করে রইল। বললে, 'এ বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় আমার মাথায় আসছে না। আমি কিছুই পথ দেখতে পাচ্ছিনে। আপনি বরং অমরচাঁদকে

ডেকে পরামর্শ করুন।'

শেষে অমরচাঁদকে ডেকে তার হাতেই সব দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল। অমরচাঁদের স্বভাব ছিল একরোখা, উগ্র। তার কথার ওপর আর কারো কোন কথা বলা চলবে না। তা সে ঠিকই করুক আর ভুলই করুক। সব জেনেও, অন্য কোন উপায় নাই দেখে, রাণা তার সব সর্তে রাজি হয়ে রাজ্যের সুখ দুঃখের দায় তার হাতেই তুলে দিল।

অমরচাঁদ বললে, 'মহারাজ এই কঠিন কাজের ভার নেবার লোভ আমার নেই। আমার মনে হয় কারুরই নেই। আপনার কোষাগার শূণ্য, সৈন্যরা বিদ্রোহী, রসদ নাই। এ অবস্থায় আমি কতটা কি করতে পারব জানিনে, তবে আমার ওপর যদি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন তবে এটুকু বলতে পারি, চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না। কিন্তু আমার চরিত্র রাণার জানা আছে, আমি কারো কোন শাসন মানতে পারি না, এমন কি রাণারও না। আপনি যদি কথা দেন, আমার কাজে বাধা দেবেন না তাহলে আমি এ ভার নিতে পারি।'

রাণা বললে, 'আপনি যা বলবেন, যা করবেন তাই হবে। আমরা নিরুপায় হয়ে আপনার বিচক্ষণতার ওপরই একমাত্র নির্ভর করছি। আমার বিশ্বাস, আপনার কল্যাণে মিবার রক্ষা পাবে, সব বিপদ কেটে যাবে।'

রাণার ধাই-ভাই রঘুদেবের পরামর্শের কথা শুনে অমরচাঁদ জ্বলে উঠল।

'—তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি পরামর্শ তুমি দিয়েছিলে। তোমার কথা শুনে রাণা যদি মণ্ডলগড়ে পালিয়ে যেতেন তাহলে সেখানে তাকে কে রক্ষা করত? আর তুমি! তোমাকেই বা কে বাঁচাত তখন? রাজকার্য পরিচালনা করা তোমার কর্ম না। তোমার যা কাজ তাই তুমি কর গিয়ে। গরুমোষ চরিয়ে বেড়াও। সেই তোমার নিজের কাজ। ওতেই তুমি সুখে থাকবে।'

অমরের তেজস্বিতা দেখে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে পড়ল রঘুদেব। সেনাপতির মত কঠিন ভাবে সিন্ধি-সৈন্যদের নির্দেশ দিল, 'আমার সঙ্গে এস, তোমাদের পাওনা বেতন আমি চুকিয়ে দেব। কিন্তু নিশ্চিত জেন যে, এ যুদ্ধে যদি আমাদের জয় না হয় তা হলে সব দোষ আমার

ঘাড়ে এসে চাপবে।'

যে বিদ্রোহী সৈন্যরা এর আগে রাণাকে অবমাননা করেছিল তারাই যন্ত্র-চালিতের মত অমরচাঁদের নির্দেশে তার অনুগমন করল। সৈন্যদের পাওনা কড়ির হিসাব-পত্র করল, তার পর কোষাগারের চাবি চাইল খাজাঞ্চীর কাছে। কিন্তু সে লোকটা ভয়ে পালিয়ে গেল সেখান থেকে। অগত্যা কোষাগারের দরজা ভেঙ্গে ফেলা হল। টাকাপয়সা যা ছিল তাতে কুলাল না, সোনা দানা রত্ন মণি মাণিক্য সব টেনে বের করে ফেলল। এই সব দিয়ে সৈন্যদের বেতন চুকিয়ে দিল। এবং যা বাড়তি রইল তা দিয়ে গোলা বারুদ, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ সংগ্রহ করা হল। শত্রুর সঙ্গে যুঝবার মত আরও ছয় মাসের সেনাবল এবং রসদ পাওয়া গেল।

রাণার অধিকাংশ খাস-জমি দখল করে নিয়ে উদয়পুরের উপত্যকা-প্রদেশ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিল রতনসিংহ। কিন্তু সিন্ধিয়াকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না পারায় মহা বিপদে পড়ল সে। মারাঠিরা সময়কে অমূল্য জ্ঞান করে। বৃথা সময় নষ্ট করার মত ধৈর্য তাদের ছিল না। অমরচাঁদের সঙ্গে সন্ধি করার ইচ্ছা প্রকাশ করল সিন্ধিয়া। বলে পাঠাল, সত্তর লক্ষ টাকা পেলেই সে অবিলম্বে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে। অমর এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরই সিন্ধিয়া আবার চাপ দিল, আরও বিশ লক্ষ টাকা চাই।

একথা শুনে অমরচাঁদ জ্বলে উঠল। সন্ধিপত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মারাঠি-দূতের হাতে দিয়ে বললে, 'যাও তোমার প্রভুকে দাওগে।' বিপদ যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল অমরচাঁদের তেজস্বিতাও তত বাড়তে থাকল। সৈন্যদের মধ্যে সাহস ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলল। সিন্ধি এবং রাজপুত সেনাদের একত্রিত করে শত্রুর বিশ্বাস-ঘাতকতার ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝিয়ে এক রক্ত-গরমকরা বক্তৃতা দিল সে। সুবক্তা হিসেবে অমরচাঁদের নাম ছিল। সৈন্যরা শত্রু-সংহারে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তাদের এই উৎসাহে আহুতি দেবার জন্যে সৈন্যদের মধ্যে নানাবিধ রত্নমণ্ডিত ও মূল্যবান বস্তু উপহার দেওয়া হল। এর জন্যে যে অমরচাঁদকে প্রচুর অর্থ

ব্যয় করতে হয়েছিল তা না, এগুলো অকেজো হয়ে রাজভাণ্ডারে শোভা বাড়িয়ে রেখেছিল মাত্র। অমরচাঁদের এই বিচক্ষণতায় সিন্ধি-সৈন্যদের মন পাওয়া গেল। তারা সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'আমরা বহুদিন ধরে মিবারের নুন খাচ্ছি, সুতরাং কোন অবস্থাতেই আর আমরা মিবারকে পরিত্যাগ করব না। এখন থেকে মিবারই আমাদের মাতৃভূমি।'

এইটেই চাইছিল অমরচাঁদ। সৈন্যরা যদি শুধু বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র হয় তাহলে তাদের দিয়ে আর যাই হোক দেশরক্ষা হয় না। আনন্দে চোখের পাতা ভিজে গেল রাণার। রাণার চোখে অশ্রু দেখে সিন্ধি সৈন্যরা উন্মত্ত হয়ে উঠল। তাদের প্রচণ্ড রণ-হুঙ্কার সিন্ধিয়ার কানে গিয়ে পৌঁছল। রাজপুতদের মধ্যে নবজাগরণের আভাষ দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হল সে। আগের সর্তে আবার সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। সুযোগ বুঝে অমরচাঁদ এবার উল্টো চাপ দিল। সন্ধিতে সে রাজি। তবে ছয় মাস অবরোধের ফলে উদয়পুরের এবং রাজ্যের যা ক্ষতি হয়েছে সে-টাকা সে কেটে নেবে। উপায়ান্তর না দেখে সাড়ে তেষট্টি লক্ষ টাকায় সন্ধি করল সিন্ধিয়া।

সর্দারদের মধ্যে নতুন নতুন ভূমিবৃত্তি ও রত্নালঙ্করাদি দিয়ে তেত্রিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হল। বাকী টাকার জন্যে ভূসম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগল অমরচাঁদ। এই জন্যেই যৌদ, জীরন, নিমচ ও মরওয়ান প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের আলাদা বন্দোবস্ত হল। ঠিক হল, দুই রাজ্যের রাজকর্মচারীরা এই অঞ্চলগুলো দেখা-শুনা করবে। ১৮২৫ থেকে ১৮৩৯ সংবৎ পর্যন্ত সন্ধির সর্তাদি যথাযথ প্রতিপালিত হয়েছিল, কিন্তু তারপর সিন্ধিয়ার কর্ম-চারীরা রাণার কর্মচারীদের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করল না। ঐ সব অঞ্চল থেকে রাণার কর্মচারীদের বিতাড়িত করে দিল সিন্ধিয়া। সুতরাং ঐ জায়গাগুলো মিবারের হাত থেকে চলে গেল।

১৮৩১ সংবতে মারাঠি সমিতির প্রধান প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা পেশোয়ার অধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। সিন্ধিয়া নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের জন্যে ঐ সব জনপদগুলো রেখে দিল,

হোলকারকে শুধু দিল সে মরত্তয়ান। দুর্দান্ত হোলকার সিন্ধিয়ার কাছে মরত্তয়ান পাওয়ার এক বৎসর পরেই রাণার কাছে নিমহৈরী চেয়ে বসল। এবং এমনভাবে ভয় দেখাতে লাগল যে শেষে বাধ্য হয়ে হোলকারের হাতে নিমহৈরী তুলে দিতে হল।

১৮২৬ সংবতে সিন্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে মিবার শত্রুর হাত থেকে অব্যাহতি পেল ঠিকই কিন্তু চিরকালের জন্যে বেশ খানিকটা অংশ হারাতে হল তাকে। সিন্ধিয়ার জোর করে অধিকার করা অঞ্চল ফিরিয়ে নেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল রাণা। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নি। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীতে বৃটিশদের সঙ্গে রাণা ভীমসিংহর যে সন্ধি হয়েছিল তখনও সিন্ধিয়া অধিকৃত ঐ সব অঞ্চলগুলো উদ্ধারের জন্যে তাদের বলা হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশরা তাদের সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করে নি।

যেদিন সিন্ধিয়া মিবার ছেড়ে চলে গেল তারপর থেকেই রতনসিংহর দুর্দিন ঘনিয়ে এল। যে সব অঞ্চলগুলো এবং দুর্গ সে অধিকার করে নিয়েছিল এক এক করে সে-সব আবার রাণার দখলে চলে আসতে লাগল। রতনসিংহর দলের সর্দারদের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরল। তাদের অনেকেই বিপদ বুঝে রাণার দলে এসে ভিড়ল। শুধু দেপ্রা, দেবগড়, ভীণ্ডির, আমৈত এবং ছোটখাটো আরও দুএকজন সর্দার ছাড়া সবাই সরে পড়ল। ১৮৩১ সংবতে একমাত্র দেপ্রা ছাড়া বাকীরাও গাদবার ছেড়ে রাণার দরবারে এসে অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। গাদবার এক সময় মারবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চণ্ডর পুত্রকে হত্যার জন্যে যোধ এই গাদবার প্রদেশটি মিবারকে 'মুণ্ডকাটি' দিয়েছিল। সারা মিবারের মধ্যে গাদবার অঞ্চলটিই বেশী উর্বরা। ধনে ধান্যে-পুষ্পে ভরা এই অঞ্চলটিতেই মিবারের বিখ্যাত সর্দারা ভূমিবৃত্তি পেত। রতনসিংহ যখন কমলমীরে বসবাস করছে তখন গাধবার অঞ্চলটি যোধপুররাজ বিজয়সিংহর হাতে সঁপে দিয়েছিল রাণা। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সে যখন নিজে ভোগ করতে পারছে না তখন রতনসিংহকে পুষ্ট করে লাভ কি? তার চেয়ে রাঠোরদের হাতে

আবার ফিরিয়ে দিলে এমন কিছু অধর্ম হবে না। এই উপলক্ষে রাণার সঙ্গে বিজয়সিংহর যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল আজও তা দেখতে পাওয়া যায়। এই চুক্তি অনুসারে ঐ অঞ্চলের রাজস্ব থেকে রাণার তিন হাজার সৈন্যের ভরণপোষণ চালাতে হত রাঠোর-রাজকে।

আগেই বলা হয়েছে, আহেরিয়া রাজপুতদের এক চিরপ্রচলিত উৎসব। কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষে বহুবার মিবারে বহু অনর্থ বেধেছে। এর আগে মিবারের তিনজন রাজা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। সে জন্যে এক রাজপুতসতী সহমরণের সময় চিতায় ওঠার আগে বলেছিল, 'আহেরিয়ার মৃগয়াকালে রাণা এবং রাও একসঙ্গে আসলে তাদের একজনকে অবশ্যই মরতে হবে।'

অরিসিংহ মৃগয়া শেষ করে ফিরে আসছিল এমন সময় হঠাৎ হার-রাজকুমার অজিত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে অরিসিংহকে গেঁথে ফেলল। শরাহত মৃগের মত আততায়ীর দিকে চেয়ে রাণা কঠিনকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'রে হার, এ তুই কি করলি!' বলতে বলতে ঘোড়ার পীঠ থেকে ঢলে পড়ছিল। এমন সময় ইন্দ্রগড়ের পাষণ্ড সর্দার অসির আঘাত রাণার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। অজিতের পিতা পুত্রের ঐ পৈশাচিক আচরণের কথা শুনে এত ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, জীবনে আর কখনও সে তার মুখদর্শন করেনি।

কিংবদন্তী আছে, মিবারের সর্দারদের প্ররোচনাতেই এই নৃশংস কাজ করেছিল অজিত। সর্দাররা রাণার ওপর রুষ্ট ছিল, তার প্রমাণ মেলে। যে শালুমব্রা সর্দারের পিতা রাণার স্বার্থে উজ্জীনপুর যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল রাণা তাকে সন্দেহ করে 'বিদায়পত্র' হাতে দিয়ে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শালুমব্রা বিনীতভাবে তার অপরাধের কারণ জিজ্ঞেস করেছিল রাণার কাছে। কিন্তু রাণা সে কথায় কোন কর্ণপাত করে নি। বরং আরও কঠিন কণ্ঠে চন্দাবৎ সর্দারকে বলেছিল, 'তুমি যদি আমার আদেশ পালন না কর তবে এই মুহূর্তে তোমার গর্দান নেব।'

অগত্যা শালুমব্রা নির্বাসনে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু এতে আপনার এবং আপনার পরিবারের বিশেষ

ক্ষতি হবে।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই চন্দাবতের এই অভিশাপ নির্মমভাবে ফলেছিল।

কিন্তু রাণার হত্যা সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি আছে। মিবারের সীমান্তে বিলৈত নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। মিবারেরই অন্তর্গত সে-গ্রাম। কিন্তু বুন্দির রাজা জবরদখল করে নিয়েছিল। সেই থেকেই বিবাদের সূত্রপাত হয়। এ কথা কতদূর সত্য বলা যায় না, কিন্তু বুন্দি-রাজকুমার নিষ্ঠুরভাবে রাণাকে হত্যা করে কাপুরুষতা এবং পাশবিকতারই পরিচয় দিয়েছে।

অরিসিংহর মৃতদেহ ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সঙ্গের সর্দার এবং সেনারা। রাণার একমাত্র উপপত্নী এসে উপপতির অন্ত্যেষ্টির কাজ করেছিল। রাণার মৃতদেহ কোলে নিয়ে চিতায় আরোহণ করল সে। চিতায় ওঠার আগে সামনের এক বটবৃক্ষের উদ্দেশে সে বলেছিল, 'বনস্পতি, তুমি সাক্ষী, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার স্বামীকে যদি হত্যা করে থাকে কেউ, আমি অভিশাপ দিচ্ছি, ছ'মাসের মধ্যে সে পাপিষ্ঠের সারা অঙ্গ খসে খসে পড়বে। বিশ্বাসঘাতক এবং রাজহত্যার জঘন্য উদাহরণ হয়ে চিরকাল সে লোকের ঘৃণার পাত্র হবে। যদি মহারাজ অরিসিংহ ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে আমি হৃদয়ে স্থান না দিয়ে থাকি তবে আমার এ অভিশাপ ফলবেই ফলবে।' সতীর কথা শেষ হতে না হতেই সেই বটবৃক্ষের একটি প্রকাণ্ড ডাল মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়েছিল।

অরিসিংহর দুই পুত্র হামির, দ্বিতীয় ভীমসিংহ। ১৮২৮ সংবতে (১৭৭২ খৃঃ) হামির মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করল। গিহ্লোট বংশের এক প্রাতঃস্মণীয় ব্যক্তি হামির। কিন্তু সে নামধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য অরিসিংহের পুত্র এই হামির। হামিরের বয়স তখন মাত্র বারো। সুতরাং তার মাতাই রাজকার্য দেখাশুনা করতে লাগল। অসংখ্য অনর্থ একত্রে জমা হয়েছিল। একে শোচনীয় দুর্দশা, মারাঠি উৎপীড়ন, তার

ওপর নারীর শাসন--সে নারী আবার দারুণ দুরাকাঙ্খায় দীর্ণ। সুতরাং চাঁদভট্টর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে মিবারের পতন অনিবার্য। এই মহাসঙ্কট সময়ে মিবারে শুরু হল এক প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শক্তাবৎ এবং চন্দাবৎদের মধ্যে চিরকালের যে বিবাদ বিরোধ ছিল তাতে এবার ঘৃতাহুতি পড়ল। এই সুযোগে দুপক্ষই নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। তার অবশ্যম্ভাবী ফল যা হতে পারে তারই চুড়ান্ত হল। শক্তাবৎ রাজজননীর পক্ষ নিল, আর শালুমব্রা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। ফলে এই ঘোরতর ঘরোয়া সংঘর্ষে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল মিবার। রাজ্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর অরাজকতা আরম্ভ হল। সুযোগ পেয়ে সামান্য দস্যুও লুঠপাট করতে শুরু করল। মিবারের শান্ত নিরীহ কৃষকরা পশুর মত অত্যাচারিত হতে লাগল।

অমরচাঁদের অধিনায়কত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে যে সিন্ধি-সৈন্যরা অটল রাজভক্তির নিদর্শন দেখিয়েছিল, আজ অরিসিংহর অবর্তমানে আবার তারা নিজেদের আসল চেহারা খুলে ধরল। তাদের বকেয়া সমস্ত বেতন পরিশোধ করে-দেবার জন্যে-হুমকী দিতে লাগল। রাজধানী রক্ষার ভার ছিল শালুমব্রার ওপর। সুতরাং তাকেই তারা চেপে-ধরল। সিন্ধি-সৈন্যরা তাকে গরম তেলের কড়াইএর মধ্যে পুড়িয়ে মারবে ঠিক করছিল, এমন সময় বুন্দি থেকে ফিরে এল অমরচাঁদ। তাকে দেখামাত্র ভয়ে তারা কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেল। রাজকুমার হামিরের স্বার্থ যাতে ষোল আনা বজায় থাকে তার জন্যে দৃঢ়-সংকল্প হল অমরচাঁদ। মানব মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারত সে। তাই অন্যের ঈর্ষাভাজন হওয়ার আশঙ্কায় মন্ত্রীর গদি নিতে রাজি হল না। শেষপর্যন্ত এড়াতে না পেরে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করে রাজজননীর কাছে পেশ করল। সোনাদানা, মণিমুক্তা-রত্ন, এমন কি তোষাখানার কাপড়চোপড়ও বেঁধে ছেঁদে তার কাছে পাঠানো হল। অমরচাঁদের এই উদার ব্যবহার দেখে সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল। যারা তাকে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস করত তারা অপ্রতিভ হয়ে গেল। রাজজননী তার সমস্ত জিনিষ ফেরৎ নেবার জন্যে বারবার

অনুরোধ করল, কিন্তু অমরচাঁদ কিছুতেই তাতে রাজি হল না। শুধু তার ব্যবহারের কাপড়চোপড়গুলো সে ফেরৎ নিয়েছিল। বাকী সমস্ত সামগ্রী রাজভাণ্ডারে জমা করে দেওয়া হল।

রাজমাতা বুদ্ধিমতী সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের কথা, রামপিয়ারী নামে তার একটি নষ্ট মেয়েমানুষ সহচরীর কথায় সে উঠত বসত। তার পরামর্শেই সব কাজ করত। সেই মেয়েছেলেটা আবার একটি সামান্য কর্মচারীর বুদ্ধিতে কাজ করত। সুতরাং পরোক্ষভাবে ঐ কর্মচারীটির ইশারাতেই মিবারের শাসনদণ্ড পরিচালিত হত। এই ভীষণ চক্রান্তের মধ্যে অমরচাঁদ বেশীদিন টিকতে পারে নি। রামপিয়ারীর কথামত রাজজননী অমরচাঁদের প্রতিটি কাজের বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগল। তার পুত্রের স্বার্থের জন্যেই যে অমরচাঁদ নিজের সব স্বার্থ তুচ্ছ করেছে সেকথা একবারও ভাবল না সে। তার মথায় এমনভাবে দুষ্টবুদ্ধি ভর করেছিল যে, চন্দাবৎদের সাহায্য নিয়ে অমরচাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ অমর কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। তার অনুগত সিন্ধি সৈন্যদের সাহায্যে নিজের পদে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে দুর্ধর্ষ মারাঠিদের আক্রমণ থেকে দেশ-নগর রক্ষা করতে লাগল।

একদিন রামপিয়ারী অমরচাঁদের সামনে এসে রাজজননীর নাম করে জঘন্য ভাষায় গালাগাল করতে লাগল। অমরচাঁদ স্বভাবত তেজস্বী, সে ঐ নষ্ট মেয়েমানুষটার তম্বি সহ্য করবে কেন! তখনি তাকে তার ঘর থেকে তেড়ে বের করে দিল। এই রকমই একটা ছুতো খুঁজছিল রামপিয়ারী। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হল রাজমাতার কাছে। রামপিয়ারীর অপমান নিজেরই অপমান বলে মনে করল সে। তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকারের জন্যে শিবিকায় চেপে শালুমব্রা সর্দারের কাছে রওনা হল। অমরচাঁদ বুঝতে পেরেছিল, আবার এক অনর্থের সূত্রপাত হচ্ছে। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মহা গণ্ডগোল বেধে যেতে পারে ভেবে অমরচাঁদ রাণীর শিবিকার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। রাজমাতাকে প্রণাম জানিয়ে বললে, 'দেবি, অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আপনি কি ভাল কাজ

করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইতর নারীরাও একটা বছর ঘরের বাইরে বেরোয় না, আর রাণার মৃত্যুর ছমাস এখনও হয়নি, আপনি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন! আপনি বুদ্ধিমতী, এ বিষয়ে আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। শুধু আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি শিবিকা ঘুরিয়ে নিয়ে রাজঅন্তঃপুরে চলে যান। এইটুকু আপনি মনে রাখবেন, অমরচাঁদ কৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক না। সে আপনার উপকার ছাড়া অনিষ্ট করবে না কখনও। আমার নিজের সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে চাইনে আপনাকে। আমি এখন একটি গুরুতর কাজে ব্যাপৃত রয়েছি, তাতে আপনার এবং রাজপুত্রের মঙ্গল ছাড়া অনিষ্ট হবে না। এ অবস্থায় আমি একান্তভাবে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি, আপনি যদি আমার বিরুদ্ধাচারণ করেন তবে কি করে আমি বড় কাজে হাত দিতে পারি। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি তখন কোন ভাবেই আপনার কোন অমঙ্গল হতে দেব না।'

এই ধরনের আরও অনেক সারগর্ভ কথা বলে তখনকার মত রাজমাতাকে অন্তঃপুরে ফেরৎ পাঠাল। কিন্তু শয়তান যার ঘাড়ে সে কি ধর্মের কথা কানে তোলে। অমরচাঁদকে সে বিষ-নজরেই দেখতে লাগল। তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অন্যকোন পথ না পেয়ে শেষে পাপিষ্ঠা বাইজি-রাজ (রাজমাতা) বিষ খাইয়ে অমরচাঁদকে হত্যা করেছিল বলে লোকে বলে। নিজের সব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে যার জন্যে সে জীবনপণ করেছিল তারই শয়তানীতে তাকে প্রাণ হারাতে হল। ইচ্ছে করলেই সে অতুল বৈভবের অধিকারী হয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারত। তার মত বিচক্ষণ মন্ত্রী পেলে যে কোন রাজা লুফে নিত। কিন্তু অমরচাঁদ নিজের দিকটা একদিনের জন্যেও চিন্তা করে নি। শুধু রাণা, রাণার পুত্রর জন্যেই গোটাজীবন উৎসর্গ করেছিল সে। আজও মিবারবাসীবা তার অলোক-সামান্য গুণাবলী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

হতভাগিনী রাজমাতা ভেবেছিল, অমরকে হত্যা করতে পারলে আর কেউই তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার

সে-মোহ ঘুচে গেল। ১৮৩১ সংবতে (১৭৭৫ খৃঃ) বৈগুসর্দার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বৈগু একজন প্রতাপশালী মেঘাবৎ সামন্ত। নিরুপায় হয়ে রাজমাতা সিন্ধিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করল। সুযোগ বুঝে সিন্ধিয়া বৈগুকে আক্রমণ করে রাণার যে সমস্ত খাস-দখলের জমি সে হস্তগত করেছিল তার সবটাই কেড়ে নিল। এবং বারো লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করে ছাড়ল। কিন্তু রাণা যে আশায় সিন্ধিয়াকে ডেকেছিল তাতে ছাই পড়ল। বৈগুর হাত থেকে রাণার জমি উদ্ধার হল বটে, কিন্তু তা সে নিজে ফেরৎ পেল না। সিন্ধিয়া তার জামাতা বীরজি তাপকে রতনগড়, খৈরী এবং সিঙ্গোলী অঞ্চলের অধিকর্তা করে বাকী ইরনিয়া, জৌথ, বীচোর, এবং নাদোয়ী তুলে দিলে হোলকারের হাতে। এই সব জনপদের আয় বার্ষিক প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। এ গুলো আত্মসাৎ করেই কিন্তু তারা ক্ষান্ত হল না। ১৮৩০-৩১ এবং ১৮৩৬ সংবতের মধ্যে তিনটি যুদ্ধপণ দাবি করে বসল। এই বিপুল পণের দাবি মেটাতে না পাবার দরুণ আবার তারা মিবারের ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করতে লাগল। ঘোর অন্তর্বিপ্লব এবং নিষ্ঠুর মারাঠি অত্যাচারের মধ্যে কেটেছে হামিরের শৈশব-কাল। রাজপুত নিয়মানুসারে ১৮ বৎসর বয়েসে রাজ্য হাতে পায়। ঠিক সেই সময়ে তার মৃত্যু হয় ১৮৩৪ সংবতে (১৭৭৮ খৃঃ)।

যেদিন মারাঠিরা সর্বপ্রথম আক্রমণ করেছিল সেদিন থেকে হামিরের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ঠুর মারাঠিরা যে পৈশচিকভাবে মিবারের রাজা প্রজা ও ধনসম্পত্তির ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তা ভাবলেও স্তম্ভিত হতে হয়। শুধু তাদের অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলেই মিবার শোচনীয় পরিণতির পথে নেমে গিয়েছিল। মোগল বাদশাহরাও প্রজা-পীড়ন করত, হিন্দুদের সুখদুঃখের কথা তারা ভাবত না ঠিকই, কিন্তু তারা ছিল ভারতের সম্রাট। ভারতবাসীকে তারা নিজের প্রজা বলে মনে করত। তাই যত অত্যাচার-উৎপীড়নই করুক দেশের এবং প্রজাদের মঙ্গলের কথাও তারা সময় সময় চিন্তা করত। কিন্তু মারাঠিদের আচার আচরণ রাজার মত ছিল না। আসলে

দস্যুবৃত্তিই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। লুণ্ঠতরাজ করে ধনরত্ন হাতিয়ে নেওয়াই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। সম্রাট হওয়ার সাধ বা যোগ্যতা কোন কিছুই ছিল না তাদের। শুধু তাদের হাড়ে মজ্জায় জড়িয়ে ছিল পরস্ব অপহরণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার, উৎপীড়ন আর বিশ্বাস-ঘাতকতা। অথচ এরা নিজেরা ভারতবাসী। মহাবীর শিবাজীর অযোগ্য বংশধর। শিবাজীর মধ্যে যে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, কণা-মাত্রেরও উত্তরাধিকারী যদি হতে পারত তারা তা হলে মারাঠিরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে থাকতে পারত। যাইহোক, হীন স্বার্থপরতা, কৃতঘ্নতা এবং বিশ্বাঘাতকতা থেকেই মিবারের সব গৌরব, সম্মান-সম্ভ্রম ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

১৫

১৮৩৪ সংবতে (১৭৭৮ খৃঃ) হামিরের কনিষ্ঠ সহোদর ভীমসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করল। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে চারজন নাবালক রাজপুত্রের হাতে মিবারের শাসনদণ্ড তুলে দেওয়া হয়েছিল। ভীমসিংহ তাদের মধ্যে চতুর্থ। এর অভিষেকের সময় বয়স হয়েছিল মাত্র আট। ভীমসিংহর রাজত্বকাল পঞ্চাশ বৎসর। এই সময়কালের মধ্যে মিবারের যত সর্বনাশ ঘটেছিল তার খতিয়ান করতে গেলে অবাক হতে হয়। পুত্রের নাবালকত্ব কেটে যাওয়ার পরেও অনেকদিন রাজমাতাই শাসন-কার্য দেখা-শুনা করেছিল। মায়ের আঁচলের তলায় সুখে কাটিয়ে ভীমসিংহ রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তিগুলো একেবারে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। তার নিজের মাথায় আদৌ কোন বুদ্ধি যোগাত না। সব সময় সাঙ্গপাঙ্গদের পরামর্শ মতই কাজ করতে হত। ফলে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটতে থাকল। সুযোগসন্ধানীরা চক্রান্ত করে তাকে অসৎ উপদেশ দিতে লাগল।

চন্দাবৎরা রাণার কাছ থেকে উচ্চক্ষমতা পেয়েছিল। ১৮৪০ সংবতে

(১৭৮৪ খৃঃ) তারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে শক্তাবৎদের নিধন করতে লাগল। কোরাবারের অর্জুনসিংহ এবং আমৈতের প্রতাপসিংহ শালুম্বার প্রধান আত্মীয়। চন্দাবৎ সর্দার এই তুই রাজপুতের সহযোগিতায় মন্ত্রভবন হস্তগত করে নিল। সমগ্র সিন্ধি-সৈন্য আর তাদের তুই সেনাপতি চন্দন ও সেদিকে নিজেদের দলে টেনে নিয়ে বড় রকমের এক জোট তৈরি করল। এতকাল ধরে সুযোগ খুঁজছিল, এবার সে শক্তাবৎ-সর্দার মাক্ষমের ভিণ্ডির তুর্গ অবরোধ করল।

শক্তাবৎগোত্রের এক শাখায় সংগ্রামসিংহ নামে এক যোদ্ধার জন্ম হয়। ধীরে ধীরে সে নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছড়িয়ে ফেলেছিল বেশ। ভিণ্ডির অবরোধের কিছুদিন আগে সংগ্রামসিংহ পূর্বাবৎ সর্দারের সঙ্গে এক বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। পূর্বাবতের লাওয়া নামে একটি তুর্গ ছিল। সংগ্রাম সেটি দখল করে নেয়। কিছুদিন বাদে তাদের বিবাদ মিটে যায়। বিজয়ী সংগ্রাম শক্তাবৎ সর্দারকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে। ভিণ্ডির তুর্গ চন্দাবৎরা অবরোধ করে বসে আছে। এদিকে সে কেরাবারের অর্জুনের ভূমিবৃত্তি আক্রমণ করে গরু মোষ ভেড়া যা পেল তাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল। পথের মধ্যে অর্জুনের পুত্র মোগলসিংহ বাধা দিল। কিন্তু সংগ্রামের বীরত্বের সামনে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারল না বেচারী। এ সংবাদ অর্জুনের কাছে পৌছন মাত্র ক্রোধে ফেটে পড়ল সে।

'—যতদিন এর প্রতিফল দিতে না পারি এ উষ্ণীষ আর মাথায় পরব না।'

এই বলে মাথার উষ্ণীষটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ভিণ্ডির অবরোধ থেকে তখনি কোরাবারের পথে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু প্রথমে কোরাবারে না গিয়ে সে শিবগড়ের দিকে ছুটতে লাগল। সংগ্রামের বৃদ্ধ পিতা লালজী সেখানে বাস করত। ভীল জনপদ চপ্পনের মধ্যে পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা এই শিবগড়। সংগ্রাম ভেবেছিল, প্রাকৃতিক পরিবেশে সুরক্ষিত শিবগড় তুর্গম এবং তুরারোহ। তাই পুত্র কন্যা ও পরিবারের সবাইকেসেখানে রেখে সে বেশ নিশ্চিন্তে ছিল। বৃদ্ধ পিতা ছাড়া অন্য কোন যোদ্ধাকে তুর্গরক্ষক

করে রাখাও প্রয়োজন মনে করেনি সংগ্রাম। এদিকে পুত্র-হন্তাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যে সসৈন্যে অর্জুন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবগড় দুর্গের ওপর। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ পিতা লালজী ছাড়া তরবারি ধরার মত কোন যোদ্ধা ছিল না তখন। লালজী তার সাধ্যমত লড়াই করে প্রাণ হারাল। উন্মত্ত অর্জুন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে সংগ্রামের নাবালক-পুত্রকে নির্মম-ভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নিল।

অর্জুনসিংহর এই কঠোর এবং নিষ্ঠুর আচরণে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনে যে ভয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠল তা আর কেউই নেবাতে পারল না। এবং এই আগুনেই পুড়ে শ্মশান হয়ে গেল সারা মিবার। এর ওপর নাবালক ভীমের অক্ষমতা এবং মারাঠিদের অমানুষিক অত্যাচার সোনায় সোহাগা হল। চন্দাবৎ-শক্তাবৎদের শত্রুতা দিন দিন বেড়েই চলল। চন্দাবৎরা রাণার অনুগ্রহ পেয়ে আসছিল, কিন্তু ভীমসিংহর খামখেয়ালীতে আবার এক নতুন অনর্থের সৃষ্টি হল। চিতোর ও উদয়পুরের মাঝখানের সমস্ত জমি সে সিন্ধি সৈন্যদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল। এবং নানা রকম বাজে আমোদ-প্রমোদে জলের মত পয়সার অপব্যয় করতে লাগল। চন্দাবৎ নিজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে রাণাকে দশ লক্ষ টাকা ঋণের দায়ে জড়িয়ে ফেলল। রাণার তখন এমন অবস্থা না যে, বিবাহের এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে পারে। তাই তাকে কন্যার পিতার কাছে ঐ টাকাটা ধার করতে হয়েছিল। চন্দাবৎ সর্দারের এই ব্যবহারে রাজজননী রুষ্ট হয়ে তাদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শক্তাবৎদের হাতে দিয়ে দিল; এবং ভিণ্ডির ও লাওয়ার সামন্তদের বিপুল ক্ষমতা প্রদান করল। শক্তাবৎরা হাতে ক্ষমতা পেল বটে, কিন্তু তাদের তেমন সেনাবল নাই, যা দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। অগত্যা তারা কোটার জলিমসিংহর সাহায্য প্রার্থনা করল। চন্দাবৎদের সঙ্গে জলিমের শত্রুতা ছিল, শক্তাবৎদের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল, তাই আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্র তার বন্ধু মারাঠি-যোদ্ধা লালজী বল্লাল সহ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে শক্তাবৎদের সঙ্গে মিলিত হল সে। শক্তাবৎরা প্রথমে দুটি কর্তব্য ঠিক করল। এক চন্দাবৎদের

দমন, আর এক রতনসিংহকে কমলমীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। চন্দাবৎরা সিন্ধি সৈন্যদের সঙ্গে একজোট হয়ে চিতোরের প্রাচীন দুর্গে বসে রাণার বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করতে লাগল।

মিবারে যখন এই ঘটনা ঘটছে, সে-সময় মারবার এবং জয়পুরের সমবেত চেষ্টায় মাধোজি সিন্ধিয়ার প্রভুত্ব প্রভাব ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। লালসন্ত-ক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজপুতরা জয়ী হল। দুর্ধর্ষ মারাঠিদের সব গর্ব ভোঁতা হয়ে গেল। এই সুযোগে রাজপুতরা মারাঠি দখল থেকে নিজেদের ভূসম্পত্তি উদ্ধার করে নিল। রাঠোর-কচ্ছবাহদের আদর্শ অনুসরণ করে শিশোদীয়রাও সিন্ধিয়ার কবল থেকে নিজেদের অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগল। এই সময়ে গিহ্লোট বংশের শৌর্য আর একবার ক্ষণকালের জন্য দপ করে জ্বলে উঠেছিল।

রাণার দেওয়ান মালদাস মেহতা ও তার সহকারী মৌজিরাম অসম-সাহসী এবং বুদ্ধিমান লোক। সব আগে তারা নিম্বহেরী ও তার কাছা-কাছি মারাঠি দুর্গগুলো অধিকার করে বসল। পরাজিত ও বিতাড়িত মারাঠিরা জৌদ নামে এক জায়গায় জড়ো হল। কিন্তু তাদের সে উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। রাজপুত যোদ্ধারা সে দুর্গটিও বাহুবলে দখল করে সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দিল। জৌদের শাসনকর্তা শিবজিনানা বিজয়ী রাজপুতদের আদেশ শিরোধার্য করে আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। এদিকে বৈগুসর্দার মেঘসিংহর (মেঘসিংহ বৈগু-জনপদের রাজা। চন্দাবৎ গোত্রে তার জন্ম। তার বংশধররা মেঘাবৎ নামে পরিচিত। মেঘ-সিংহর গায়ের রং ঘোর কালো ছিল বলে লোকে তাকে 'কালমেঘ' বলে ডাকত।) পুত্ররা বৈগু, সিঙ্গোলি এবং তার কাছাকাছি সীমান্ত অঞ্চল থেকে মারাঠিদের বিতাড়িত করে দিল। সুযোগ বুঝে চন্দাবৎরাও রামপুর উদ্ধার করে নিল। কিছুদিনের মধ্যেই মিবারের হস্তচ্যুত সমস্ত অঞ্চলেই আবার মিবারের জয়পতাকা উড়তে লাগল। অনেকদিন বাদে মারাঠিদের দাপট থেকে মিবার মুক্ত হয়ে আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল।

মিবারের যোদ্ধারা যদি নিজেদের হৃত অঞ্চলগুলো উদ্ধার করেই ক্ষান্ত

থাকতো তাহলে বোধহয় আর কোন ঝড় পোয়াতে হত না। কিন্তু শক্তাবৎরা বিজয়ের উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা ভাবল, মারাঠিদের বিক্রম শেষ হয়ে গেছে, এবার একটু চেষ্টা করলেই তাদের রাজ্যগুলোও দখল করে নেওয়া যাবে। কিন্তু অহল্যাবাইয়ের প্রচণ্ড প্রতিরোধে তাদের সব স্বপ্ন ঘুচে গেল। অহল্যা হোলকারের বিধবা পুত্রবধূ। নিমহৈরী হস্তচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধিয়ার বিশাল সৈন্যদলের সঙ্গে তার সৈন্যবল একত্রিত করে মুন্দিসরের দিকে অভিযান করল। সিন্ধিয়ার নির্দেশে টুজিসিন্ধিয়া ও শ্রীভাই পাঁচহাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে শিবনানাকে সাহায্য করতে ছুটল। শিবনানা তখন মুন্দিসর দুর্গে রাজপুত সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে প্রাণ-পণ যুদ্ধ করে চলেছে, এমন সময় ঐ পাঁচ হাজার মারাঠি সৈন্য এসে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করল। ১৮৪৪ সংবতের ৪ঠা মাঘ মঙ্গলবার দুপক্ষে ভীষণ সংগ্রাম হল। রাজপুতরা এই পিছন দিক থেকে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তাই সৈন্যবাহিনী ছত্রখান হয়ে পড়ল। মারাঠিরা জৌদ ছাড়া বাকী সব দুর্গগুলোই আবার অধিকার করে নিল। শুধু মাত্র দীপচাঁদের অপূর্ব বীরত্ব কৌশলে জৌদ রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু মাস খানেক পরে দীপচাঁদ বুঝতে পারল, খুব বেশিদিন এভাবে সে জৌদ রক্ষা করতে পারবে না। তাই তার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মঙ্গলগড় দুর্গে চলে এল। এইভাবে একটু আলোর মুখ দেখতে না দেখতেই আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে ডুবে গেল রাজপুতরা।

এই ভয়াবহ যুদ্ধকালে চন্দাবৎ ছাড়া আর সব যোদ্ধাই রাণার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। এ সূত্রে রাণার নতুন মন্ত্রী সোমজির সঙ্গে দারুণ বিবাদ বেধে উঠল তাদের। কিন্তু রাণা কিছুতেই তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে শেষে রামপিয়ারীকে মধ্যস্থ করে শালুমব্রার সঙ্গে আপোষ করতে পাঠানো হল। শালুমব্রা শান্ত হল। ত্রুটি স্বীকার করার জন্যে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করতে এল উদয়পুরে। এটা একটা ছল, আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। উদয়পুরে এসেই সে মন্ত্রী সোমজির সঙ্গে দেখা করে একটা মিটমাট করার প্রস্তাব করল। সোমজি কিন্তু শালুমব্রার ষড়যন্ত্র বুঝতে

পেরেছিল। তার জন্যেই শালুমব্রা আজ পদচ্যুত। সোমজি দেখা করল না শালুমব্রার সঙ্গে।

একদিন সোমজি মন্ত্রণালয়ে রাজ-কাজে ব্যস্ত রয়েছে, এমন সময় কোরাবারের অর্জুনসিংহ এবং ভাদৈশ্বরের সর্দারসিংহ অতর্কিতে সেখানে এসে উপস্থিত। সর্দারসিংহ কঠিন কণ্ঠে সোমজিকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ সাহসে আপনি আমার ভূমিবৃত্তি কেড়ে নিয়েছেন, তার জবাব দিন।'

জবাবের কোন অপেক্ষা না করেই সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বের করে সোমজির বুকে আমূল বসিয়ে দিল। এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ফলে রাজ্যের মধ্যে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল। এই সময় রাণা স্হৈলিয়াবাড়ি (অপ্সরা-কানন) নামে এক বাগান বাড়িতে বেদনোরের জৈৎসিংহ ও অন্যান্য সর্দারদের নিয়ে আমোদপ্রমোদে উন্মত্ত ছিল। চার দিকে নাচগানের লহরা চলছে। মদের নেশায় এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। বাঈজীর কোলে মাথা রেখে কেউবা প্রলাপ বকে চলেছে। এমন সময় 'রক্ষা করুন রক্ষা করুন' বলে সোমজির দুইভাই ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল সেখানে। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করতে করতে সেই প্রমোদ-কক্ষেই ঢুকে পড়ল অর্জুনসিংহ। তখনও তার হাতে শাণিত ছুরিকা ধরা ছিল। হঠাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক। সুন্দরীদের পায়ের ঘুঙুর থেমে গেছে। যন্ত্রীদের হাত থেকে খসে পড়েছে ছড়। এক মুহূর্তের মধ্যে হাসি গানে মুখরিত এই বিলাস-ভবনের জলসাঘর নির্বাক নিথর হয়ে পড়ল। অর্জুনের দুঃসাহসিক স্পর্দ্ধায় সকলের মুখের ভাষা হারিয়ে গেছে। শুধু রাণা তাকে 'বিশ্বাস ঘাতক' বলে তিরস্কার করে সেখান থেকে দূর হয়ে যেতে বলতে পারল। রাণার কঠোর তিরস্কারে মাথা হেঁট করে তারা চিতোরে ফিরে গেল।

সোমজির দুই ভাই মন্ত্রী হয়ে শক্তাবৎদের সহযোগিতায় চন্দাবৎদের বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু যে কয়টি যুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছিল তার মধ্যে আকোলার যুদ্ধ ছাড়া আর কোনটিতেই শক্তাবৎরা জয়লাভ করতে পারল না। কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই ক্ষীরোদার যুদ্ধে

শক্তাবৎরা আবার পরাজিত হল। এই ভয়াবহ সংঘর্ষের ফলে দেশের লোকের যা দুর্দশা হল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সৈন্যদের অত্যাচারে ক্ষেতের ফসল দলিত হয়ে গেল। কর্মকার চর্মকারদের দিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করিয়ে এক পয়সা পারিশ্রমিক দিল না কেউ। না চন্দাবৎ না শক্তাবৎ। ব্যবসায়ীরা হাটেবাজারে পসরা খুলে বসতে পারল না। দিনে দুপুরে চুরি ডাকাতি লুঠপাঠ হতে লাগল। জীবনধারণ এবং মর্যাদা রক্ষার জন্যে লোকে দলে দলে মিবার ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে লাগল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মিবারের লোকসংখ্যা কমে অর্ধেকে ঠেকল।

দেশব্যাপী এই সংঘর্ষ সময়ে রাজায় প্রজায় ধনীতে নির্ধনে আর কোন প্রভেদ রইল না। সে-সময়ে যার দেহে শক্তি ছিল সেই শুধু আত্মরক্ষা করতে পারল। দুর্বলরা দলিত হল। রাণার অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠল। কোথায় সে প্রজাকে রক্ষা করবে, না নিজেই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। প্রজাদের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেল। রাজার ওপর আর নির্ভর না করে সবাই সাধ্যানুসারে আত্ম-রক্ষার উপায় সন্ধান করতে করতে লাগল। রাণার এই অকর্মণ্যতায় আরও নানা অনর্থের সৃষ্টি হল। যে সব কৃষকরা মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে যেতে রাজি হল না তারা আত্মরক্ষার জন্যে কোন কোন যোদ্ধার দ্বারস্থ হল। এই সুযোগে যাদের দেহে শক্তি ছিল তারা দুর্বল অসহায়দের ওপর প্রভুত্ব চাপাতে লাগল। কৃষকদের কাছে থেকে মোটা হারে পণ এবং ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে শুল্ক আদায় করতে লাগল। তাদের অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে সবাই পণ এবং শুল্ক দিতে বাধ্য হল। এমনি কি দেশের এই নিষ্ঠুর অরাজকতা দূর হওয়ার পরও তারা তাদের ঐ পণ-শুল্ক আদায় করেছিল বহুকাল যাবৎ। যাইহোক, এই ভয়ঙ্কর অন্তর্বিপ্লবের ফলেই মিবার অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছিল। এর উপর আবার মারাঠি দস্যুরা দলে দলে এসে হানা দিতে লাগল।

অন্য কোন উপায় না দেখে রাণা সিন্ধিয়ার সাহায্য চেয়ে পাঠাল। যে পাষণ্ড একদিন রতনসিংহর কাছে টাকা খেয়ে রাণার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল

আজ দায়ে পড়ে, নিরুপায় হয়ে তারই দ্বারস্থ হতে হল রাণাকে। অপদার্থ রাণা ভীমের অকর্মন্যতা ও কাপুরুষতা শিশোদীয় বংশের এক নিদারুণ কলঙ্ক। অনেকের ধারণা এ কাজে জলিমসিংহই রাণাকে প্রণোদিত করেছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। সিন্ধিয়া তখন লালসন্তযুদ্ধে পরাজিত হয়ে এক বিচক্ষণ ফরাসী যোদ্ধার হাতে সব দায়িত্ব দিয়ে পুষ্কর হ্রদের তীরে অবসর যাপন করছিল। ফরাসী সেনাপতি দিবোয়ের সুচারু শিক্ষাগুণে অল্পদিনের মধ্যেই মারাঠি সৈন্যরা যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হয়ে উঠেছিল। মৈরতা ও পত্তন ক্ষেত্রের যুদ্ধে তাদের অসীম বিক্রমের সামনে রাঠোররা দাঁড়াতে পারল না। রাঠোরদের হাত থেকে আবার তারা কেড়ে নিল তাদের হৃত অঞ্চলগুলো।

রাণার নির্দেশে মিবারের মন্ত্রীদের সঙ্গে জলিম গিয়ে দেখা করল সিন্ধিয়ার সঙ্গে। জলিমের মুখে রাণার প্রস্তাব শুনে রাজি হল সে।

জলিমসিংহ কোটার প্রতিনিধি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তার উচ্চাভিলাষের কাছে এ পদ কিছু না। সে চেয়েছিল, মিবারে চির-আধিপত্য করবে। জলিমসিংহ যেমন সুদক্ষ রাজনীতি বিশারদ তেমনি মানবহৃদয়ের সুক্ষ্মতম ভাবসংগ্রহেও পারঙ্গম। সে বুঝতে পেরেছিল, কাপুরুষ রাণা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না। রাণাকে সে হাতের পুতুল বানিয়ে রাখবে। তার দৃঢ়প্রত্যয় ছিল, জয়পুর এবং মারবারের দুই শক্তি একত্রিত হয়েও তার বিরুদ্ধে কিচ্ছু করতে পারবে না। জলিম জয়পুরের রাজাকে মনে মনে ঘৃণা করত। কারণ, সে কোটার সৈন্যবলের সাহায্য নিয়েই কুশাবহ সেনাবলকে পরাজিত করতে পেরেছিল। এদিকে মারবারের শ্রেষ্ঠ সামান্তরা তার সঙ্গে যে বন্ধুত্বের ব্যবহার করে আসছে তাতে মনে হয় না, তারা কখনও তার বিরুদ্ধে খাঁড়া ধরবে। রাজনীতিজ্ঞ, মনস্তত্ত্ব বিশারদ জলিমের উচ্চাশার পথে কোন বাধা নেই। তার আশা অবশ্যই ফলবতী হতে পারত, কিন্তু ভাগ্যটা ছিল নেহাতই মন্দ। তা না হলে অম্বজিকে সে অন্ধের মত বিশ্বাস করবে কেন? অম্বজির পিতা ত্র্যম্বকজি তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে, সেবা যত্ন করে পুনর্জন্ম দান

করেছিল। সেই থেকে ত্র্যম্বকজির ওপর তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ছিল। তার পুত্র অম্বজি জলিমের অন্তরের বন্ধু। পিতার সুকর্মের ফলে পুত্র লাভবান হয়েছিল। অম্বজির আচার আচরণে জলিমের মনে কোন সংশয় সন্দেহ ছিল না।

রাণা রাজ্যের সৈন্যবল বাড়ানো এবং শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার জন্যে জলিমের হাতে বেপরোয়া ক্ষমতা দিয়ে দিল। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই ছিল প্রথম সিঁড়ি। রাণা যে গুরুভার তার ওপর চাপিয়ে দিল তা যথাযথ পালন করতে হলে চাই প্রচুর টাকা। কিন্তু রাজভাণ্ডার প্রায় শূন্যই বলা চলে। তবু জলিম তাতে বিচলিত হল না। সে ঠিক করল, বিদ্রোহীরা যখন এই অনর্থের মূল তখন তাদের কাছে থেকেই এ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। রাজার খাসের যে সব সম্পত্তি চন্দাবৎরা অধিকার করে বসে আছে সে গুলো ছাড়া আরও চৌষট্টি লক্ষ টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এই টাকার তিন ভাগ সিন্ধিয়াকে দেওয়া হবে, এবং বাকী টাকা খরচ করা হবে রাজ্যের কল্যাণে। এই রকম পরিকল্পনা এঁটে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সে চিতোর অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। অম্বজির হাতে ঐ সেনাদলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হল। জলিম ও অম্বজি সসৈন্য চিতোরের দিকে এগোতে লাগল। পথের মধ্যে যার কাছে যা পেল আদায় করে নিল।

ধীরাজসিংহ নামে এক ব্যক্তি চন্দাবৎসর্দার ভীমের প্রধান পরামর্শদাতা। এই অভিযানের সময় ধীরাজ হামিরগড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিল। জলিম সব আগে গিয়ে হামিরগড়দুর্গ অবরোধ করল। ছয় সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর জলের অভাবে দুর্গের দ্বার খুলে দিতে বাধ্য হল তারা। পথের মধ্যে বসি নামে আর একটি দুর্গও অধিকার করে নিল। এই ভাবে আরও দুএকটি জায়গা দখল করে চিতোর দুর্গের নিচে এসে শিবির গাড়ল। ইতিমধ্যে রাণার কাছে থেকে পণের টাকা নেবার জন্যে সিন্ধিয়া এসে পৌছল।

যে রাণার দর্শন পাওয়ার জন্যে সারা ভারতের রাজারা উন্মুখ হয়ে থাকত, নানা উপহার নিয়ে চিতোর ও উদয়পুরের রাজদরবারে এসে

সাগ্রহে অপেক্ষা করত সেই রাণাকে সিন্ধিয়া ডেকে পাঠাল চিতোরের শিবিরে। সে জানাল, উদয়পুরে গিয়ে রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তার সম্ভব হবে না। শরীর নাকি খুব অসুস্থ। জলিম রাণার পদমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে উদয়পুরে গিয়ে সাক্ষাৎ কবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু সিন্ধিয়া যখন নিজের অক্ষমতা জানাল তখন সবই বুঝতে পারল। আজ অবস্থার দুর্বিপাকে মারাঠি-দস্যুও রাণাকে অপমান করতে চাইছে। কিন্তু উপায় নেই। শেষে রাণাকেই বেরুতে হল উদয়পুর ছেড়ে। রাজধানীর কাছেই ব্যাঘ্রমেরু পাহাড়ের মধ্যে রাণা এবং সিন্ধিয়ার সাক্ষাৎ হল। সিন্ধিয়া সসম্মানে রাণাকে অভ্যর্থনা জানাল। এর পরেই সিন্ধিয়া ফিরে এল আবার চিতোর সৈন্য-শিবিরে। এই সব ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল, কিন্তু এর মধ্যেই জলিমের ভাগ্য-বিবর্তন ঘটে গেল।

প্রাণের বন্ধু অম্বজিকেও কিন্তু মনের গোপন উচ্চাশার কথা কখনও বলে নি জলিম। কিন্তু বুদ্ধিমান অম্বজি সবই অনুমান করতে পারছিল। ভবিষ্যতে মিবারে জলিমের কি আসন হবে এবং তার জন্যেই বা কি বরাদ্দ হতে পারে সে অনুমান করেছিল। জলিম মিবারে একাধিপত্য করবে, আর অম্বজি তার অধীনে সামান্য এক সৈন্য-দলের সেনাপতি হয়ে থাকবে।

জলিমের অনুপস্থিতির সুযোগে তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার এক ষড়যন্ত্র এঁটে ফেলল অম্বজি। শালুমব্রা সর্দারের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করল সে। শালুমব্রাকে পরামর্শ দিল, 'আপনি যদি রাণাকে বিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন তাহলে ব্যাপারটা এখানে চুকিয়ে দিতে পারা যায়। তা না হলে জলিমের দাপটে আপনারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়বেন। এই বিশ লক্ষ টাকা পেলে আমি সিন্ধিয়া ও রাণাকে নিরস্ত হতে রাজি করাবো। এবং সেই সঙ্গে জলিমকেও দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

শালুমব্রার সঙ্গে জলিমের চির-বিরোধ। সুতরাং যখন ক্ষমতা পেয়েছে তখন হাতে মাথা কাটতে ছাড়বে না সে। তাই শালুমব্রা অম্বজির প্রস্তাবে একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। বললে, 'আপনি সব ব্যবস্থা করুন, আমি বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে রাণার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

এদিকে রাণার সঙ্গে সিন্ধিয়ার সাক্ষাৎ করিয়ে আবার চিতোর-শিবিরে জলিম ফিরে এলে অম্বজি শালুমব্রার প্রস্তাবের কথা জানাল। হঠাৎ এই ধরনের একটা হোঁচট খেতে হবে ভাবতে পারে নি সে। মনের কথা বুঝতে না দিয়ে খুশী হয়েই বললে, 'বেশতো, আমি মিবার থেকে চলে গেলে যদি এদের ঘরের বিবাদ মিটে যায় তবে আমি এখুনি রাজি। আমি তো চাই, এরা আবার এক হোক। রাণা আর সিন্ধিয়াজিকে জানাও ব্যাপারটা। তাঁরা যদি শালুমব্রার প্রস্তাবে রাজি হন তবে তো খুব আনন্দের কথা। ওরা রাজি হলেই আমি কোটায় রওনা হয়ে যাবো।

অম্বজি বললে, 'সেকি করে সম্ভব হয়! আপনাকে সরিয়ে এরা বিবাদ মেটাবে, এতে আপনি রাজি হলেও আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না।'

অম্বজির কথা শুনে জলিমের মনের উদারতা আরও প্রসারিত হয়ে পড়ল। বললে, 'আমরা চাই মিবারের মঙ্গল। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তো আমরা এখানে আসি নি। সুতরাং আমি মিবার ত্যাগ করলে যদি এদের কলহের অবসান হয় তবে এতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে আনন্দই করা উচিত আমার। তুমি রাণাকে খবর পাঠাও।'

জলিম ভেবেছিল, সে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেও রাণা কিছুতেই তাকে যেতে দেবে না। কিন্তু জলিমের সব অনুমান বিফল হয়ে গেল। শালুমব্রার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। এদিকে 'বিদায় উপহার' নিয়ে রাণার লোক এল জলিমের কাছে। বুকের আশা বুকে চেপেই মিবার থেকে বিদায় নিল জলিম। সেই দিন থেকে রাণার সঙ্গে জলিমের সব সম্পর্ক চুকে গেল। অম্বজিকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করে সিন্ধিয়া পুণায় প্রস্থান করল। যথা সময়ে তার প্রাপ্য টাকা যাতে সে নিয়মিত পায় সেজন্যে এক দল সৈন্য মোতায়েন করে গেল মিবারে।

আট বৎসর কেটে গেল। এই আট বৎসর ধরে অম্বজি মিবারের ওপর প্রভুত্ব করল। এ সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রায় বারো লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নিল অম্বজি। তার মধ্যে শালুমব্রার কাছে থেকে তিন লক্ষ, দেবগড় থেকে তিন লক্ষ, শিঙ্গিরা গিরি গোসাই থেকে দুই লক্ষ, কেশীতুল এক লক্ষ,

অমৈত তুই ও কোরাবার থেকে এক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। মিবারের প্রচুর অর্থ সে আত্মসাৎ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা মিবারের উন্নতিও হয়েছিল যথেষ্ট। দেশের মধ্যে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ছিল তা অম্বজির শাসন-গুণে দূর হয়েছিল। বহুকাল বাদে মিবারবাসীরা আবার সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পেয়েছিল।

যে বিশ লক্ষ টাকা সিন্ধিয়াকে দেওয়ার কথা ছিল তা কি ভাবে কোন কোন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হবে তার একটি তালিকা তৈরি করে সেই ভাবে আদায় করা হল। চন্দাবৎদের কাছে থেকে বারো লক্ষ টাকা এবং শক্তাবৎদের কাছে থেকে বাকী আট লক্ষ টাকা আদায় করেছিল সে। রাণার আধিপত্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহী সিন্ধি-সৈন্য ও সামন্তদের বিদ্রোহ দমন, কমলমীর থেকে রতনসিংহকে বিতাড়িত করা, মারবার রাজার কাছে থেকে গাদবারের পুনুরুদ্ধার এবং বুন্দি-রাজার সঙ্গে বিবাদ মেটানো, এই কয়টি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারলে রাণা অম্বজিকে ষাট লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এক বৎসরের মধ্যে কমলমীর থেকে রতনসিংহকে বিতাড়িত করল সে। বিদ্রোহী রণবৎ সর্দারদের হাত থেকে জিহাজপুর ও অন্যান্য সর্দারদের কবল থেকে রাণার সমস্ত ভূমি উদ্ধার করল। তার মধ্যে সিন্ধি সৈন্যদের কাছে থেকে রায়পুর, রাজনগর, পূর্বাবৎদের কাছে থেকে গুরলা, গদর মালা, সর্দারসিংহর কাছে থেকে হামির গড় এবং শালুমব্রার দখল থেকে কুরজ ও কোবারিও উদ্ধার হয়। এর ফলে মিবারের দারুণ উপকার হল। কিন্তু এছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ বাকী। অম্বজি সেদিকে মোনযোগ দিচ্ছে না কেন? মিবারের প্রভুত্ব হাতে পোয় অম্বজি নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। যে উৎসাহ উদ্যম নিয়ে সে কাজে নেমেছিল প্রচুর অর্থের এবং সম্মানের ঘুষে তা চাপা পড়ে গেল। গাদবার পুনরুদ্ধার হল না, বুন্দির সঙ্গে আপোষ মীমাংসার কথা সে ভুলে গেল। খ্যাতি প্রতিপত্তির মোহে 'মিবারের সুবাদার' উপাধি গ্রহণ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করল। এর কিছুকাল পরেই সে তার আসল রূপ খুলে ধরল। মারাঠিদের সঙ্গে সাট করে সে মিবারকে গ্রাস করতে

চাইল। মিবারবাসীরা কিন্তু অকৃতজ্ঞ নয়। অম্বজির দ্বারা মিবারের যে-টুকু কল্যাণ সাধিত হয়েছিল সে কথা স্মরণ করেই তারা তার সব অত্যাচার অবিচার নিরবে মুখ বুজে সহ্য করতে লাগল। এই সময়ে চন্দাবৎরা রাজ-সভায় পূর্ণ ক্ষমতা ফিরে পাওয়ায় মন্ত্রী সতীদাস এবং শিবদাস শঙ্কিত হয়ে উঠল। নিরাপত্তার জন্যে অম্বজিকে অনুরোধ জানাল তারা। মিবারে একটি সহকারী সেনাদল স্থাপনের জন্যে অম্বজিকে বলা হল। সতীদাস-শিবদাসের কথামত যথাযথ ব্যবস্থা করল অম্বজি। একটি স্বতন্ত্র সৈন্য বাহিনীর ব্যবস্থা করা হল। এ জন্য বছরে আটলক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দিল। হতভাগ্য রাণা মিবারের উন্নতি সাধনের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। একদিকে সামলাতে গিয়ে আর এক দিক বেসামাল হয়ে গেল। আসল কথা, অম্ব-জির আত্মসাতের ফলে মিবার অর্থশূন্য হয়ে পড়েছিল। অর্থের অভাবেই চারদিকে অনর্থ দেখা দিতে লাগল। রাজকোষ প্রায় খালি হয়ে এল। ধীরে ধীরে রাণা এমন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ল যে, ১৯৫১ সংবতে জয়পুর রাজকুমারের সঙ্গে নিজের ভগ্নীর বিয়ের সময় অম্বজির কাছে থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার করতে হয়েছিল। এর দুই বৎসর পরে মিবারে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। রাজমাতার মৃত্যু, রাণার নবকুমার লাভ এবং উদয় সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস। এই জলপ্লাবনের ফলে মিবারের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুর্দশা আরও বেড়ে গেল। কিংবদন্তী আছে, ভাদ্রমাসে রাণা ভগবতী গৌরীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই উপলক্ষ্যে নতুন উৎসব দেখে ভগবতী অসন্তুষ্ট হয়। দেবীর আক্রোশেই নাকি এই চরম দুর্ঘটনা ঘটে।

অম্বজির ভাগ্য আরও খুলে গেল। ১৮৫১ সংবতে সিন্ধিয়া সারা হিন্দুস্থানে তার নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করল। গণেশপন্থ নামে এক মারাঠিকে নিজের পদে বহাল করে অম্বজি মিবার থেকে বিদায় নিল। শোবে ও শ্রীজি নামে রাণার দুই কর্মচারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে গণেশপন্থ রাজকার্য দেখাশুনা করতে লাগল। এই তিনজনে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র

করে মিবারের ধনসম্পত্তি এমনভাবে আত্মসাৎ করতে শুরু করল যে শেষে বাধ্য হয়ে অম্বজি গনেশকে পদচ্যুত করে সেখানে রায়চাঁদকে বসাল। রায়চাঁদ অম্বজির প্রতিনিধি হয়ে এল বটে, কিন্তু কেউই তাকে মানতে চাইল না। দেশে আবার অরাজকতা শুরু হল। প্রজাদের ধন মান আবার বিপন্ন হয়ে পড়ল। যারা কিছু ক্ষমতাবান, নিজেদের স্বার্থ কায়েমের জন্যে নানারকম বিশৃঙ্খলা টেনে আনতে লাগল। তাদের অত্যাচর-উৎপীড়নে মিবার আবার প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল। সুযোগ পেয়ে মারাঠি দস্যু, অনার্য রোহিলা এবং ফিরিঙ্গিরা জনসাধারণের বিষয়সম্পত্তি লুঠপাঠ করে সর্বস্বান্ত করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে চান্দাবৎরাও সিন্ধি সৈন্যদের সঙ্গে সাট করে প্রজাদের পথে বসাতে লাগল। রাণা কোন উপায় না দেখে চন্দাবৎদের সমস্ত ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিল। রাণার সেনাদল কোরাবার দখল করে নিল এবং শালুমব্রার সামনে কামান সাজিয়ে রাখল। সিন্ধি সৈন্যরা শালুমব্রা পরিত্যাগ করে দেবগড়ের দিকে গা-ঢাকা দিল। চন্দাবংরা নিরুপায় হয়ে তাদের মুখপাত্র হিসেবে অজিত সিংহকে পাঠাল অম্বজির কাছে। অজিতসিংহর কাছে দশ লক্ষ টাকা ঘুস খেয়ে রায়চাঁদকে মিবার ছেড়ে চলে আসার নির্দেশ পাঠল অম্বজি। শিব দাস এবং সতীদাসকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে শালুমব্রা সর্দার রাজসভায় আবার প্রতিষ্ঠিত হল। অগ্রজি মেহতাকে মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করে শক্তাবৎদের আক্রমণ করল তারা। আবার দুই দলের মধ্যে ভীষণ বিরোধ বেধে গেল। কিন্তু অম্বজির সাহায্য পেয়ে শক্তাবৎদের পরাজিত করে ফেলল চন্দাবৎরা। শক্তাবৎদের ভূমিবৃত্তি থেকেই দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে অম্বজির চরণে উপহার দিল।

দুর্ধর্ষ মাধোজির মৃত্যু হল এর কিছুদিন পরে। যার অসাধারণ বাহুবলে সারা রাজস্থান একদিন কেঁপে উঠেছিল সেই নিষ্ঠুর মাধোজি আজ আর ইহলোকে নাই। সারা জীবন ধরে বহু রাজ্যের অপরিমিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছে সে, কিন্তু সে ধনসম্পত্তি তার দেশের মঙ্গলের জন্যে ব্যয় না করে কৃপণের মত সঞ্চয় করে গেছে শুধু। আজ তার মৃত্যুর পর সে-সব ধনরত্ন

কি কাজে লাগবে!

মাধোজির মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র দৌলতরাও জোরজার করে তার সিংহাসন অধিকার করে বসল। তখন মাধোজির জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক। সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নীদের সঙ্গে দারুণ কলহ বেধে গেল দৌলতের। এই সুযোগে অম্বজি কিছু গুছিয়ে নেবার তালে ছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। মাধোজির বিধবা পত্নীরা, লাকুবা, খীচিরাজ দুর্জনশাল ধাতনগরীর রাজা এবং আরও অনেক পরাক্রমশালী ব্যক্তির প্রচণ্ড বাধা তাকে কাবু করে ফেলেছিল। মিবার থেকে অম্বজির আধিপত্য খতম করার জন্য লাকুবা মিবারের রাণাকে গোপনে এক পত্র পাঠাল। মিবার-রাজকে অনুরোধ করা হল, অম্বজির প্রতিনিধিকে অস্বীকার করে মিবার থেকে যেন তাড়িয়ে দেয় তাকে।

মারাঠি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় শৈনবীরা মিবারের নানা স্থানে ভূমিবৃত্তি ভোগ করছিল। এরা সবাই লাকুবার দলের। লাকুবার বিরুদ্ধাচারণ অনুমান করে অম্বজি মিবারে তার প্রতিনিধিকে নির্দেশ পাঠাল, 'শৈনবীদের সমস্ত সম্পত্তি অবিলম্বে কেড়ে নাও।' পত্র পেয়ে অম্বজির প্রতিনিধি গণেশপন্থ রাণার সঙ্গে পরামর্শ করল। রাণা এবং তার সর্দাররা গণেশপন্থর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক ষড়যন্ত্র রচনা করল। শৈনবী ব্রাহ্মণদের গোপনে গোপনে সমস্ত বিষয় জানিয়ে রাণা বলে পাঠাল, তাঁরা যেন গণেশকে আক্রমণ করে, রাণা ভিতরে ভিতরে তাহাদের সাহায্য করবে। রাণার নির্দেশ মত শৈনবীরা সদলবলে গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান করল। এদিকে গণেশপন্থ তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করার জন্য বিপুল সৈন্য সামন্ত নিয়ে এগিয়ে গেল। শাবা নামে এক জায়গায় দুইদলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। গণেশপন্থ পরাজিত হল, তার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিক ওদিক প্রস্থান করল। তার অনেকগুলি কামান ও বন্দুক শৈনবীদের হস্তগত হল। গণেশপন্থ চিতোরের দিকে পালিয়ে বাঁচল। চন্দাবৎরা সাহায্য করবে এই প্রলোভন দেখিয়ে আবার তাকে যুদ্ধে নানাল। কিন্তু চন্দাবৎরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং গণেশপন্থ পরাস্ত হয়ে হামিরগড় দুর্গে

আশ্রয় নিল। তখন চন্দাবৎরা পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে হামীরগড় অবরোধ করল। এই অবরোধ কালে পরপর নয়বার মহাবীরত্ব দেখিয়েছিল গণেশ পন্থ। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। হামির গড়ের সর্দারের দুই পুত্র এই যুদ্ধে প্রাণ হারাল।

অম্বজির সাহায্যে এই মহাসঙ্কট থেকে গণেশপন্থ মুক্তি পেয়েছিল। গণেশপন্থ বিপদগ্রস্ত শুনে গোপালরাও কদম নামে এক সেনাপতির অধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাল অম্বজি। এদের সাহায্যে হামিরগড় থেকে মুক্তিলাভ করে আজমীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল সে। কিছুদূর এগিয়ে মসামুসি নামে এক জায়গায় আবার আক্রান্ত হল গণেশ। চন্দাবৎদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে গণেশের সৈন্যরা একে একে প্রাণ হারাতে লাগল। চন্দাবৎদের জয় অনিবার্য, ঠিক এই সময় এক বিপর্যয় ঘটে গেল। একটি তুরগী অশ্ব ছুটে পালাচ্ছিল, এবং তার পিছু ধাওয়া করতে করতে কয়েকজন গণেশের সৈন্য 'ভাগা ভাগা' চিৎকার শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে অশ্বটি ধরা পড়ল। তখন তারা 'মিলগিয়া মিলগিয়া' বলে চিৎকার করতে লাগল। চন্দাবৎরা অনুমান করল, তাদের দলের একটা বড় অংশ গণেশের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দাবৎ সৈন্যদল ছত্রখান হয়ে গেল। মুসামুসি রণ-ক্ষেত্রে চন্দাবৎরা নিদারুণভাবে পরাজিত হল। অম্বজির প্রতিনিধি যুদ্ধে জয়লাভ করল বটে, কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িক বিপ্লবের মধ্যে নিজেদের অভিষ্ট সাধন করতে সমর্থ হল না।

যেদিন গনেশপন্থ মুসামুসি যুদ্ধে জয়ী হল সেদিন থেকে থেকে ভারতে সিন্ধিয়ায় প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার জন্যে লাকুবার সঙ্গে অম্বজির ঘোর বিরোধ বেধে উঠল। আর এই ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতার রঙ্গভূমি হয়ে দাঁড়াল হতভাগ্য মিবার। এতকাল যে মারাঠা-দস্যু অক্টোপাশের মত মিবারের রক্ত শুষে খেয়েছে আজ লাকুবা তার প্রতিদ্বন্দী। সুতরাং মিবারের সর্দাররা সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল। গনেশপন্থর সেনাদল হামিরগড়ে অবস্থান করছে জেনে লাকুবা

হামিরগড় দুর্গ অবরোধ করে অবিরত গোলা বর্ষণ করতে লাগল। গোলার আঘাতে দুর্গপ্রাকারের এক অংশ ধসে পড়ল। লাকুবা উৎসাহিত হয়ে সেই ভগ্নদ্বার দিয়ে দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করতে যাবে এমন সময় ইঙ্গলিয়া বাপু সিন্ধিয়া এবং ঈশ্বরবন্ত সিন্ধিয়া সদলবলে হামিরগড়ে উপস্থিত হল। কোটার জালিমসিংহর সেনাদল এসেছিল লাকুবার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে। এই সব সেনাদলের অধিনায়ক হয়ে এসেছিল অম্বজির পুত্র। লাকুবা নিরুপায় হয়ে অবরোধ উঠিয়ে চিতোর প্রাকারমূলে শিবির গাড়ল। এই অবকাশে হামিরগড় পরিত্যাগ করে গোসুন্দ নগরে গিয়ে নতুন সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হল গনেশ। শীর্ণকায়া বিরিশ নদীর দুই তীরে কামান সাজিয়ে দুপক্ষই সমর-প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এই সময় সৈন্যদের পাওনাগণ্ডা নিয়ে গণেশ ও বলরাওয়ের মধ্যে গোলযোগ বাধায় সব আয়োজন পণ্ড হওয়ার দাখিল হল। তাদের বিবাদ কিছুতেই মিটল না। গণেশ তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সঙ্গনার নামে এক জায়গায় চলে গেল।

গণেশ সসৈন্যে চলে যাওয়ায় দুই পক্ষ পরস্পরের সমকক্ষ হয়ে উঠল। কিন্তু ধূর্ত বলরাও কখনই যুদ্ধের পক্ষপাতী নয়। সম্মুখ-সমরে নামতে রাজি হল না সে। গেগুল-চাপরার যুদ্ধের সময় বলরাওয়ের জীবন রক্ষা করেছিল লাকুবা। আগেকার উপকার স্মরণ করে লাকুবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইল না বলরাও। তার যুদ্ধ না-করার সপক্ষে আরও এক যুক্তি মেলে। শোনা যায়, সে-সময় বলরাও দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে ছিল। লাকুবা সে-অভাব পূরণ করতে চাইলে দুজনের মধ্যে এক গোপন সন্ধি হয়। যে কারণেই হোক, যুদ্ধ স্থগিত রইল। লাকুবা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। উভয় পক্ষই কিছুদিন শান্তিতে দিন কাটাল। কিন্তু অম্বজির প্ররোচনায় সে-শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। গণেশকে সাহায্য করার জন্যে সিদলাণ্ড নামে এক ইংরেজ যোদ্ধার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল অম্বজি। জর্জ টমাস নামে অন্য এক যোদ্ধার সাহায্য পাওয়ার পর লাকুবার প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠল। সে বুনাসের দক্ষিণ তীরে উভয়ের

সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে ঘোর বর্ষার মধ্যে ছয় সপ্তাহ ধরে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় অবস্থান করতে লাগল। এতকাল রাণা লাকুবাকেই সমর্থন করে আসছিল। কিন্তু দুই পক্ষের কাছ থেকেই নানা রকম সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার দরুণ সুবিধে মত দুই দলকেই সমর্থন করতে লাগল।

গণেশপন্থ যাতে নতুন সেনাদলের সহযোগিতা না পায় সে জন্যে খীচি-রাজ দুর্জনশাল মিবারের সর্দার ও পাঁচ শো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গনেশের সেনা-কটকের চার পাশে টহল দিতে লাগল। কিন্তু টমাস দুর্জনের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে, শাপুর থেকে নতুন সৈন্যদল নিয়ে গণেশের সঙ্গে মিলিত হল। এর পরেই লাকুবাকে আক্রমণ করার জন্যে সে বুনাস নদীর দিকে এগিয়ে গেল। এই সময় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি নেমে এল, তার সব উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শাপুর দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায় তার আশ্রয়ও রইল না। এ ঘটনা ১৮৫৬ সংবতের। এই সুযোগে মিবারের সর্দারদের সাহায্যে ঐ সব বিচ্ছিন্ন সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাকুবা তাদের দলিত মথিত করে ফেলল। পণেরটি কামান ও বহু অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নিল। শাপুররাজ গণেশকে রসদ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছিল, কিন্তু এই দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হাত গুটিয়ে নিল সে। উপায় না দেখে সঙ্গনার দিকে পালিয়ে গেল গণেশ। প্রতিদ্বন্দ্বী লাকুবাকে সাহায্য করার জন্যে মিবারের সর্দারদের ওপর দারুণ ক্রোধে জ্বলতে লাগল সে। সুযোগ পেলে সমুচিত শাস্তি দেবার সঙ্কল্প করল মনে মনে। সুযোগও এল একদিন।

বর্ষা কেটে গেল। পথঘাট শুকিয়ে উঠল। অম্বজির কাছ থেকে প্রচুর সৈন্য সাহায্য এল, লাকুবার বিরুদ্ধে আবার তৈরি হল গনেশ। আরাবল্লী পাহাড়ের সানুদেশে চন্দাবৎদের যে-সব ভূসম্পত্তি ছিল, তছনছ করে ফেলল গনেশের সৈন্যরা। সেখানকার অধিবাসীদের ওপর পৈশাচিক উৎপীড়ন শুরু করল। তার নিষ্ঠুরতায় শতশত ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শত শত নিরীহ নরনারী নিহত ও নিপীড়িত হল। গৃহস্থের ধন-রত্ন লুঠ করল। এতেও নিস্তার পেল না তারা, অসহায় প্রজাদের

ওপর দুর্বহ করভার চাপিয়ে দিল গনেশপন্থ। এদিকে টমাস দেবগড় ও অমৈত অবরোধ করে সেখানকার দুই সর্দারকে কর দিতে বাধ্য করল। ক্রমে কেশীতুল ও লুশানী নামে আরও দুটি নগর অধিকার করে নিল তারা। লুশানীর অধিবাসীরা টমাসের বশ্যতা স্বীকার করল না সহজে। প্রাণপণ লড়াই করল। ফলে লুশানী প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল টমাসের অত্যাচারে। একের পর এক জয় লাভ হল গণেশের। নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছে গিয়েছিল সে। ঠিক এই সময় অম্বজির ভাগ্যবিবর্তন ঘটে গেল। হাত থেকে হিন্দুস্থানের কর্তৃত্ব চলে গেল, এবং তা পেল শত্রু লাকুবা। বল্লভতানশিয়া ও বকস্থ নারায়ণ এই সময় সিন্ধিয়ার মন্ত্রীর পদে বহাল ছিল। এরা দুজনই শেনবী গোত্রের ব্রাহ্মণ। সুতরাং স্বজাতি লাকুবাকে সাহায্য করেছিল নানাভাবে। অম্বজির সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে শৈনবীদের সর্বনাশ করতে গিয়েছিল, কিন্তু শৈনবীরাই তার কাল হল। অম্বজির পতনের পর গণেশপন্থ মিবারে অধিকৃত সমস্ত নগর-দুর্গ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। এই ভাবে দুই হিন্দু বীরের প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই বেধে গেল। কিন্তু এতে মিবারের কোন লাভ হয় নি। বরং অনর্থ আরও বেড়ে উঠল। এই সময় থেকে সিন্ধিয়া মিবারকে তার অধীনের করদরাজ্য বলে গণ্য করতে লাগল।

নতুন প্রতিনিধি লাকুবা সিন্ধিয়ার আদেশে কতকগুলো সৈন্য-সামন্তসহ মিবারে এসে হাজির হল। কি উদ্দেশ্যে যে তাঁকে মিবারে পাঠান হল তা কেউ বুঝল না। কিন্তু হঠাৎ লাকুবা উপস্থিত হওয়ায় মিবারবাসীদের হৃদকম্প শুরু হল। অগ্রজি মেহতা, রাণার মন্ত্রিপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। এবং চন্দাবৎরা পেল রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার ইচ্ছায় শাপুর রাজার হাত থেকে জিহাজপুর কেড়ে নিয়ে তার ছত্রিশটি নগর বন্ধক দেওয়া হল। বিচক্ষণ জলিমসিংহর বহুকালের লোভ ছিল এই জিহাজপুরের ওপর। এই সুযোগে লাকুবাকে ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে জিহাজপুর নিজের দখলে নিল জলিম। ছয় লক্ষ টাকা পেয়েও কিন্তু লাকুবার অর্থলিপ্সা গেল না। আরও চব্বিশ লক্ষ টাকা চেয়ে বসল

সে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য রাণার নেই, জানত লাকুবা। তাই সে রাণার মুখ চেয়ে না থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে, বল প্রয়োগ করে, ভয় দেখিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করল সে-অর্থ। সাময়িকভাবে তার লোভ প্রশমিত হল। যশবন্তরাওভাও নামে এক মারাঠিকে সহকারী কর্মচারী নিযুক্ত করে জয়পুরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

এই সময়ে ভারতে ইংরেজরা ধীরে ধীরে মাথা-চাঁড়া দিচ্ছিল। তাদের নিখুঁত রণ-নীতি অনুসরণ যোগ্য। রাজমন্ত্রী অগ্রজীর সহকারী প্রতিনিধি মৌজিরাম ইংরেজদের যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে সামরিক-শক্তি গঠন করার পক্ষপাতী। কিন্তু বিদেশী সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্য রাখতে গেলে অতুল অর্থের প্রয়োজন। রাজস্ব যা আদায় হয় তা দিয়ে এই বিপুল ব্যয় বহন করা নিতান্ত অসম্ভব। সুতরাং সর্দারদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছায় এক ঘোষণাপত্র পাঠানো হল। কিন্তু সর্দাররা এমনিই অনুগত যে ঘোষণাপত্র পাওয়া মাত্র হতভাগ্য মন্ত্রীকে কারারুদ্ধ করে দেশ-প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করল। সতীদাসকে আবার মন্ত্রিত্ব দেওয়া হল। চন্দাবৎদের ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন ভয়ে তার ভাই শিবদাস কোটায় গিয়ে বাস করছিল। তাকেও ডেকে আনা হল। চন্দাবৎরা পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজপরিবারের অধিকাংশ খাস ভূসম্পত্তিই বিনা বাধায় ভোগ দখল করতে থাকল।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দ। ইন্দোরের যুদ্ধে হোলকারের পরাজয় ঘটল। হোলকার-সিন্ধিয়ার যুদ্ধে দেড় লক্ষ সৈন্যর সমাবেশ হয়েছিল। মহারাষ্ট্র রাজ্যের ভাগবিধাতা নিরুপণ হল সেদিন। হোলকার পালিয়ে আশ্রয় নিল মিবারে, কিন্তু তাতেও পরিত্রাণ পেল না সে। সদাশিবরাও এবং বলরাওএর নেতৃত্বে সৈন্যরা তাড়া করতে করতে ছুটে এল মিবারে। মিবারে ঢোকার পথে রাতলামদুর্গ লুঠপাঠ করল হোলকার। এবং শক্তাবৎদের প্রধান দুর্গ ভিণ্ডির আক্রমণ করে বিপুল পণ চেয়ে বসল। শক্তাবৎরা ভীত হয়ে পড়ল। কিভাবে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

তারই উপায় চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু ভেবে কোন কুলকিনারা করতে পারল না। ইতিমধ্যে রাণার কাছে খবর পৌঁছল, হোলকার ভিণ্ডির আক্রমণ করেছে। ভিণ্ডির উদ্ধারের কথা সে আদৌ ভাবল না, তার শুধু ভয়, এবার সে উদয়পুরে এসে হানা দেবে। তা যদি হয় তবে কে রক্ষা করবে সে বিপদ থেকে। ভয়ে বুক শুকিয়ে যায় রাণার। যাক, এই মৃত্যুসম নিদারুণ ভীতি থেকে অব্যাহতি পেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। সিন্ধিয়ার সৈন্যরা তীরবেগে ছুটে চলল ভিণ্ডির দুর্গের দিকে। হোলকার ভিণ্ডির ছেড়ে নাথদ্বারে উপস্থিত হল। সব আশা ভরসার একেবারে ইতি হয়ে গেছে। সুতরাং আত্মদহনে জ্বলতে জ্বলতে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মূর্তির সামনে লুটিয়ে পড়ে দেবতার নিষ্ঠুরতা উল্লেখ করে বার বার অভিশাপ দিতে লাগল সে। শেষে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক মূর্তি ধারণ করে পুরোহিতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা পণ দাবি করল। যারা অর্থ দিতে পারল রেহাই পেল, আর যারা পারল না তারা বন্দী হয়ে উৎপীড়ন সহ্য করতে লাগল হোলকার-শিবিরে।

হোলকার হিন্দু হয়ে হিন্দুর দেবতা ও মন্দিরের ওপর এমন নিষ্ঠুর আক্রমণ করবে, নাথদ্বারের প্রধান পুরোহিত দামোদরজি তা স্বপ্নেও ভাবে নি। দামোদরজি দেখল, বিপদ অনিবার্য, এ অবস্থায় দেবমূর্তি এবং তার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করতে না পারলে কিছুই রক্ষা হবে না, তাই নাথদ্বারের অধিপতি কোতারিও-সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে উদয়পুরে সরিয়ে নেওয়া মনস্থ করল। বিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে কোতারিও-সর্দার দেববিগ্রহকে উদয়পুরে রেখে এল। ফেরার পথে নিজের নগরের কাছে এসে গেছে, এমন সময় তাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল হোলকারের সেনাদল।

'—তোমাদের অশ্বগুলো আমাদের দিয়ে দিতে হবে। এখুনি নেমে পড়, নইলে বুঝতেই পারছ···'

চৌহান-পৃথ্বীরাজের বংশধর কি ক'জন মারাঠা-দস্যুর ভ্রূকুটিতে ভয় পায়। কোতারিও-সর্দার সদর্পে বললে, 'সিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করে কি

জম্বুকের পদানত হতে হবে? প্রাণ যায় যাক, তবু দস্যুর কাছে মাথা নত করা চৌহানের পক্ষে সম্ভব না।'

হোলকারের সৈন্যরা অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে কোতারিওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাত্র বিশজন অশ্বারোহী। সাধ্যমত যুঝে বীরের মত প্রাণ উৎসর্গ করল সবাই। মিবারের মাটি যখন কাপুরুষতার অন্ধকারে ডুবে গেছে সে-সময় চৌহান-কোতারিওর এই তেজস্বিতা এক জলন্ত ব্যতিক্রম। কোতারিওর মৃত্যুতে নাথদ্বার সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। হিন্দুকুলাঙ্গার হোলকার সেই পুণ্য দেবভূমিতে হানা দিয়ে মন্দিরের সমস্ত সামগ্রী লুঠ করল। দেব-সম্পত্তি ভেবেও দুর্বৃত্তের কঠোর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ধর্মানুরাগের সঞ্চার হল না। তার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় দেবভূমি শ্মশান হয়ে গেল।

উদয়পুরে গিয়েও নিশ্চিন্তে দেবতার উপসনা করতে পারল না দামোদর। অপদার্থ রাণার অন্তঃপুরে নানারকম স্বৈরাচার চলত, ফলে দেব-আরাধনায় বাধা সৃষ্টি হতে লাগল। ছ'মাস পরেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে সে গাসিয়ার পাহাড়ের মধ্যে চলে গেল। সেখানে একটি মন্দির তৈরি করে তার চারপাশ দিয়ে উঁচু প্রাচীর তুলে সুরক্ষিত করল। কিন্তু দামোদর তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কেবলই তার মনে হতে লাগল, ব্রহ্মার কোপ থেকে আর কিছুতেই বুঝি ইষ্টদেবতাকে রক্ষা করা যাবে না। এ ধারণা যখন বদ্ধমূল হয়ে গেল তখন সে তরবারির সাহায্যে দেব-ভূমিকে দস্যু কবল থেকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প হল। অল্প-কালের মধ্যেই চারশো অশ্বারোহী ধার্মিক-যোদ্ধা তার দলে যোগ দিল। সেই সব হরিভক্ত ধর্মবীরদের সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই গাসিয়ার পাহাড় থেকে নেমে এসে নিজের এলাকার সমস্ত বিষ্ণুপীঠের তত্ত্বাবধান করতে যেত সে।

সিন্ধিয়ার ভয়ে কোন জায়গাতেই আস্তানা গাড়তে পারল না হোলকার। নাথদ্বার লুঠ করে সে শাপুর ও বুনেরার মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে করতে আজমীরে গিয়ে হাজির হল। আজমীরে মহম্মদ খাজাপীরের দর্গা ছিল। লুণ্ঠিত ধন-রত্নের বেশ খানিকটা দর্গাতে সেলামী দিয়ে জয়পুরের দিকে পাড়ি দিল। সিন্ধিয়ার সৈন্যরা যখন সারা মিবার খুঁজেও আর হোলকারের

সন্ধান পেল না তখন রাণার কাছে গিয়ে তিন লক্ষ টাকা পণ দাবি করে বসল। কিন্তু রাজ-ভাণ্ডার তখন প্রায় খালি। এদিকে টাকা না দিলেও পরিত্রাণ নাই। রাজপরিবারের দব্যসামগ্রী এবং কুলনারীদের রত্নালঙ্কার বিক্রয় করে সাইলক মারাঠিদের অর্থ-লালসার কিছুটা মেটাল। সিন্ধিয়া তিন লক্ষ টাকা পেয়ে শান্ত হল, কিন্তু মিবারের সুবাদার যশোবন্তরাওভাও এক তালিকা তৈরি করে সেই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করার জন্যে কর্মাধ্যক্ষ তানসিয়াকে নির্দেশ দিল। অর্থসংগ্রহের ধূম পড়ে গেল চার দিকে। সর্দার, সামন্ত, কৃষক ও বণিক দুর্দান্ত মারাঠি দস্যুর অনুচরদের পাশবিক অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে যথা-সর্বস্ব দিয়ে দিতে বাধ্য হল। তাতেও অব্যাহতি পেল না তারা। নিরীহ প্রজাদের বন্দী করে মুক্তিপণ চাওয়া হল। যারা দিতে পারল না তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করল মারাঠিরা। ১৫৫৯ সংবতে মারাঠিদের এই নৃশংস অত্যাচারে মিবার একেবারে ধনশূন্য হয়ে গেল।

এই সময়ে নিজের প্রভুর কাছে দারুণ অপমানিত হয়ে, মর্মান্তিক বেদনায় শালুম্ব্রার আশ্রয়ে এসে প্রাণত্যাগ করল লাকুবা। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অম্বজির ভাই বলরাও এসে আবার আগের ক্ষমতা অধিকার করে বসল। সেই সঙ্গে শক্তাবৎরা ও মন্ত্রী সতীদাস মিলিত হয়ে চন্দাবৎদের মন্ত্রগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিল। জলিমসিংহ চন্দাবৎদের ঘৃণা করত, তাই তারা পদচ্যুত ও বিতাড়িত হওয়াতে খুব খুশী হল সে। এই সুযোগে সে শক্তাবৎদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাণার মন্ত্রী দেবীচাঁদকে কারারুদ্ধ করল। চন্দাবৎরা দেবীচাঁদকে মন্ত্রীর গদী দিয়েছিল। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে বলরাও চন্দাবৎদের বিষয় সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার চালাতে লাগল। তার রোষানলে কত চন্দাবতের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হল, ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার হিসেব করা যায় না। চন্দাবৎরা একজোট হয়ে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে লাগল।

এদিকে মারাঠিরা রাজপ্রাসাদে এসে মৌজিরামকে দেখতে চাইল। কিন্তু রাণা জানত, মৌজিরামকে পেলেই তারা হত্যা করবে। রাণা কিছুতেই তাকে তাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হল না। প্রথমে তারা অনুরোধ

করল, তারপর ভয় দেখাল, রাণার ঐ এক কথা, কিছুতেই সে তাকে ওদের হাতে দেবে না। শেষে বলরাও রাজপ্রাসাদের ভেতরে হানা দেবার জন্যে এক সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু রাণার সচিব কৌশল করে তাদের সকলকে বন্দী করে ফেলল। নানা গণেশপন্থ, জুমুলকর ও উদাকুয়ারকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। উদাকুয়ার ছিল এক নিষ্ঠুর পাষণ্ড। ওর গলায় তপ্ত লৌহশলাকা গেঁথে হত্যা করা হল। বলরাওকে রুদ্ধ করে রাখা হল এক স্নানাগারের মধ্যে। এর পর চন্দাবৎরা নগরের বাইরে মারাঠা শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মমভাবে দলিত মথিত করে ফেলল। হিয়ার্সে নামে এক ইংরেজ-সেনাপতি মারাঠি সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চন্দাবৎরা নির্মমভাবে তাদের প্রহার করতে করতে বিতাড়িত করল।

বলরাও এর দুরবস্থার কথা শুনে জলিম ব্যথিত, কিছু চিন্তিত হল। বলরাও তার প্রাণের বন্ধু, সে আজ শত্রুর হাতে বন্দী। কি ভাবে তাকে মুক্ত করা যায়, সেই চিন্তা ব্যাকুল করে তুলল তাকে। ভিণ্ডির এবং লাওয়ার শক্তাবৎদের সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর সামনের বৈজা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হল। রাণা যদি ঐ সব বিদ্রোহী মারাঠি সর্দারদের বন্দী করেই হত্যা করতে পারত তাহলে অনেক পথের কাঁটা দূর হত। রাণা হয়তো ভয় করেছিল, ওদের হত্যা করলে সিন্ধিয়ার ক্রোধ থেকে সে অব্যাহতি পাবে না। প্রায় ছয় হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে বৈজা পাহাড়ের দ্বার পথ অবরোধ করল রাণা। পাঁচদিন ব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করেও মারাঠি সৈন্যরা রাণার সেনাবাহিনীকে কাবু করতে পারেনি। কিন্তু ছয়দিনের দিন রাণা পরাজিত হয়ে বলরাওকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। এই উপলক্ষে যে সন্ধি হল, তাতে সমগ্র জিহাজপুর জলিম পেল। এবং সিন্ধিয়া নিয়ে গেল বিপুল যুদ্ধ-পণ।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আবার ভিণ্ডির আক্রমণ করল। এবার সে সম্পূর্ণ তৈরি। যে কোন শত্রুর বিক্রম চূর্ণ করার শক্তি সে অর্জন করেছে এতকাল ধরে। ভিণ্ডির দুর্গ ধ্বংস হয়ে

যায়, এই আশঙ্কায় হোলকারকে দুই লক্ষ টাকা পণ দিয়ে আপোশ করল শক্তাবৎরা। এবার লক্ষ্য উদয়পুর, হোলকারের সৈন্যরা উদয়পুরের দিকে ধেয়ে আসছে শুনেই রাণার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। হোলকারের চর অজিতের মাধ্যমে রাণা জানাল, সে সন্ধি চায়। হোলকার বললে, 'সন্ধি হবে, চল্লিশ লক্ষ টাকা চাই।'

'—চল্লিশ লক্ষ! কোথায় পাবো অত টাকা, আমার ঘটিবাটি শুদ্ধ বিক্রি করলেও তো এ টাকার জোগাড় হবে না।'

রাণা কেঁদে ফেলল। অজিত স্তোক দিয়ে বললে, 'কেঁদে তো কূল পাবেন না। যেমন করে হোক, যতটা হোক যোগাড় করুন, তারপর আমি দেখছি, কতটা কি করা যায়।'

রাণা পুরনারীদের দেহের সোনাদানা খুলে নিয়ে মোহর বানাল, নিত্য-ব্যবহারের দামিদামি জিনিষগুলো বিক্রি করে দিল। আর সর্দারদের কাছ থেকে যা আদায় হল তা দিয়ে বারো লক্ষর বেশী হয় না। কোথায় চল্লিশ আর কোথায় বারো? রাণা বললে, 'বাকী টাকার দায় রইল আমার, আমি ধীরে ধীরে শোধ করে দেব?'

হোলকারের দূত জবাব দিল, 'কিন্তু আপনি যে সে-টাকা দেবেনই এমন কি বিশ্বাস···'

রাণা আহত হল, 'বেশ, আমি আমার পরিবারের এবং প্রজাদের মধ্যে থেকে বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে দেহ-বন্ধক রাখছি হোলকারের কাছে। টাকা দিয়ে ছাড় করিয়ে নেব।'

এ প্রস্তাবে হোলকার রাজি হল। রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এদিকে তার আদেশে মারাঠি সৈন্যরা লাওয়া এবং বেদনোর অধিকার করে নিল। সেখান থেকেও প্রচুর মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়ল তারা। এতেও ক্ষান্ত হল না, দেবগড় দুর্গ আক্রমণ করে সেখানকার সর্দারের কাছ থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা আদায় করল।

অবশেষে মারাঠিদের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার দিন শেষ হয়ে এল। তাদের চেয়েও পরাক্রান্ত বৃটিশরা এসে হানা দিল ভারতে। তাদের শৌর্য

ও বিক্রম দেখে দুর্দান্ত মারাঠিরাও ভয়ে শিউরে উঠল। মারাঠির সিংহাসন টলমল করে কাঁপতে লাগল। ভারতের মাটিতে ধীরে ধীরে তাদের বিস্তার দেখে আশঙ্কায় বুক শুকিয়ে গেল। কিন্তু এই বিদেশী শক্তিকে সমূলে উপড়ে ফেলতে না পারলে তাদের বিপদ অনিবার্য। তাই মারাঠিরা একজোট হয়ে বিটিশের বিরুদ্ধে খাঁড়া ধরল। হোলকার-সিন্ধিয়ার মধ্যে এত দিনের বিরোধ মুহূর্তে মিটে গেল। আজ জাতির সঙ্কটের দিন। গৃহবিবাদ ভুলে সবাই রুখে দাঁড়াল বিদেশীর বিরুদ্ধে!

কিন্তু দুর্ভাগ্য, হোল্লকার-সিন্ধিয়ার যুক্ত প্রচেষ্টাতেও বৃটিশের গতিরোধ করা যায় নি। শেষে তারা নিঃসহায় নিঃসম্বল হয়ে বৃটিশেরই দয়া ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল।

বৃটিশের দাপটে মারাঠারা আর মাথা তুলতে পারল না। হোলকার আবার নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে হোলকার-সিন্ধিয়ায় যুক্ত প্রচেষ্টায় বেদনোরের বিশাল ক্ষেত্রে মারাঠিসৈন্যরা সমবেত হল। দস্যুবৃত্তি করে এতকাল ধরে যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছিল, বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার সবই খুইয়ে বসেছিল তারা। নর্মদা নদীর দক্ষিণে যে বিশাল স্বর্ণপ্রসবিনী জনপদটি এতকাল তারা ভোগদখল করে আসছিল তাও হারিয়েছে তারা বৃটিশের আক্রমণে। যে-সব সৈন্যদের সাহায্যে এতদিন তারা দেশ-নগর লুঠপাঠ করেছিল আজ সময়মত বেতন না দিতে পারার দরুন সে-সেনাবলও হারিয়েছে তারা। সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে চারদিকে উন্মত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রাম-নগর লুঠপাঠ করতে শুরু করল। তাদের এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ দমন করার মত তেমন কোন ক্ষমতাই ছিল না হোলকার-সিন্ধিয়ার। বিদ্রোহী মারাঠি-সৈন্যরা নিবারে এসে প্রজাদের ওপর নিদারুণ উৎপীড়ন করতে লাগল। যার কাছ থেকে যা পেল তাই আদায় করতে শুরু করল। যারা অর্থ দিতে পারল তারা নিষ্কৃতি পেল, আর যারা দিতে পারল না তারা পাষণ্ডদের হাতে মরল। তাদের অমানুষিক অত্যাচারে মর্মভেদী আর্তনাদ করতে লাগল নিবার।

রাজস্থানের এই ভীষণ দুর্দিনে বৃটিশরা এসে মারাঠিদের বিতাড়িত করতে লাগল। মারাঠিদের অসহ অত্যাচারের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় অনেক হিন্দু রাজারাও বৃটিশের সহায় হয়ে মারাঠি বিতাড়নের কাজে এগিয়ে এসেছিল। এই সুযোগে বৃটিশরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে লাগল। রাজস্থানের অনেক রাজাই বৃটিশের বশ্যতা স্বীকারে করে নিল।

ইংরেজ ও মারাঠিদের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কিছুদিনের জন্যে থামল। কিন্তু মারাঠিরা দারুণ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে নিজেদের পরিবারবর্গ ও ধনরত্নাদি মিবারের কোন কোন দুর্গের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে লাগল। চন্দাবৎ-মুখপাত্র সর্দারসিংহ সিন্ধিয়ার রাজসভায় রাণার মুখপাত্র নির্বাচিত হল। অম্বজি পুনরায় সিন্ধিয়া মন্ত্রগৃহের সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে বসল। মিবাররাজ এর আগে অম্বজির প্রতিদ্বন্দ্বী লাকুবার পক্ষ নিয়েছিল, সে কথা সে ভুলে যায় নি এখনও।

রাণার ঐ আচরণ অম্বজির মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কালের প্রলেপে সে আগুন প্রায় নিভে আসছিল, কিন্তু আবার অনুকূল হাওয়ায় প্রচণ্ড বেগে জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ প্রবৃত্তি ভয়ঙ্কর হয়ে মাথা চাঁড়া দিল। প্রধান প্রধান মারাঠি সৈন্যদের মধ্যে মিবারের ভূমি বণ্টন করে দেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল। কিন্তু তার বদমাইশি কাজে পরিণত করতে পারেনি অম্বজি। সুযোগ বুঝে শক্তাবৎরাও হোলকারের সঙ্গে জোট করে মিবার লুটেপুটে নিতে এগিয়ে এল। শক্তাবৎসর্দার সংগ্রাম-এর চেয়েও আর এক প্রচণ্ড বিরোধী শক্তি রুখে দাঁড়াল অম্বজির এই হীন আচরণের বিরুদ্ধে। তার নাম বাইজিবাই, অম্বজির প্রভুপত্নী। বাইজিবাই রাজপুত শত্রু সিন্ধিয়ার ঘর করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার হাড়ে মাসে মজ্জায় ছিল মিবারের প্রতি অসীম দরদ। রাজস্থানের সমস্ত রাজ্য, বিশেষ করে মিবারকে সে দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। সে জানত, মিবারই হিন্দু-স্বাধীনতার লীলাভূমি। শঠ শূরজিরাওএর ঔরসে জন্মেও বাইজিবাই মহিয়সী নারী হতে পেরেছিল। অম্বজির দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে

সমগ্র রাজপুত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তার চেষ্টায় চন্দাবৎ-শক্তাবৎরা এত দিনের বিবাদ ভুলে আবার একজোট হল। তারা শপথ নিল, পিতৃপিতামহ বংশের লীলাভূমি মিবারকে মারাঠা দস্যুর কবল থেকে তারা মুক্ত করবেই করবে। চন্দাবৎ সর্দারসিংহ এতদিন সিন্ধিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধেছিল, কিন্তু অম্বজির ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে সিন্ধিয়াকে পরিত্যাগ করে তার চির-শত্রু শাক্তাবৎ সংগ্রামএর সঙ্গে এসে কাঁধ মেলাল। তারপর মন্ত্রী কিষণদাসের সঙ্গে পরামর্শ করে হোলকারকে তারা জিজ্ঞেস করল, 'মহারাষ্ট্ররাজ, আপনি কি অম্বজিকে মিবার বিক্রি করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন।'

একথা শুনে হোলকার বিস্মিত, ব্যথিত হল। দৃঢ়কণ্ঠে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'না। তা কখনই আমি তা হতে দেব না। আপনারা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ ভুলে গিয়ে সংঘবদ্ধ হন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মিবারকে আমরা রক্ষা করবই।'

এ শুধু মৌখিক স্তোক না। চন্দাবৎ-শাক্তাবৎকে সঙ্গে নিয়ে সিন্ধিয়ার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হল হোলকার।

'—আপনি জানেন, রাণার জন্ম কিরূপ উচ্চ বংশে। আমাদের যিনি প্রভু, বিবেচনা করে দেখলে, রাণা তাঁরও পূজনীয়।'

সেতারা রাজারা সিন্ধিয়া ও হোলকারকে সামন্ত রাজার মর্যাদা দিয়েছিল। মিবারের রাণা এই সেতারা রাজাদের পূজনীয় ব্যক্তি।

হোলকার বললে, 'এই ঘোর সঙ্কট সময়ে মিবারের সর্বনাশ করা আমাদের উচিৎ না। তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করা ঠিক না। আপনি কি বলেন?' একটু থামল, সিন্ধিয়ার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল হয়ত বা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'মিবারের যেসব বন্ধকী ভূসম্পত্তি এতকাল আমরা ভোগদখল করছি, কোথায় সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দেব, না নতুন করে বাকী সম্পত্তিগুলোও গ্রাস করার জন্যে হাত বাড়াচ্ছি! ছিঃ, একথা ভাবতেও আমার বুক টনটন করে ওঠে। আপনার যা অভিরুচি করুন। কিন্তু আমি বলে

যাচ্ছি, এমন সম্পত্তিতে আমার আর কাজ নেই। আমি রাণার পক্ষ ছাড়া অন্য কোন পক্ষে যাব না। বিশ্বাস না হয় দেখুন, এখনই আমি নিমহৈরী প্রদেশ আবার রাণার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

হোলকারের এই দীপ্ত ঘোষণা শোনার পরও নীরব রইল সিন্ধিয়া। হোলকার অনুমান করতে পেরেছিল, সিন্ধিয়া বিচলিত হয়েছে। তাই, তখনই আর কিছু না বলে শুধু বললে, 'এখনই আপনি কোন অভিমত দেবেন না। ভাবুন, খুব ভাল করে ভাবুন। তার পর যা ঠিক করেন জানাবেন। আজ ফিরিঙ্গিরা আমাদের দেশে এসে হানা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বোধহয় অনিবার্য। এ অবস্থায় আমাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার ধন-রত্ন নিরাপদে রক্ষা করার মত স্থান কোথায়? মিবারে সুরক্ষিত দুর্গ আছে অনেক। আমাদের বিপদের দিনে এই সব দুর্গগুলো যদি ব্যবহার করতে চাই তাহলেও মিবারের রাণার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা একান্ত প্রয়োজন।'

হোলকারের এই দূরদর্শিতায় মুগ্ধ হল সিন্ধিয়া। তখনই তার কথায় রাজি হয়ে রাণার দূতদের শিবিরে আশ্রয় দিল।

হোলকার-শিবির থেকে সিন্ধিয়া-শিবিরের দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল। যখন খুশী ইচ্ছা হলেই সাক্ষাৎ করার সুবিধা ছিল না। প্রবল বৃষ্টি-পাতের ফলে পথ ঘাট দুর্গম হয়ে পড়লে এই দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছু দিনের জন্যে। তখন বর্ষাকাল। বাইরে অবিশ্রান্ত জল ঝরছে। হোলকার শিবিরের মধ্যে বসে, এমন সময় এক প্রতিহারী এসে একখানা পত্র দিল। আগ্রহের সঙ্গে পত্রখানা খুলে ধরল, কিন্তু কিছু অংশ পড়ার পরই ক্রোধে ধক ধক করে জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। ছুঁড়ে ফেলে দিল একপ্রান্তে। প্রতিহারীকে নির্দেশ দিল, 'রাণার দূতদের এখনি ডেকে আন।'

ঐ চিঠিতে হোলকার জানতে পারল, রাণার ভীরুবক্স নামে একজন দূত মারাঠিদের মিবার থেকে বিতাড়িত করার জন্যে বৃটিশ সেনাপতি লর্ড লেকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। কিষণদাস ও মিবারের অন্যান্য প্রতিনিধিরা হোল-কারের সামনে এসে হাজির হল। কিষণদাসের হাতে চিঠিখানা ধরিয়ে

দিয়ে হোলকার চিৎকার করে উঠল, 'বিশ্বাস ঘাতক, তোমরা শেষে আমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করলে ? মিবারবাসীরা কি সকলের সঙ্গে এই-ভাবে বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে থাকে ! ভেবে দেখ, তোমার প্রভুর জন্যে আমি আমার সমস্ত আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত হয়েছি। সিন্ধিয়ার ক্রোধ বা জিঘাংসার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলাম না, একমাত্র তোমাদের মুখ চেয়েই। তারই কি এই পুরস্কার ! কোথায় ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আপোশহীন সংগ্রাম করে দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করবেন রাণা, তা না আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ! দিল্লীর সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করি না বলে তিনি যে অহঙ্কার করতেন এই কি তার পরিণাম ! এই প্রতিদান পাওয়ার লোভেই কি আমি অম্বজিকে নিরস্ত করেছিলাম !'

কিষণদাস কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারিষদরা বাধা দিয়ে বললে, 'মহারাজ, আপনি এই রঙ্গরাদের (রাজপুতদের রঙ্গরা বলত ওরা) কীর্তি কলাপ সবই প্রত্যক্ষ করলেন। এরা সিন্ধিয়ার সঙ্গে আপনার বিবাদ বাধিয়ে আপনাদের দুজনকেই খতম করতে চায়। দেখুন, উদ্দেশ্য এখন জলের মত পরিষ্কার। আপনি এদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ দিন। শূরজিরাওকে তাড়িয়ে অম্বজিকে আবার মিবারের সুবাদার নিযুক্ত করুন। আমাদের কথা যদি না শোনেন তবে আমরা সকলেই আপনাকে ছেড়ে সিন্ধিয়াকে নিয়ে মালবে চলে যাব।'

একমাত্র ভাওভাস্কর ছাড়া অন্য সব মন্ত্রীই এই কথার প্রতিধ্বনি করল। হোলকার শূরজিরাওকে বিদায় করে দিল। বৃটিশ সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে উত্তরের দিকে অভিযান করল। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য সামনে। সর্ব শক্তি দিয়ে,আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে ইংরেজের মুখোমুখি রুখে দাঁড়াতে পারল না। সহায় সম্বল কিছুই নেই তার। এদিকে বৃটিশ সেনাপতি লর্ড লেক সন্ধি স্থাপন করাতে বাধ্য করল হোলকরেকে। মনের আশা মনেই শুকিয়ে গেল। বিপাশার তীরে বৃটিশ সেনাপতির সঙ্গে মারাঠি বীরের সন্ধি হল।

মিবারের ওপর হোলকার ক্রুদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে অনিষ্ট

করে নি সে মিবারের। বরং মিবার পরিত্যাগ কালে সিন্ধিয়াকে অনুরোধ করেছিল, 'দেখবেন, মিবারের যেন সর্বনাশ না হয়। অম্বজির অত্যাচার থেকে রাণাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি। আমার যেন মুখ রক্ষা হয়। যদি আমার এ অনুরোধ আপনি রক্ষা না করেন তবে তার জন্যে আপনাকেই দায়ী হতে হবে।'

ভয়ে হোক আর অনুরোধেই হোক, কিছুদিনের জন্যে হোলকারের এই অনুরোধ সে রক্ষা করেছিল। অবশেষে হোলকারকে বিপন্ন দেখে আর চুপ করে থাকতে পারল না। মিবার থেকে ষোল লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার জন্যে সদাশিবরাওকে পাঠিয়ে দিল। নররাক্ষস সদাশিব গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে মিবারের গ্রামনগরে হানা দিতে লাগল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিন্ধিয়ার সৈন্যরা লুঠতরাজ শুরু করেছিল। এই গোলন্দাজবাহিনী পাঠাবার দুটি প্রধান কারণ ছিল। এক ঐ টাকাটা সংগ্রহ, দ্বিতীয় জয়পুরের সেনাদলকে উদয়পুর থেকে বিতাড়িত করা। রাণার কন্যার সঙ্গে জয়পুর-রাজের বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হওয়ায় দুইপক্ষের সংবাদ ও যৌতুকাদি বহন করার উদ্দেশ্যে রাজকুমারের সৈন্যদল তখন উদয়পুরে বাস করছিল। কিন্তু আর বেশীদিন তাদের থাকতে হল না সেখানে।

অদৃষ্টের ফেরে মিবারের রাণা ভীমসিংহ আজ সহায়সম্বলহীন এক সাধারণ সামন্তরাজা মাত্র। কিন্তু একদিন গিহ্লোট বংশের রাণাদের দাপটে সারা মেদিনী কাঁপত। তাঁদের শৌর্যবীর্য বিত্তবৈভব সব রাজার আদর্শ ছিল। আজ কিছু নেই। কালে আর জলে ধুয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে সুখে দুঃখে এক রকম করে দিন কাটছিল। কিন্তু ভীমসিংহর এই সাধারণ জীবন যাত্রাতেও বিধি বাধ সাধল। রাণার কোন উপায় নেই, অবলম্বন নেই। শুধুমাত্র স্বর্ণপ্রতিমা কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মুখ চেয়ে সে সব দুঃখ, সব বেদনা তুচ্ছ করতে পারছিল। শেষে তাকে নিয়েই সে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ল। এখন কৃষ্ণকুমারীই তার জীবনে, রাজ্যে একমাত্র সঙ্কট।

জয়পুরের তিন হাজার সেনাদল এসে শিবির স্থাপন করেছিল উদয়পুরে।

তারা বিবাহের যৌতুকাদি বয়ে নিয়ে এসেছিল উদয়পুরে। রাণা সাদরে ঐসব উপঢৌকন গ্রহণ করে যথাসাধ্য প্রতিউপহার পাঠাল তাদের শিবিরে। কিন্তু মানসিংহ এই বিয়েতে দারুণ গণ্ডগোল পাকিয়ে বসল। জয়সিংহর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে সেও তিন হাজার সৈন্য সহ যৌতুক উপঢৌকনাদি পাঠাল উদয়পুরে। এবার রাণা ভীমসিংহ প্রমাদ গণল। কন্যা তার একটিই। অথচ দুই রাজাই তার পাণিপ্রার্থী। একজনকে খুশী করলে আর একজন রুষ্ট হবে, সন্দেহ নেই। মানসিংহর বক্তব্য, এর আগে মারবারের রাজার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল, সে জীবিত নেই, এ সিংহাসনে মানসিংহ বসেছে আজ, তবে কেন তার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দেওয়া হবে না! নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যে যে যুক্তি দেখিয়েছিল তা অদ্ভুত। মানসিংহ দূত পাঠিয়ে দাবি জানাল, মারবার অধিপতির সঙ্গে যখন বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তখন মারবারে যিনিই রাজা থাকুন তা বিচার করা অনাবশ্যক। শেষে ভয় দেখিয়ে বলে পাঠাল, 'আমার বাসনা যদি পূর্ণ না হয় তবে এও ঠিক, জগৎসিংহর সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ সম্পন্ন হতে দেব না আমি। তা সে যে উপায়েই হোক।'

অনেকে বলে, মানসিংহর সর্দাররা তাকে এই ব্যাপারে অসৎ পরামর্শ দিয়ে উত্তেজিত করেছিল। সে-সময় চন্দাবৎরা রাণার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাজা মানসিংহ চন্দাবৎ মুখপাত্র অজিতকে ঘুষ খাইয়ে হাত করল। কৃষ্ণ-কুমারীকে মানসিংহর করে সমর্পণ করার জন্যে পরামর্শ দিতে লাগল চন্দাবৎ অজিত।

অনিন্দ্য সুন্দরী হেলেনএর রূপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল ট্রয় নগরী। তার মত রূপসী নারী পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায় না। কৃষ্ণকুমারীকে যারা দেখেছিল তাদের ধারণা, স্বর্গের নন্দনকাননের দেব-কন্যারাও বোধহয় তার রূপের কাছে ম্লান দেখাবে। হেলেনের মত তার রূপও মিবারের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কৃষ্ণার জন্যে মানসিংহ অম্বররাজের বিরুদ্ধে খাঁড়া ধরল। দুর্বৃত্ত মারাঠি দস্যুরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেনি। এর আগে সিন্ধিয়া

জগৎসিংহর কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু জগৎসিংহ তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় সে মানসিংহর পক্ষ নিয়ে কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে বাধা দিতে লাগল। রাণাকে সে বলে পাঠাল, এখনি জয়পুরের সমস্ত সৈন্য উদয়পুর থেকে বিদায় করে দিতে হবে। সিন্ধিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, রাণা কখনও তার নির্দেশ আমান্য করতে পারবে না। কিন্তু রাণা সাফ জানিয়ে দিল, সিন্ধিয়ার নির্দেশ মানতে সে রাজি না। সিন্ধিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে, রাণাকে উপযুক্ত প্রতিফল দেবার জন্যে গোলন্দাজবাহিনী পাঠাল উদয়পুরে। তাদের গতিরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে নিজের এবং জয়পুরের সৈন্যদল সহ আরাবল্লীর প্রবেশ পথে দাঁড়াল রাণা। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর মন্দভাগ্য রাণারই পরাজয় হল। শেষে আত্মরক্ষার জন্যে নগর মধ্যে পালায়ন করল। সিন্ধিয়ায় আটহাজার সৈন্যরা পিছন পিছন তাড়া করে রাজধানীর কাছে এসে শিবির গেড়ে বসল। রাণা ভীমসিংহ মহাসঙ্কটে পড়ল। এ বিপদ থেকে কি ভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায় তার উপায় চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু কিছুই কিনারা করতে পারল না। অবশেষে ঠিক করা হল, জগৎসিংহর সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। জয়পুরের সৈন্যদলকে বিদায় দিয়ে দিল। এবং সিন্ধিয়ার বিপুল অর্থের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল সে। এক মাসকাল ঐ শিবিরে অবস্থান করার পর ভগবান এক লিঙ্গের মন্দিরে রাণার সঙ্গে সিন্ধিয়ার দরবার হল। নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে সিন্ধিয়া বৃটিশ-দূত ও তার দলবলকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

মিবার থেকে জগৎসিংহর দলবল ফিরে আসায় জগৎসিংহ ক্ষুব্ধ হল। তার সব আশা ছাই হয়ে গেল! সে ভেবেছিল, কৃষ্ণকুমারীকে অঙ্কশায়িনী করে সুখ-সম্ভোগে কাল কাটাবে, কিন্তু রাণার এই ব্যবহার শেল হয়ে বুকে বাজল। নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারল না, বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিবার আক্রমণে চলল জগৎসিংহ। ঐ সময় এত বড় সৈন্যবাহিনী আর কখনও সাজানো হয় নি। এদিকে মারবারপতি মানসিংহ এ সংবাদ শুনে জগৎসিংহকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক বিরাট সৈন্যদল

সংগ্রহের আয়োজন করতে লাগল। কিন্তু ঐ সময়ে মারবারে ঘোর অন্তর্বিপ্লব চলছিল, তাই তার পরিকল্পনা কাজে রূপায়িত হল না সহজে। সিংহাসন নিয়ে চলছিল কাড়াকাড়ি, সেই সুযোগে মারাঠি দস্যুরা ঢুকে সারা রাজ্য তছনছ করে ফেলেছিল।

মানসিংহ জগৎসিংহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগে মারবারের প্রধান সামন্ত সর্দাররা মানসিংহর উৎপীড়নের প্রতিশোধ নেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। আর একজন রাজা খাড়া করে তার পক্ষ নিয়ে সর্দাররা মানের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে লাগল। জয়পুরের এক লক্ষ সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানকে আক্রমণ করল তারা। মানসিংহর সৈন্যবল স্বল্প, কিছুতেই এঁটে উঠতে পারল না জয়পুরের সঙ্গে, নিদারুণ ভাবে পরাজিত হয়ে নিজের তরবারি দিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল মান। কিন্তু তার অনুরক্ত সঙ্গীরা তাকে নিরস্ত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। তবু পরিত্রাণ পেল না, শত্রুসৈন্যরা তার অনুসরণ করতে করতে রাজধানীর তোরণদ্বারে এসে অবরোধ করল। ছয়মাস ধরে অবরুদ্ধ থাকার পর রসদ ফুরিয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত শত্রুসৈন্যরা ঢুকে পড়ল রাজধানীর মধ্যে। যে যা পেল লুঠপাঠ করতে শুরু করল। এই সূত্রে কচ্ছবাহ সৈন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক-বিবাদ জোরদার হয়ে ওঠায় সেনাবল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই সুযোগে রাঠোর বীররা বেপরোয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে নির্মমভাবে শত্রুসৈন্য হত্যা করতে লাগল। চারদিকে ভয়ঙ্কর বিপদ। মহারাজ জগৎসিংহ বেকায়দা বুঝে পালয়ন করল। তার সব বিক্রম, আস্ফালন এক ধাক্কাতেই শূন্যে মিলিয়ে গেল, পুরবৎমরও যোধপুরের লুণ্ঠিত ধনরত্ন জয়পুরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু পথের মধ্যে রাঠোর সৈন্যরা আক্রমণ করে আবার সব উদ্ধার করে নিয়ে এল। যে সব সামন্ত-সর্দররা মানসিংহর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল তারা মাতৃভূমির এই লাঞ্ছনা দেখে ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়ে আবার মানসিংহর দলে চলে এল। তারা বুঝেছিল, অম্বরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে তারা হাত না মেলালে কিছুতেই রাঠোর-দুর্গ লুঠ করতে সাহস পেত না কচ্ছবাহরা।

চাকা ঘুরে গেছে। জগৎসিংহ সঙ্কটাপন্ন। মানসিংহর সঙ্গে যুদ্ধে তার সব আশা ভরসার ইতি হয়ে গেল। সেনাদল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অতিকষ্টে মাবারের মধ্য দিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে এল। মিবার আক্রমণের সাধ মনের মধ্যে শূন্য হয়ে গেল। কি কুক্ষণে সে কৃষ্ণকুমারীকে গৃহলক্ষ্মী করার স্বপ্ন দেখেছিল। মানসিংহকে আক্রমণ করার দুর্মতি কেন যে হয়েছিল। দারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটাতে লাগল সে। সৈন্যদের বেতন দেবার সামর্থ্য নেই, প্রায় অনাহারেই মরতে লাগল সকলে। ধীরে ধীরে এক শ্মশানপুরী হয়ে উঠল জয়পুর।

মানসিংহর সুদিন উপস্থিত। সামন্ত-সর্দারদের আক্রোশে পড়ে এক সময় সে দারুণ বিপদে পড়েছিল। দুর্যোগের ঘোর কালোমেঘ কেটে গেছে। ভাগ্য এখন সুপ্রসন্ন। আমীর খাঁ নামে এক পাঠানের সাহায্যে একে একে সব হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করল। যে সব নৃশংস মুসলমান ভারতের মাটি কলঙ্কিত করেছে আমীর খাঁ তাদের মধ্যে একজন। এর আগে আমীর খাঁ মানসিংহর সঙ্গে প্রবল শত্রুতা করেছে, আজ সে বন্ধুর মুখোশ পরে পাশে এসে দাঁড়াল। মানসিংহর বিপক্ষ দলের সঙ্গে আঁতাত করে এসেছে সে এতদিন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে আজ এসে কাঁধ মেলাল মানসিংহর সঙ্গে। এতকাল ধরে যে তাকে সম্মান এবং গৌরবে ভরিয়ে রেখেছিল আজ সে তারই সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লাগল।

এক মসজিদের মধ্যে বিপক্ষ রাজার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করল কুচক্রী আমীর। মানসিংহর বিপক্ষ রাজাও উপস্থিত ছিল সেখানে। শঠ আমীর তাকে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতির ভাঁওতা দিল। হতভাগ্য অপ-নৃপতি তার কারসাজি বুঝতে না পেরে জালে জড়িয়ে পড়ল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে। এক মুখর উৎসবের আয়োজন করা হল। তাঁবুর মধ্যে নাচগানের লহরা চলতে লাগল। মদের ফোয়ারা ছুটল। এই সুযোগে পাপিষ্ঠ আমীর তাঁবুর দড়িতে বসাল কোপ। তাঁবুর কাপড়ে জড়িয়ে প্রতিটি নরনারীকে নির্মমভাবে হত্যা করল নররাক্ষস আমীর।

রাজবারার রঙ্গমঞ্চে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হল। শুধু এই

নয়, এর চেয়েও অরেও এক মর্মান্তিক দৃশ্য তখনও বাকী ছিল। নির্মল শতদল-সদৃশ কৃষ্ণকুমারীর হৃৎপিণ্ডের বিনিময়ে মিবারের দাউ দাউ করে জ্বলে-ওঠা আগুন প্রশমিত হল।

মারবার এবং অম্বরের যুদ্ধ এক রকম থেমে গেল ঠিকই, কিন্তু যাকে নিয়ে এই যুদ্ধ সেই কৃষ্ণকুমারীর আশা কেউই ত্যাগ করতে পারল না। আমীর খাঁর প্ররোচনাতেই মানসিংহর মনে আবার আশার মুকুল ধরেছিল। ষোড়শী-সুন্দরী কৃষ্ণকুমারীকে অঙ্কলক্ষ্মী করার বাসনা আবার প্রবল হয়ে উঠল তার।

কৃষ্ণকুমারীর দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে। সিগ্ধ সৌন্দর্যের তীরে এসে আছাড় খায় কামনার ঢেউ। তার চোখের তারায় অনেক সপ্ন, অনেক প্রেম, অফুরন্ত বাসনা। কিন্তু হায়, সেই অনাঘ্রাত ফুল কোন পূজার থালাতেই স্থান পেল না। সূর্যের প্রচণ্ড তেজে শুকিয়ে ঝরে গেল সে ধুলোয়। 'রাজস্থানের কমলিনী' কৃষ্ণার নিরুপম রূপযৌবন অতৃপ্ত হয়েই বিদায় নিল। তার মত পরমাসুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায় না। পিতৃকুলে সে উচ্চ শিশোদিয়, মাতা আনহলবারা পত্তনের সৌর-কন্যা। এই দুই উচ্চকুলের রক্ত প্রবাহিত তার ধমনীতে। তাই সে মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যে নিজের জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত নেহাত অল্প। রোমের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নিউসিয়সের কন্যা বার্জিনিয়া। এপিয়স ক্লডিয়ম নামে এক ব্যক্তি বার্জি-নিয়াকে অপহরণ করার চেষ্টা করেছিল। নিউসিয়াস প্রাণাধিকা কন্যার সতীত্ব রক্ষার কোন উপায় না দেখে প্রকাশ্য ফোরাম প্রান্তরে নিজের হাতে হত্যা করেছিল তাকে। আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ গ্রীসে আছে। মহাযোদ্ধা এগমমনের কন্যা ইফিজিনিয়া। আলীসদ্বীপে গ্রীসের যুদ্ধ-জাহাজ চড়ায় আটকে যায়। ডিয়ানা দেবীর প্রসাদ লাভ করে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে দেবীর চরণে কন্যা ইফিজিনিয়াকে বলি দিয়েছিল। অবশ্য গ্রীস পুরাণে উল্লেখ আছে, দেবী ডিয়ানা বলি দিতে না দিয়ে, নিজে গ্রহণ করে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিল।

হতভাগ্য রাঠোর অপ-নৃপতিকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর পাষণ্ড আমীর খাঁ উদয়পুরে এসে হানা দিল। তার মত নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক নর-খাদক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমীরখাঁ দাবি জানাল, কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহর হাতে সমর্পণ করতে হবে। তা না-হলে ভীমসিংহকে রেহাই দেবে না সে। এ ব্যাপারে আমীরকে সাহায্য করেছিল বিশ্বাসঘাতক চন্দাবৎ অজিতসিংহ। রাণা ভীমসিংহ এই মহা বিপদে পড়ে দারুণ চিন্তিত, ভীত হয়ে পড়ল। কি ভাবে প্রাণাধিক কন্যার জীবন ও মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা হয় তার কোন উপায় ঠিক করতে পারল না সে। অবশেষে ঠিক হল, কষ্ণাকে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু এই পাপ-কর্মের নয়ক হবে কে? এমন কে আছে যে নির্মল শতদলকে দলিত করবে।

সর্দার সামন্ত এবং আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে এক জরুরী সভা ডাকল রাণা। দৌলতসিংহ নামে শিশোদিয় কুলের এক সামন্ত উপস্থিত ছিল সেখানে। তাকেই বলা হল এই লোমহর্ষক কাণ্ডের অভিনেতা হওয়ার জন্যে। রাণার নির্দেশ শুনে ঘৃণায়, বিস্ময়ে শিউরে উঠল দৌলত।

'—না, না, এ কিছুতেই সম্ভব না আমার পক্ষে, আমি পারব না। তার বদলে আমাকে বলি দেওয়া হোক, আমি এই নৃশংস কাজের নায়ক হতে পারব না। রাণার আজ্ঞা পালনে আমি অক্ষম, এ কথায় রাজভক্তির অবমাননা হল জানি, কিন্তু এই নিষ্ঠুর কাজ করে আমি রাজভক্তির নিদর্শন রাখতে চাই না।'

দৌলতসিংহ ছুরিকা গ্রহণ করল না। এর পর মহারাজ যোয়ানদাসের ওপর এই নৃসংশ কাজের ভার দেওয়া হল। ভীমসিংহর পিতার এক উপপত্নীর গর্ভে তার জন্ম। বেশ্যা-গর্ভজাত বলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, সে স্বভাবত পাষাণ-প্রাণ। এই কঠোর নির্দেশ শোনার পর তার হৃদয় ব্যথিত হওয়া দূরে থাক বিচলিত হল না একটুও। কিন্তু কৃষ্ণার মুখো-মুখি এসে দাঁড়াতেই তার সারা দেহমন শিউরে উঠল। শানিত ছুরিকা খসে পড়ল হাত থেকে। প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল সে সেখান থেকে। মুহুর্তের মধ্যে এই পৈশাচিক হত্যা-কাণ্ডের কথা ছড়িয়ে পড়ল সারা

অন্তঃপুরে। রাণার এই অভিসন্ধির কথা শোনামাত্র রাণী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

কৃষ্ণকুমারীকে রক্ষা করার কোন উপায় নাই। মর্মভেদী আর্তনাদে রাজঅন্তঃপুর গুমরে উঠল। আবালবৃদ্ধবণিতা চোখের জলে ভিজিয়ে দিল বুক। রাণা নিজে যাকে উৎসর্গ করতে চায় কেউ কি তাকে বাঁচাতে পারে? কিন্তু হত্যাই বা করবে কে তাকে। অতিবড় পাষাণ-হৃদয় ছুরিকা ফেলে পালিয়ে গেছে। তার রূপের বহ্নির সামনে দাঁড়াতে সাহস নেই কারো। অন্তত কোন রক্তমাংসে গড়া পুরুষ তা পারল না। শেষে নিযুক্ত করা হল এক নারীকে। না, ছুরিকা দিয়ে না, বিষ খাইয়ে মারা হবে তাকে। বিষের বাটি কৃষ্ণকুমারীর হাতে তুলে দেওয়া হল, রাণার নির্দেশ। সব জেনে শুনেও বিষপাত্র সুধাপাত্র জ্ঞান করে পান করল কৃষ্ণা। কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুই হল না। বিষ কোন ক্রিয়া করতে পারল না তার দেহে। মা ধূলায় লুটিয়ে মাথা কুটছে। কিন্তু রাণার নির্দেশের কোন রদ হল না। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে কিছু অনুমান করা সম্ভব না। তার চোখে জল নেই, শান্ত সমাহিত মুখমণ্ডল। কোনও নিশ্চিত শঙ্কা তাকে এক বিন্দু বিচলিত করতে পাবে নি। মুখে তার কথা নেই, চোখের পলক পড়ছে কি পড়ছে না বোঝা যায় না। যেন এক ইন্দ্র-লোক-বাসিনীর মর্মর মূর্ত্তি। মাতার আকুল ক্রন্দনে কথা বলল সে, 'মা, কেন কাঁদছ মা, কাঁদার তো কোন কারণ নেই। এ জীবন অনিত্য, যন্ত্রণায় সারাক্ষণ জ্বলতে হয় মানুষকে। আজ আমি এ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দ-লোকের পথে পা বাড়িয়েছি, এতে তুমি আনন্দ কর, কেঁদ না। তোমার চোখের জলে আমার যাবার পথ পিচ্ছল করে দিও না, মা। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, কেনই বা করব? তোমার গর্ভেই তো আমার জন্ম। তুমি বীর প্রসবিনী মা। আমি মৃত্যুকে ভয় করব? আমি রাজপুত কুলের কুমারী হয়ে জন্মেছি তো অপঘাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্যেই। তবে এতদিন যে জীবিত ছিলাম, সেজন্য আমার পিতাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

রাজপুতদের মধ্যে শিশু-হত্যার জঘন্য প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণার কথা থেকেই বোঝা যায়। যাই হোক, পর পর তিনবার কালকূট খাওয়ানোর পরও তাকে হত্যা করা গেল না। রাণা এবং তার সামন্ত সর্দাররা শঙ্কিত হয়ে পড়ল। একি কাণ্ড। তবে উপায়? আমীর খাঁ এবং অজিতের চক্রান্ত ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠছে। এই ক্ষণেই কন্যাকে ইহজগত থেকে সরাতে না পারলে সারা মিবার এবং অন্তঃপুরের ইজ্জত একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আরও একবার। এক ডেলা আফিংএর সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দেওয়া হল তাকে। করুণাময় ভগবানের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা জানাল সে, 'ভগবান, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। আর পারি না আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে। তোমার পায়ে আমাকে ঠাঁই দাও।'

পাষণ্ডদের উদ্দেশ্য সফল হল। মর্তের অপ্সরী অনন্ত-নিদ্রায় অনড় হয়ে পড়ে রইল।

কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই অনাহারে অনিদ্রায় শোকে ইহলোক ত্যাগ করল তার মা।

লোকে বলে, নিষ্ঠুর অজিতসিংহই এই অনর্থের প্রধান গোড়া। ঐ লোকটাই আমীরখাঁকে অহরহ খুঁচিয়ে উন্মত্ত করে তুলেছিল। আমীরখাঁ যে এক পাষণ্ড সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই লোমহর্ষক কাণ্ডের বিবরণ যখন সে শুনল তখন তার পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হয়েছিল। স্বদেশ-দ্রোহী দুরাত্মা অজিতকে ধিক্কার দিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলেছিল,' বিশ্বাসঘাতক, তুমি কি রাজপুতের উপযুক্ত কাজ করেছ? দূর হও আমার সামনে থেকে, তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়।'

শক্তাবৎ সর্দার তার চেয়েও কঠোর ভাষায় অজিতকে তিরস্কার করেছিল। এই বিভৎস হত্যা-কাণ্ডের সময় রাজধানীতে উপস্থিত ছিল না সে। এটুকু আশা করা যায়, শক্তাবৎসর্দার সংগ্রাম সে-সময় উদয়পুরে উপস্থিত থাকলে এই জঘন্য ব্যাপার কিছুতেই ঘটতে পারত না। রাণা ভীমসিংহর নির্দেশ সে নির্মমভাবে অমান্য করত। শক্রুর শাসানী সে থোড়াই কেয়ার করে।

'—কাপুরুষ, পবিত্র শিশোদিয় বংশে জন্ম নিতে কে বলেছিল তোমাকে। এত কালের গৌরব, মর্যদা, বীরত্ব সব ধুলোয় লুটিয়ে দিলে তুমি! তোমার

মত নরাধম পাষণ্ড পৃথিবীতে শুধু দৈত্যকুলেই জন্মায়। এত কালের পূর্ব-পুরুষদের কৃতকর্মের শুভফল শুধু তোমার এই ঘৃণ্যতম কর্মের দোষে নষ্ট হয়ে গেল। যে কলঙ্কের কালি তুমি বাপ্পার বংশে লেপে দিলে ভবিষ্যতে কোন উত্তরাধিকারী কোন শুভ-কর্ম দিয়েই তা মুছে দিতে পারবে না। তুমি একটা নরকের কীট! আজ আমি নিশ্চিত, ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হতে হতে আর বেশী দেরি নেই।'

রাণা ভীমসিংহ নিরুত্তর। লজ্জায়, ঘৃণায়, শোকে বিষাদে মাথা নিচু করে দুহাতে মুখ ঢেকে-চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিতে লাগল। রাণার চোখে জল দেখে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল সংগ্রাম। আরও কঠিন কণ্ঠে অজিতকে তিরস্কার করতে লাগল, 'ওরে পাষণ্ড, শিশোদিয় কলঙ্ক! তোর দেহে রাজপুত রক্ত প্রবাহিত হয়! পাঠান কি রাজধানী আক্রমণ করেছিল? তা যদি করতও তবে কি পূর্বপুরুষদের মত যুদ্ধ করে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারতে না। নিষ্ঠুর ঘাতকের মত অপাপবিদ্ধ কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করতে কি একবারও হৃদয় কম্পিত হল না।

পাষণ্ড অজিত নিরুত্তর। কি উত্তর দিতে পারত সে? তেজস্বী সংগ্রামসিংহ আজ নাই, কিন্তু মিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার ভবিষ্যৎবাণী পরে অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। সব-শুদ্ধ পঁচানব্বইটি পুত্রকন্যা জন্মেছিল রাণার। তার মধ্যে কৃষ্ণার একমাত্র সহোদোর ছাড়া আর সব পুত্রই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিল। কৃষ্ণার দুটি বোন জীবিত ছিল। একটির বিয়ে হয়েছিল যশল্মীর-রাজপুত্রের সঙ্গে, অপরটি সম্প্রদান করা হয়েছিল বিকানীর-রাজকুমারকে। এদের গর্ভে যে কটি পুত্র জন্মেছিল, ভারতের চিরন্তন প্রথানুসারে, তারা মাতামহর সিংহাসনের অধিকারী হতে পারে নি। রাণার একমাত্র জীবিত পুত্র যুবনসিংহ। সেও একবার কলেরায় প্রায় মরমর হয়ে পড়েছিল। উদয়পুরে এর আগে কখনও কারো কলেরা হয়নি। যুবনসিংহ যখন কলেরায় আক্রান্ত কর্ণেল টড তখন উদয়পুরে উপস্থিত ছিল। টডের চিকিৎসার গুণে যুবনসিংহ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। রাজকুমার সুস্থ হয়ে ওঠার পরই কর্মাধ্যক্ষ শ্রীজীবেহতা

কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

যুবনসিংহই রাণার শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সে ছাড়া তার শোকজীর্ণ জীবনে আর কোন সান্ত্বনার বস্তু নাই। তার মুখ চেয়েই রাণা সব দুঃখ সব শোক সহ্য করতে পেরেছিল। বড় সাধ ছিল, যুবন পুত্র-সন্তান লাভ করে তার বংশ রক্ষা করবে, কিন্তু দুর্ভাগ্য, যুবনের পুত্র-সন্তান হল না।

স্বদেশদোহী অজিতের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে সংগ্রামসিংহ যে অভিশাপ দিয়েছিল তা অব্যর্থভাবে ফলে গেল। ঐ ঘটনার একমাস যেতে না যেতেই অজিতের স্ত্রী এবং পুত্র দুটি মারা যায়। সংসারের সুখ শূন্য হয়ে গেল। পাষণ্ড অজিত আজ নিজের কুকর্মের প্রতিফল পেল এইভাবে। সমাজ-সংসার ছেড়ে সে বিবাগী হয়ে ফিরতে লাগল। অন্যের অনিষ্ট চিন্তাই যার জপমালা ছিল সেই অজিত আজ হরিনামের গুণগান করে সব পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে উন্মুখ। মঠে মন্দিরে ঘুরে মরে দিনের পর দিন। কিন্তু মুখে শুকনো হরিনাম, পরণে গেরুয়া বসন পরলেই কি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হওয়া যায়। সব গ্লানি সব ক্লেদ মুছে ফেলে পরম ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে পারল কই? তা না হলে মুখে মুক্তি দাও করলেই কি আর মুক্তি পাওয়া যায়।

কিছুদিন কাটল। অজিতের পাপের গুরু আমীর খাঁ ভরতের রাজন্য-বর্গের সঙ্গে ঐক্য ও মৈত্রী গড়ে তুলল। যে সব ভয়ঙ্কর পৈশাচিক পাপের নায়ক সে তাতে নরকেও তার জায়গা হওয়ার কথা না, বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়ে মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কই তাতো হল না। বরং দিনদিন শ্রীবৃদ্ধিই হতে লাগল। বৃটিশদের পদলেহন করে সুযোগ-সন্ধানী আমীর সামন্ত-নবাব বনে গেল। হোলকারের যে কজন বিদেশী যোদ্ধা ছিল আমীর খাঁ তাদের মধ্যে প্রধান। কিন্তু বিশ্বাসঘাত আমীর হোলকারের মাথায় পা রেখে একদিন বৃটিশের দলে গিয়ে ভিড়ল। কূটনীতিতে বৃটিশের তুল্য জাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। তারা দেখল, হোলকারের প্রধান বল আমীরকে যদি দলে ভেড়ানো যায় তাহলে হীনবল হোলকার আরও শক্তিহীন হয়ে পড়বে। তখন তার বুকে বাঁশ ডলে সায়েস্তা করতে

বেগ পেতে হবে না আদৌ। আমীর খাঁকে লোভ দেখাল। বললে, 'এখন তুমি হোলকারের যে-সব জায়গাগুলো জায়গীর হিসেবে ভোগ করছ সে-গুলো আমরা তোমাকে বরাবরের জন্যে তোমার অধিকারে দিয়ে দেব।

আমীর খাঁ রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার বৃটিশগভর্ণর লর্ড হেস্টিংস হোলকারের রাজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নিয়ে আমীর খাঁর হাতে তুলে দিল। আমীর খাঁ সামন্ত-নবাব হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করল। শিরোঞ্জ, টঙ্করামপুর ও নিমহৈরী তার রাজ্যের প্রধান অঞ্চল। আমীরখাঁকে মারাঠিদের কবল থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের দলভুক্ত করার ফলে সারা ভারতে বৃটিশের আধিপত্য পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়ে গেল। বৃটিশ রাজত্বের গোড়া পত্তনে এটি এক বিরাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সন্দেহ নেই।

মিবারের দুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না। প্রায় চল্লিশটা বছর একাদিক্রমে মারাঠিদের নৃসংশ অত্যাচারে স্বর্ণপ্রসবিনী আজ মহা-শ্মশানে পরিণত। মর্ত্যের অমরাবতী মিবার আজ শুধু অস্থিকঙ্কাল মাত্র। এই চল্লিশ বছরের অত্যাচার উৎপীড়নের অবসান হল এবার। বৃটিশের সঙ্গে সন্ধি করল রাণা। বিপদে আপদে সে রক্ষা করবে। এর আগে করেছে মোগল বাদশাহরা, এবার এল বৃটিশ-সম্রাট।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস। ইংরেজদূত মিবারের মধ্য দিয়ে পথ বেয়ে চলেছে। চারদিকে প্রকৃতির বিভৎস মর্মভেদী বিষাদমূর্তি। গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে, নগরগুলো জন-শূন্য, প্রেতপুরীর মত হাত-ছানি দিচ্ছে। একদিন এখানে মুখর-মানুষ সুখ দুঃখের জীবন ইতিহাস রচনা করে চলত অহরহ। আজ সব থেমে গেছে। এই বিরাট বিরাট অট্টালিকার কোণে কোণে আজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে কত আবালবৃদ্ধ-বণিতার আকুল-ক্রন্দন। কত ষোড়শী রাজপুত নারী সতীত্ব রক্ষার জন্যে মাথা কুটে মরেছে মারাঠা দস্যুর পায়ের ওপর। কিন্তু পশুরা কি ওদের একজনকেও রেহাই দিয়েছিল সেদিন!

অস্বজির জন্যেই আজ মিবারের এই চরম অবস্থা। রাজ্যের সব ধনরত্ন

সে দুহাতে লুঠ করেছিল। কিন্তু পাষণ্ড অম্বজি নিজের ভোগে লাগাতে পারে নি সে-সব ধনরত্ন। যে সিন্ধিয়ার কল্যাণে তার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার হয়েছিল অম্বজি সেই সিন্ধিয়ার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করল একদিন। তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গোয়ালিয়রে সে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। সিন্ধিয়া রাগে জ্বলতে লাগল। সুযোগমত বিশ্বাস-ঘাতককে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার প্রতীক্ষা করছিল সে। অবশেষে একদিন সে এক সামান্য তাঁবুর মধ্যে বন্দী করতে পারল অম্বজিকে। তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে তার হাত পা দগ্ধ করে দেওয়া হল। তার যাবতীয় লুণ্ঠিত ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে গেল সিন্ধিয়া। চোখের সামনে তার যথাসর্বস্ব চলে গেল, হতভাগ্য অম্বজি এ দৃশ্য সহ্য করতে না পরে একখানি ছুরিকা দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আত্মহত্যা সম্ভব হল না। ইংরেজ-দূতের এক সহচর, শল্য-চিকিৎসকের চেষ্টায় সে-যাত্রায় জীবন ফিরে পেল বেচারা। এরপর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খেসারৎ দিয়ে আবার সে সিন্ধিয়ার অনুগ্রহ লাভ করল। আর একবার মিবার তার হাতে এল। কিন্তু বেশী দিন ভোগ দখল করতে পারেনি সে। শোকে দুঃখে দারুণ মর্মবেদনায় ইহলোক থেকে বিদায় নিল অম্বজি। লোকে বলে, তার মৃত্যুর পর বাকী ধন-সম্পত্তি তার পুরোনো দিনের প্রাণের বন্ধু জলিমসিংহ আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। ১৮৪৮ সংবতে এই ভাবে এক ভয়ঙ্কর পাপের অবসান হল।

রাণার অন্যতম মন্ত্রী সতীদাস সত্তর হাজার টাকা দিয়ে যশবন্তরাওএর কাছ থেকে কমলমীর বন্দোবস্ত করে নিল। এই টাকাটা শোধ করার জন্যে সে কমলমীরের কয়েকটি অঞ্চল কয়েকজন বিত্তবানের কাছে বিক্রি করল। ১৮০৯ সালে আমীরখাঁ এসে হানা দিল উদয়পুরে। এগারো লক্ষ টাকা চেয়ে বসল সে রাণার কাছে। ভয় দেখল, রাণা যদি টাকা না দেয় তবে একলিঙ্গ-দেবের মন্দির ধূলিসাৎ করে দেবে। রাণা সঙ্কটে পড়ল। এই বিপুল অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবে সে। অবশেষে নয় লক্ষ টাকায় রফা হল। কিন্তু এই টাকাই বা কোথায় পবে রাণা? এদিকে পাষণ্ড আমীরখাঁ রাণার প্রতিনিধিদের ওপর দারুণ লাঞ্ছনা শুরু করল।

সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করতে গিয়ে বেচারা কিষণদাস আহত হল। কিষণদাস বৃটিশ-এজেন্ট কর্ণের টডের দোভাষীর কাজ করত। যদিও চান্দবৎদের সঙ্গে তার ষড়যন্ত্র ছিল তবু সে প্রভুভক্ত। কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বিষ খাইয়ে কিষণদাসকে হত্যা করেছিল। তার মৃত্যুতে সকলেই কাতর হয়েছিল।

অবশেষে দুর্দান্ত পাঠান উদয়পুর নগরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের সৈন্যবাহিনীর সামনে কেউ রুখে দাঁড়াতে পারল না। আমীরের সৈন্যরা নগরের সব সৌন্দর্য ধূলিসাৎ করে ফেলল। শান্ত নিরীহ নাগরিকরা পালাবার পথ খুঁজে পেল না। ধনরত্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মান-ইজৎ, প্রাণ হারাতে লাগল জানোয়ারগুলোর হাতে। কত মনোহর অট্টালিকা ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হল কে তার হিসাব রেখেছে। পাঠানদের সেই পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার নিদর্শন আজও উদয়পুরের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আজও উদয়পুর মর্মভেদী আর্তনাদ করে ঘোষণা করছে, পাঠানের সেই পাশব অত্যাচারের করুণ কাহিনী!

এত অত্যাচার, এত লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা সহ্য করেও মিবার রেহাই পেল না। ১৮১১ সালে বাপুসিন্ধিয়া সুবাদার হয়ে এল মিবারে। এদিকে আমীরখাঁর পাঠান সৈন্যরা তখনও লুঠ-পাঠ করে চলেছে। এই লুঠের মাল ভাগাভাগি নিয়ে বাপু সিন্ধিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধ বেধে যায় আমীরের। ফলে আরও দুর্গতির অতলে নেমে গেল মিবার। শেষে রাজ্যকে রক্ষা করার কোন উপায় না দেখে রাণা সিন্ধিয়া ও আমীরের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল মিবার রাজ্য। এই উপলক্ষ্যে ধবল-মেরুতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সে সভায় সতীদাস কিষণদাস ও রূপরাম উপস্থিত ছিল। মিবারের হীনবল অধিবাসীরা আজ মৃতপ্রায়। উত্তেজনা নাই, সাহস নাই, চৈতন্য নাই। যে রাজপুত একদিন শত্রু-সংহার করার জন্যে প্রচণ্ড বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ত আজ সে রাজপুতের দেহের রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। রাণা ভীমসিংহর কাপুরুষতার স্পর্শে আজ সারা মিবার অধঃপতনের অতলে তলিয়ে গেছে। মিবারকে আজ দেখে

অনুমান করা শক্ত, এদেরই পূর্ব-সূরীদের মধ্যে জন্মেছিল ঐতিহাসিক বীর দেশ-প্রেমিকরা। কি করে বিশ্বাস করা যাবে রাণা প্রতাপসিংহর রক্ত বইছে এদের ধমনীতে। হতভাগ্য মিবার!

পাঠান আর মারাঠির অত্যাচারে সব জনপদ শূন্য হয়ে গেছে। যারা তখনও জীবিত, তারা অহরহ নিগৃহীত হতে লাগল। অর্থ বা সোনাদানা নেই কারো ঘরে। সমস্ত মারাঠা আর পাঠানের জঠরে গেছে। এবারে গৃহীদের সামান্য বসনভূষণ বা ঘটিবাটিগুলোও কেড়ে নিতে লাগল তারা। তাতেও ক্ষান্তি নেই। নিষ্ঠুর বাপু সিন্ধিয়া কপর্দক-শূন্য করে সর্দার-সামন্ত ব্যবসায়ী ও কৃষকদের বেঁধে ছেঁদে আজমীরের কারাগারে পাঠিয়ে দিল। ১৮১৭ সাল পর্যন্ত সেই অন্ধকারময় কারাগারের মধ্যে প্রায় অনাহারে থেকেও যারা প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তবে সে-সংখ্যা নেহাতই নগন্য। বেশীর ভাগই এই অন্ধকার থেকে আলোর মুখ দেখতে পায় নি।

১৬

মহারাজ কণকসেন থেকে শুরু করে ভীমসিংহ পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারোশো বছরের মিবার-ইতিবৃত্ত বর্ণনা করা হল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী কালের মধ্যে মিবার-ইতিহাসে যে-সব ভীষণ ভীষণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। পারদ, তাতার, তুর্কী, ভীল প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মিবারের বুকে ছুরি চালিয়ে সূর্যবংশকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মহারাজ শিলাদিত্যের বংশধররা অমিতবিক্রমে সমস্ত বাইরের শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে টিকতে পেরেছিল। শত শত বৎসরের অত্যাচার উৎপীড়নে মিবারের রক্ত শুষে খেয়েছে শত্রুরা, যুদ্ধ করতে করতে মিবারের বীররা হাজারে হাজারে বলি হয়েছে। মিবার আজ হীনবল, নিঃসম্বল

অনাথ। তার ওপর মারাঠা-দস্যুর আক্রমণে একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, আজ আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তার। দুর্ধর্ষ মারাঠি এবং পাঠানরা স্বদেশ-তাড়িত পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি দস্যুদের সহযোগিতায় নানা জায়গায় বিরাট বিরাট দস্যু-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল। এবং তাদের পৈশাচিক অত্যাচারে সারা ভারতবর্ষ যে ভাবে তছনছ হয়েছিল তার তুলনা নাই।

১৮১৭ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের শাসনকর্তা লর্ড হেস্টিংসের অসাধারণ দূরদর্শিতায় এই সব পাষণ্ড দস্যুদের সব উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যায়, তাদের দলবল এদিক ওদিক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে। বৃটিশরা সুশাসক, তাদের শাসন-কৌশলে দেশবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। মারাঠি দস্যুর অত্যাচারের কথা মনে করলে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। বৃটিশরা অত্যন্ত চতুর। তারা বুঝেছিল, এই সব অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হতভাগ্যদের যদি বিশ্বাস জন্মে, তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, তা-হলে বিদেশী বলে তারা কিছু কম রাজভক্তি পাবে না ওদের কাছ থেকে। প্রজাপালনের যে-নীতি তারা গ্রহণ করেছিল তা অব্যর্থ। এবং তারই ফলে ভারতের মাটিতে পাকাপাকিভাবে খুঁটি গেড়ে বসতে পেরেছিল।

লর্ড হেস্টিংসের চেষ্টায় মারাঠিদের বিষদাঁত ভেঙ্গে গেল। আবার তারা যাতে সংঘবদ্ধ হয়ে দেশে অনাচার সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্যে সমগ্র ভারতের রাজাদের এক সূত্রে বাঁধার সঙ্কল্প নিয়ে এক বৈঠক ডাকল সে। একমাত্র জয়পুরের রাজা ছাড়া আর সবাই সাড়া দিয়েছিল তার এই আবেদনে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সামন্ত-রাজাদের প্রতিনিধি এসে জড়ো হ'ল দিল্লীতে। এই বৈঠকে প্রত্যেক রাজার সঙ্গে এক চুক্তি করেছিল লর্ড হেস্টিংস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে রাণা ভীমসিংহর যে চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা এই রকম ঃ

১। এই দুই রাজকুলের মধ্যে বংশানুক্রমে চিরকালের জন্যে মৈত্রী, সমবেদনা ও একতা বজায় থাকবে। একের শত্রু ও মিত্র অন্যের শত্রু ও মিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

২। উদয়পুর-রাজকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যত্নবান হবে।

৩। উদয়পুরের রাণা সব সময় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে থেকে সহযোগিতা করবে। এবং তাদের প্রভুত্ব স্বীকার করবে। রাণা অন্য কোন রাজা বা রাজকুলের অধীনতা স্বীকার করবে না।

৪। বৃটিশের অনুমতি না নিয়ে অন্য কোন রাজা বা রাজকুলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে না উদয়পুর-রাজ। তবে তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বর্তমানে যে সম্বন্ধ বজায় আছে তা যথা-যথ রক্ষা করে যেতে পারবে।

৫। উদয়পুর-রাজ কারো প্রতি কোন প্রকার অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করবে না। যদি কারো সঙ্গে কোন কারণে বিবাদ ঘটে তবে সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাতে হবে। মীমাংসা ও বিচারের দায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের।

৬। মিবারের প্রকৃত অঞ্চল থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তার চার ভাগের একভাগ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হবে। প্রথম পাঁচ বছর এই হারে কর দিতে হবে, তার পর থেকে টাকায় ছয় আনা হিসেবে কর দিতে বাধ্য থাকবে উদয়পুরের রাণা। অন্য কোন ব্যক্তি বা রাজাকে কর দেবে না সে। যদি কেউ দাবি জানায়, তার যথাবিহিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের।

৭। বর্তমানে মহারাণা জানাচ্ছে, কোন কোন ব্যক্তি অন্যায় ভাবে মিবারের কোন কোন অঞ্চল দখল করে বসে আছে। সেই সব হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের আবেদন করছে রাণা। কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণের অভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঐ সব সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে দিতে অপারগ হলেও উদয়পুর রাজ্যের উন্নতি সাধনে কোন ত্রুটি করবে না। প্রত্যেক ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বৃটিশ সরকার।

৮। উদয়পুরের রাণা নিজের রাজ্যের মধ্যে একছত্র অধিপতি থাকবে,

তার রাজ্যে বৃটিশের প্রভুত্ব আরোপ করা হবে না কোন দিন।

১০। দশ সূত্র সম্বলিত এই সন্ধিপত্রখানা দিল্লীতে রচিত এবং চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ ও ঠাকুর অজিতসিংহ বাহাদুর কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হল। আজ থেকে এক মাসের মধ্যে মহামান্য মহানুভব গভর্ণর জেনারেল এবং মহারাণা ভীমসিংহ কর্তৃক এই সন্ধিপত্র স্বীকৃত ও অনুমোদিত হবে।

১৮১৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৩ তারিখে দিল্লীতে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

পাষণ্ড দস্যুদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য রাজন্যবর্গ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করল ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু রাণা ছাড়া ঐ সন্ধির মর্ম কেউই উপলব্ধি করতে পারেনি। সন্ধির পর থেকে রাণা নিশ্চিন্তে সুখে শান্তিতে যেভাবে দিন কাটিয়েছিল অন্য কোন রাজা তা পায় নি। ১৮১৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী রাণা এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে উদয়পুরে ইংরেজ সরকার তার এজেণ্ট পাঠল। তার তত্ত্বাবধানে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে, মারাঠা ও বিদ্রোহী সর্দারদের সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগল। রায়পুর, রাজনগর প্রভৃতি দুর্গ বিদ্রোহী-সর্দারদের অধীনে ছিল। সে-গুলো সহজেই উদ্ধার হল। এর মধ্যে কমলমীরের বিরাট দুর্গটি ইংরেজ সরকার অধিকার করে নিল। সেখানকার সৈন্যরা বহুকাল ধরে বেতন পাচ্ছিল না। বৃটিশ সরকার তাদের সমস্ত বকেয়া বেতন শোধ করে দিয়েছিল।

কমলমীরের পুবদিকে জিহাজপুর। জিহাজপুর থেকে উদয়পুরের দিকে রওনা হল বৃটিশ এজেণ্ট। সেখান থেকে উদয়পুর প্রায় ১৪০ মাইল। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় দুটি মাত্র নগর চোখে পড়ল তার। সামান্য কিছু লোকের বাস। এছাড়া ঐ বিশাল প্রদেশের প্রায় সব জায়গায়ই জনমানব-শূন্য শ্মশান। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। এখানেও রাখালের বাঁশীর সুর কানে আসত, মাঠে চাষ করত চাষী, হাটে-বাজারে পসরা সাজাত ব্যবসায়ীরা। মাথায় কলসীর ওপর কলসী চাপিয়ে ছাগল

তাড়িয়ে নিয়ে চলত রাজপুত মেয়েরা। গাছে ফুল ফুতট, আকাশে চাঁদ উঠত, পাখি গান গাইত। কিন্তু পথের দুধারের এই ধ্বংস লীলায় সব চাপা পড়ে গেছে আজ। মারাঠি দস্যুর নিষ্ঠুরতম অত্যাচারে হাহাকার করছে। পথ চলতে পথের নিশানা খুঁজে পাওয়া দায়। আগাছায়, ঝোপ জঙ্গলে সমাকীর্ণ চারদিক। যেখানে একদিন জনমানবের বসতি ছিল সেখানে বাস করছে আজ বাঘ-ভল্লুক সাপ-খোপ। যেদিকে তাকানো যায় সেই দিকেই মারাঠি অত্যাচারের নির্মম চিত্র। বড় বড় বাড়ি ভেঙ্গে চূরমার করে ইটের স্তূপে পরিণত করা হয়েছে। যে ভীলবারা একদিন রাজস্থানের এক প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল, দশবছর আগেও যেখানে ছয় হাজার গৃহস্থ একসঙ্গে বসবাস করত, আজ সেখানে একটি প্রাণেরও স্পন্দন অনুভব করা যায় না। একদিন যে পথ হাজার হাজার গাড়িঘোড়ায় সব সময় গমগম করত আজ সে-পথ নিথর নিস্পন্দ মৃত-প্রায় এক অজগর সাপের মত পড়ে আছে।

বৃটিশের প্রতিনিধি এসেছে। আড়ম্বর অনুষ্ঠানের ক্রুটি রাখেনি রাণা। নাঁথদ্বারে সৈন্য-শিবির গেড়ে অবস্থান করছিল সে। রাণা নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়ে স্বাগত জানাল তাকে। নগরের দু'মাইল দূরে এক তালবীথির মধ্যে এক জাঁকজমকপূর্ণ সভার আয়োজন করা হল। সেখানে প্রথমে রাজকুমার যুবনসিংহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল এজেণ্ট। যুবনের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত, মুগ্ধ হল ইংরেজ দূত। সে বলেছিল, 'রাজকুমার যে কত বড় বংশে জন্মেছে তা তার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়।'

বৃটিশ জাতটা ভয়ঙ্কর চালাক। সামান্য একটি মুখের কথা এবং একটু শিষ্ট ব্যবহারেই বিশ্ব জয় করে নিতে জানত তারা।

যুবনসিংহ বৃটিশ এজেণ্টকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল উদয়পুরে। সূর্য-তোরণের সামনে অপেক্ষমান হাজার হাজার নাগরিক 'জয় ফিরিঙ্গি কা জয়' বলে অভিনন্দন জানাল। ইংরেজ-বন্দনায় মুখর হয়ে উঠল রাজপুরী। রাজপুত মেয়েরা মাথায় পূর্ণকুম্ভ নিয়ে আগমনী গান গাইতে শুরু করল। বৃটিশ এজেণ্ট প্রথমে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করে রাজসভায় প্রবেশ

করল। রাণা সিংহাসন থেকে নেমে এসে এজেন্টকে অভ্যর্থনা করে বসাল। সর্দার সামন্ত সভাসদরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজসিংহাসনের সামনে পেশোয়া যে আসনে এসে বসত, আজ ইংরেজ দূত এসে বসল সে-আসনে। মিবারের সামন্ত ও সর্দাররা যথানিয়মে নিজের নিজের আসনে বসল। রাণা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললে, 'বৃটিশ সরকার আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে যে মহা উপকার করেছেন আমি জীবনে সে-কথা ভুলতে পারব না। সারা জীবন ধরে অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করেছি, আজ মহানুভব বৃটিশ সরকার এসে আমাকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। এ উপকার আমি ভুলব কি করে? আজ পর্যন্ত একটা দিনও আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারিনি। আজ আমি মুক্ত বিহঙ্গের মত নিশঙ্ক, আজ আমি সুখে নিদ্রা যেতে পারব।'

যথা সময়ে সভা শেষ হল। রাণা একটি সুসজ্জিত হাতী, একটি অশ্ব, এক ছড়া মহামূল্য রত্নহার, একখানি শাল ও বহুমূল্যবান সামগ্রী উপহার দিল এজেন্টকে। বৃটিশ এজেন্টও যথাযোগ্য উপহার দিল রাণা, রাজকুমার, সামন্ত, সর্দার ও রাজকর্মচারীদের।

রাণা যে-রকম উচু পদমর্যাদার অধিকারী, তার দুর্বল চরিত্র কিন্তু তার উপযুক্ত ছিল না। অবশ্য রাজ্য-শাসনের কিছু সৎ গুণ হয়ত ছিল, কিন্তু তার চারিত্রিক দোষের জন্যেই সব অকেজো হয়ে গিয়েছিল। বৃথা চাকচিক্য, আমোদপ্রমোদ, জাঁকজমক তাকে অহরহ এমনভাবে উৎসাহিত করে তুলত যে রাজ-কাজের দিকে বড় একটা নজর দিতে পারত না, চাইত না। রাজ্য-শাসনের জন্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। একমাত্র কিষণদাস ছাড়া তার কর্মচারীদের মধ্যে সবাই ছিল স্বার্থপর। যে যার নিজের নিজের গুছিয়ে নিতেই ব্যস্ত। রাজ্য রসাতলে গেলেও তারা বিচলিত হত না বড় একটা। শুধুমাত্র কিষণদাসের ন্যায়-নিষ্ঠার কল্যাণেই রাজ্যের কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখ এই, অনেক মন্দ লোকের মধ্যে দু'একজন ভাল লোকের টিকে থাকা সম্ভব না। তাই অজ্ঞাত আততায়ীর বিষ পান করে ইহালোক থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাকে।

মিবারের আমূল সংস্কার করাই বৃটিশ এজেন্টের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। বিদ্রোহী সামন্ত সর্দারদের সায়েস্তা করার কাজে হাত দিল সে। আগে বেশীর ভাগ সামন্ত সর্দাররা রাজসভায় কোন দিনই উপস্থিত হত না। যখন কোন কাজ হাসিল করার দরকার হত তখন এসে ধর্না দিত রাণার দরবারে, কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে আর টিকি দেখা যেত না। এজেন্ট নির্দেশ পাঠাল, প্রত্যেক সামন্ত এবং সর্দারকে যথানিয়মে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাণার আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। রাণা এতকাল ধরে চেষ্টা করে যাদের বশে আনতে পারেনি, কি আশ্চর্য, আজ তারা সুড়সুড় করে এসে হাজিরা দিতে লাগল রাজ-সভায়, একেবারে নিরঙ্কুশ উপস্থিতি। এমনকি যে দুর্দান্ত হামির-সর্দার হার মহিষীর বিবাহযৌতুক লুঠ করেছিল সেও মাথা হেঁট করে এসে ঢুকল রাণার সভায়। সঙ্গাবৎ সর্দার এক সময় প্রতিজ্ঞা করেছিল, 'আমি মেয়ে-মানুষের কাছেও মাথা নোয়াতে পারি, কিন্তু রাণার কাছে সম্ভব না।' সেও এসে মাথা হেঁট করল রাণার সামনে।

মিবারের সর্দাররা সমবেত হল। এবারে আর একটি প্রধান কাজ করতে হবে রাণাকে। মারাঠিদের নৃশংস অত্যাচারে যে সব মিবার-বাসীরা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে অন্য রাজ্যে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, তাদের প্রত্যেককে দেশে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ জানাল। অবশ্য এ ব্যাপারে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। তার কারণ, মিবার ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে গিয়ে যারা নতুন করে জীবন-যাত্রা গড়ে তুলেছিল, তা ভেঙ্গে দিয়ে আবার মিবারে চলে এসে নতুন করে আরম্ভ করার অনেক অন্তরায় ছিল। তাই তারা সকলেই রাণার এই মহানুভবতায় প্রসন্ন হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিল রাণাকে। সবাই ফিরে আসেনি, তবে এসেও ছিল অনেকে। তাদের আগমন উপলক্ষ্যে এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ৩ তারিখ। বহুকাল পরে আবার সবাই আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে খুশীর আনন্দে নেচে উঠেছিল তারা। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সন্ধির আট মাসের মধ্যেই আবার মিবারের জনশূন্য গ্রাম-নগর জন-বসতিতে গমগম করতে লাগল। বহুকালের অনাবাদী জমিতে আবার

ফসল ফলাল চাষীরা।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল, অর্থের সমস্যা। যারা অন্য রাজ্য থেকে বাস উঠিয়ে আবার মিবারে ফিরে আসতে লাগল তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা নেই রাণার। দেশের সব অর্থ মারাঠিরা লুঠ করে নিয়ে গেছে, কারো কাছে কোন পয়সা নেই। টাকা ধার করতে চায় রাণা, কিন্তু কে দেবে ধার ? কে-ই বা মারাঠি লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করতে পেরেছে সঞ্চিত ধন ! যারা সামান্য কিছু পেরেছিল, তারা চড়া হারে সুদ চাইল—শতকরা ছত্রিশ টাকা। বাধ্য হয়ে ঐ সুদেই টাকা ধার করতে হল রাণাকে। ফলে দিন দিন দুর্বহ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ল সে। এই ঋণের দায় থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় বিদেশী বণিকদের নিয়ে আসা হল মিবারে। এইভাবে ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে মিবার সুজলা সুফলা হয়ে উঠল।

মারাঠি দস্যুদের তাণ্ডবে ভীলবারা নগরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। জনমানবের বসতি ছিল না সেখানে। জন্তু জানোয়ারদের তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৃটিশ এজেন্টের ব্যবস্থায় আবার আমূল সংস্কার করা হল নগরটির। অল্প দিনের মধ্যেই আবার মনোহর হয়ে উঠল তার পথ-ঘাট, ঘর, বাড়ি দোকান-পসরা। আবার লোকজন এসে ভরে তুলল। রাণা ঘোষণা করে দিল, যারা ভীলবারায় দোকান বসাবে এক বছরের জন্যে কোন কর দিতে হবে না তাদের।

অল্প দিনের মধ্যেই ভীলবারা আবার আগের মত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল লোকের কাছে। কিন্তু এই সময় এক অনর্থ ঘটল। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিদেশী বণিকদের সঙ্ঘর্ষ বেধে গেল। বিদেশীরা যাবতীয় ব্যবসা একচেটিয়া করে নিতে চায়, কিন্তু লোকে শুনবে কেন সে কথা। যাইহোক, রাণা এবং এজেন্টের চেষ্টায় ব্যবসাগত বিরোধ যদিবা মিটল, ওদিকে শুরু হয়ে গেল সম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই ভাবে ভীলবাবার সমৃদ্ধি ব্যহত হতে লাগল দিন দিন। রাণা বড় আশা করেছিল, সারা রাজস্থানের মধ্যে ভীলবারাই হবে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-শহর।

চন্দাবৎ ও শক্তাবৎদের মধ্যে চিরকালের বিবাদ মেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এক সভা ডাকা হল। অনেক তর্কবিতর্কের পরও কোন উপায় ঠিক করা গেল না। চন্দাবৎ-শক্তাবৎদের কিছুতেই একজোট করা গেল না। বরং দিন দিন আরও বেড়ে যেতে লাগল তাদের ঘরোয়া বিবাদ। বৃটিশের সঙ্গে যে সন্ধি হয়েছিল তা দু'দলকেই পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া হল। কোন্ কোন্ ব্যাপারে রাজা ও সামন্তদের নিজ নিজ সত্ব রক্ষা হতে পারে তা স্থির করে একখানি চুক্তিপত্র তৈরি করা হল। এক প্রকাশ্য সভায় আলাপ আলোচনা করে সবাই মিলে চুক্তি-পত্রটি গ্রহণ করবে। কিন্তু যথেষ্ট আলোচনা করেও কোন মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা গেল না কিছুতেই। শেষে, অনেক তর্কবিতর্কের পর পাঁচদিন পরে সামন্ত-সর্দাররা চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করল।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষর তো হল। এবার তার বিধিনিয়ম যথাযথ কাজে রূপ দেওয়া যায় কি করে তার উপায় চিন্তা করতে লাগল রাণা।

বৃটিশ এজেন্ট কর্ণেল টডের চেষ্টায় দেশের সব শৃঙ্খলা ফিরে এল আবার। কিন্তু বিদ্রোহী সামন্ত-সর্দাররা যেসব ভূসম্পত্তি জবর দখল করেছিল সে-গুলোর পুনরুদ্ধার অত সহজে হয় নি। জোর করে ঐ সব সম্পত্তি কেড়ে নিলে রাজ্যে অনর্থ বাধতে পারে আশঙ্কায় বল প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। অথচ সোজা কথায় কেউ দখলি সম্পত্তি যে ফিরিয়ে দেবে, তার আশাও কম। সামন্ত সর্দারদের ডেকে নানা রকম মিষ্টি-কথায় কাজ আদায় করার চেষ্টা করল রাণা। সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে কি সামন্ত সর্দাররা মিবারের এত কালের গৌরব, মর্যাদা নষ্ট করে দেবে। রাণার এই ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় কিছু কাজ হল। আস্তে আস্তে অনেকেই রাণার কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। এইভাবে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই উদ্ধার হল।

এই সময়ে মিবারে রাজপুতদের হৃদয়ে বীরভাব জেগে উঠতে আরম্ভ করে। আর্জা নামে মিবারে একটি দুর্গ ছিল। আগে রাণার খাসদখলে ছিল সেটি। পুরাবৎ-সর্দাররা এক সময়ে জবর-দখল করে নিয়েছিল

দুর্গটি। তারপর পনের বছর কেটে গেছে, শক্তাবৎরা পুরাবৎদের কাছ থেকে দুর্গটি কেড়ে নিয়ে, নগদ দশ হাজার টাকা নজরানা দিয়ে রাণার কাছ থেকে ভোগসত্ব গ্রহণ করেছিল। যখন মিবারের সংস্কার শুরু হয়, শক্তাবৎ-সর্দারের মধ্যম ভ্রাতা ফতেসিংহ তখন তার দুর্গ-রক্ষক ছিল। ফতেসিংহকে জানানো হল, দুর্গটি পুরাবৎদের ফেরৎ দিতে হবে। ফতেসিংহ একথা শুনে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'আর্জা আমাদের দেহের রক্তের সমান, তাকে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না।' শাক্তাবৎদের এই ধরনের কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়ল রাণা। মিবারের এক প্রধান শক্তি এই শক্তাবৎ, তারা আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটবে দেশে। শেষে অনেক ভেবে ঠিক করল, অর্জা রাণা খাস দখলে নিয়ে নেবে। এতে অবশ্য কোন মতবিরোধ নেই। রাণা যখন নিজে নিতে চায় তখন আর কোন কথা উঠতে পারে না। ফতেসিংহ সানন্দে রাণার হাতে তুলে দিল আর্জা।

মিবারের সংস্কার সাধনের জন্যে ৪ঠা মে যে চুক্তি হয়েছিল তার বাস্তব রূপায়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল কয়েকজন সর্দার। তার মধ্যে বেদনোর এবং আমৈতের সর্দারই প্রধান। এদের পূর্বপুরুষরা মিবারের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হত না। কিন্তু পূর্বপুরুষদের আদর্শ ও আনুগত্যের কথা এরা একবারও মনে করল না। বেদনোর-সর্দারের নাম জয়ৎসিংহ। বিখ্যাত মৈরতা গোত্রে তার জন্ম। মীরাবাঈএর সঙ্গে রাণাকুম্ভর বিবাহ উপলক্ষে এদের পূর্বপুরুষরা মারবার ত্যাগ করে মিবারে এসে বাসা বেঁধেছিল। যে জয়মল্লর অসাধারণ বীরত্ব কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, যার পাষাণ মূর্তি তৈরি করে বাদশাহ আকবর দিল্লীর তোরণ-দ্বারে স্থাপন করে সম্মান প্রদর্শন করেছিল সেই অমিত-বলের জন্ম এই মৈরতা বংশে। এ বংশে জন্মেও জয়ৎসিংহ এক সাধারণ বিদ্রোহী সামন্তদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। জয়ৎসিংহর ধারণা জন্মেছিল, রাণা তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে চায়। তাই সে উদয়পুরে এসে রাণাকে স্পষ্ট ভাবে বললে, 'আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে আবার মারবারে চলে যাই।'

রাণা মহা সঙ্কটে পড়ল। নিজে কোন মীমাংসা করতে না পেরে বৃটিশ এজেন্ট কর্ণেল টডের ওপর ভার দেওয়া হল।

গিহ্লোট বংশের এক অতি প্রাচীন নিয়ম, ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে কোন সর্দার বা সামন্ত রাণার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করতে পারবে না। এতে রাজসম্মানের হানি হয়। সে-জন্যে আমাত্যদের মারফতে নিজের নিজের বক্তব্য রাণার সমীপে পেশ করত সকলে। জয়ৎসিংহ মিবারের মন্ত্রী ও আমাত্যদের মনে প্রাণে ঘৃণা করত। তার বিশ্বাস ছিল, তারা সামন্ত সর্দারদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে তাদের কাজ হাসিল করে দিত। রাণার ব্যবহারে সে যে ক্ষুব্ধ হয়েছিল তার যথেষ্ট কারণ ছিল। বেদনোরের হর্তা কর্তা সে। তিন শো ষাটটি নগর-গ্রাম মিলে এই বেদনোর। সামন্ত প্রথার নিয়ম অনুসারে ঐ নগর এবং গ্রামগুলো সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল সে। কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল একটু অন্য ধাঁচের। নিজের ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে সে কাজ করতে যেত। যে সব ব্যাপারে একমাত্র রাণাই হস্তক্ষেপ করতে পারে সেখানেও সে নিজের আধিপত্য ফলাতে চেষ্টা করত। এই নিয়েই রাণার সঙ্গে তার মতবিরোধ। এতে রাজতন্ত্রের অবমাননা করা হত, সন্দেহ নেই।

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠছে দেখে টডের হাতে মীমাংসার দায় ছেড়ে দিল রাণা। কর্ণেল টডের বিচক্ষণতায় বেদনোর সর্দার জয়ৎসিংহর মন নরম হল। কিন্তু ক্ষোভ জানিয়ে সে বললে, 'আপনি হয়ত জানেন না, যে সময়ে রাণার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে ত্যাগ করেছিল তখন আমিই তার পাশে ছিলাম দিনরাত। আমিই তাঁকে দেখা শুনা করেছি সব সময়। দেশে যখন দারুণ অন্তর্বিপ্লব, সমস্ত সামন্ত এবং সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে খাঁড়া ধরেছে, তখন শুধু-মাত্র আমরা চারজন তার পাশে থেকে তাকে সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। সে কথা রাণা বোধহয় আজ ভুলে গেছেন। আজ এক সামান্য দস্যু, ভাদেশ্বরের সর্দার তার প্রাণের বন্ধু। তাঁর নিচে আজ আমাকে আসন দেওয়া হয়েছে।'

কর্ণেল টড এসবের কিছুই জানত না। রাণাকে গিয়ে সে বললে সমস্ত

ব্যাপারটা। নিজের কৃতকর্মের জন্যে রাণা লজ্জিত, প্রীত, মুগ্ধ হল জয়ৎ-সিংহর কথা শুনে। ভাদৈশ্বরের সর্দারকে তখনি তার নগরে ফিরে যেতে বলা হল। এবং জয়ৎসিংহকে ডেকে নিজের ত্রুটির জন্যে অনুশোচনা জানাল তার কাছে। এইভাবে জয়ৎসিংহর সঙ্গে সব কলহ-বিবাদের অবসান হল।

ভাদৈশ্বর সর্দার হামির নামে পরিচিত। চন্দাবৎ গোত্রে তার জন্ম। মিবারের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক সর্দার। তার পিতার নাম সর্দারসিংহ। হতভাগ্য মন্ত্রী সোমজিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল সে। যথাসময়ে তার উপযুক্ত প্রতিফলও সে পেয়েছিল। মারাঠি অত্যাচারের সময়ে আমীরখাঁর জামাই ও প্রতিনিধি জামসিদ উদয়পুরে সেনাকটক স্থাপন করে আসে-পাশের গ্রাম-নগর লুঠপাট করতে শুরু করল। বীরত্বের প্রচণ্ডতায় সর্দারসিংহ তখন বেশ খ্যাত। জামসিদ একদিন তাকে ধরে নিয়ে এসে শিবিরে আটকে রাখল। বলে পাঠাল, ত্রিশ হাজার টাকা পণে সে তাকে ছেড়ে দিতে পারে। সর্দারসিংহ টাকাটা সংগ্রহ করতে পারল না। তখন সোমজির দুই ভাই ঐ টাকাটা জামসিদকে দিয়ে সর্দারসিংহকে কিনে নিয়েছিল। এ সংবাদ সর্দারসিংহর অনুচরদের কানে যেতেই উদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে লাগল তারা। ঐই অবকাশে শিবদাস ও সতীদাস ভাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিল সর্দারসিংহর শিরশ্ছেদ করে। সর্দারসিংহর রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড রামপিয়ারী প্রাসাদের তোরণদ্বারে স্থাপন করা হল। কিন্তু এই ঘৃণ্যতম নিষ্ঠুর বীভৎস কাজ করে শিবদাস সতীদাও পরিত্রাণ পায়নি। শানিত ছুরিকার আঘাতে তাদের জীবনও শেষ গিয়েছিল।

পিতার সব অসৎ গুণেরই অধিকারী হয়েছিল হামির। তার দৌরাত্ম্যও ঔদ্ধত্য এত কঠোর হয়ে উঠেছিল যে বাজবারা-অধিবাসীরা তাকে দৌরাবৎ বলে ডাকত। রাজ-ক্ষমতা-বলে সে ত্রিশ হাজার টাকার বেশী কর আদায় পারত না, কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে তার বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছিল প্রায় আশী হাজার। তার মত কপট ধূর্ত লোক খুব কম ছিল সে-সময়। সব সময় সে রাণার আশেপাশে ঘুর ঘুর করত, এবং রাজভক্তির ছলনা

করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিত। লাওয়ার শক্তাবৎরা তার প্রাণের বন্ধু। ক্ষীরোদ দুর্গ তখন লাওয়ার অধিকারে। এরা দুজনেই প্রায় উনিশ বিঁশ, এক প্রকৃতির জীব। দুজনেই এমন সুকৌশলে রাণাকে বশ করেছিল যে, জবরদখলি সম্পত্তিগুলো রাণাকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরও তারা বেশ ভোগদখল চালিয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে কিছুকাল কাটল। রাজমন্ত্রী নির্দেশ জারি করল, 'যতদিন আপনি ক্ষীরোদ দুর্গ এবং অন্যান্য সম্পত্তি রাণাকে প্রত্যর্পণ না করেছেন ততদিন রাজসভায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না আপনাকে।'

এই আদেশ শোনা-মাত্র দুর্বৃত্ত হামির জ্বলে উঠল। সদর্পে গোঁফে তা দিতে দিতে মন্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বললে, 'আপনার পূর্বপুরুষ সোমজির দুরবস্থার কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছেন!'

উগ্র-স্বভাব হামিরের উগ্রতা দিন দিন বাড়তে লাগল। ক্রমে ক্রমে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল সে। এই বিদ্রোহ আচরণের অনুগামী হতে সাহস পেল কেউ, কিন্তু অনেকেই তার এই রাজদ্রোহিতার প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল।

বিশেষ করে তার সগোত্রের লোকরা আহ্লাদে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তাদের উৎসাহে হামিরের অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই লাগল। রাণাকে চুপ করে থাকতে দেখ তারা ভাবল, ভয় পেয়ে গেছে। বৃটিশ এজেন্ট এই স্বৈরাচার সহ্য করতে পারছিল না। অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে রাণার সঙ্গে সে পরামর্শ করল। এর আগে রাণার নির্দেশে হামিরের দুর্গ অধিকার করতে গিয়েছিল রাজ-কর্মচারীরা। কিন্তু হামির রাজ-আজ্ঞা অবজ্ঞা করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। কর্নেল টড বললে, 'এ অপমান সহ্য করা উচিৎ না, আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি, হামিরকে সায়েস্তা করা দরকার।'

রাণার সঙ্গে এই আলোচনা কালে রাজসভায় অন্যান্য সামন্ত-সর্দারদের মধ্যে হামিরও উপস্থিত ছিল তখন। টডের কথায় উৎসাহিত হয়ে সামন্ত সর্দারদের উদ্দেশে রাণা বললে, 'আপনাদের ওপর কোন

কঠোর আচরণ করা আমার ইচ্ছা না, কিন্তু আমাকে যদি সে-কাজে বাধ্য করেন আপনারা তবে, দুঃখের হলেও, আমাকে তা করতেই হবে। আশাকরি আমার একথাটা স্মরণ রাখবেন।'

রাণার আদেশে তখনই 'বীরা' আনা হল। হামিরের দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে রাণা বললে, 'এই মুহূর্তে তুমি আমার রাজধানী ছেড়ে চলে যাও।'

এজেন্ট সাহেব রাণাকে নিরস্ত না করলে হয়ত হামিরকে দেশ থেকেই তাড়িয়ে দিত সে। ঘোষণা প্রচার করা হল, যতদিন না হামির অপহৃত ভূসম্পত্তি ফিরিয়ে দিচ্ছে ততদিন তার সমস্ত সম্পত্তি অবরোধ করে রাখা হবে। হামিরের সব আশাভরসার ইতি হয়ে গেল। মর্মাহত হয়ে সেই রাত্রেই উদয়পুর ছেড়ে চলে গেল সে। নিজের দুর্গে ফিরে গিয়ে শুধু যে অপহৃত সম্পত্তিই ফিরিযে দিল তাই না, তার নিজের অধিকারের ভাদৈশ্বর দুর্গের সত্বও-রাণার হাতে দিয়ে দিল সে। রাণা বা টড এতটা আশা করতে পারেনি।

আমৈত সর্দারের কাহিনীও এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমিলদুর্গ এবং তার অন্তর্গত সম্পত্তি আমৈত সর্দারের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল সাতাশ বছর আগে। জগবৎকুলে আমৈত সর্দারের জন্ম। মিবারের ষোলজন প্রধান সর্দারের অন্যতম সে। জগবৎকুলের উত্তরাধিকারী বর্তমান প্রতিনিধি ফতেসিংহ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আমৈত সর্দার পদাধিকারে বেদ-নোরের নিচে। ফতেসিংহর পূর্বপুরুষ মহাবল পুত্ত। মারাঠি দস্যুর আক্রমণ থেকে মিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে ফতেসিংহর পিতা প্রতাপসিংহ প্রাণ-উৎসর্গ করেছে। তার এই আত্মত্যাগের পুরস্কাম স্বরূপ আমিল দুর্গ ফতে-সিংহকে অর্পণ করা হয়েছিল। অন্যান্য সর্দারদের মত তাকেও নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল, আমিল দুর্গ রাণাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। কয়েকজন কুচক্রী আত্মীয় স্বজনের অসৎ উপদেশ তার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল। রাণার নির্দেশ সে গ্রাহ্য করল না। এজেন্ট সাহেব এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করার জন্যে ফতেসিংহর দুর্গে গিয়ে দেখা করল তার সঙ্গে। রাজকীয় আদব-কায়দায় এজেন্টকে সভা-গৃহে বসানো হল। ফতেসিংহও

উপস্থিত ছিল সেখানে, কিন্তু ক্রোধে তার চোখের মণি দুটো ছটফট করছিল। দাঁতে দাঁত চেপে গুম মেরে বসে রইল, একটিও কথা বলল না। বৃটিশ এজেন্ট আহত হল। কোন ব্যক্তি তার বাড়িতে বাইরের অভ্যাগতদের সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করতে পারে, ভাবতে পারল না। কিন্তু দমবার পাত্র কর্নেল টড নয়। সামনেই ফতেসিংহর পিতার একখানি তৈলচিত্র ছিল। সে দিকে ফতেসিংহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্নেল টড বললে, 'আপনার পিতা আজ ইহালোকে নেই। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ এবং মহত্ব আমরা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আরও বহুকাল বাদে, আমরা যখন থাকব না, তখন আমাদের বংশধররা এসে সমানভাবে আপনার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান জানাবে। তার মহৎ চরিত্রের কথা স্মরণ করুন। তিনি যে-ভাবে মানুষকে শ্রদ্ধা করে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারতেন আপনার মধ্যে সে গুণের ঘাটতি আছে একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আপনি।'

ফতেসিংহ বিষম লজ্জিত হল। তার পিতার সম্পর্কে যে-সব শ্রদ্ধার কথা কথা শোনাল এজেন্ট সাহেব তার একটুও বাড়াবাড়ি না, সম্পূর্ণ যথাযথ। অথচ, ফতেসিংহ পিতার এই মহৎ চরিত্রের গুণগুলো অনুশীলন করার কথা তো চিন্তা করে নি কোনদিন। শ্রদ্ধায় আনত হয়ে এল ফতে-সিংহ। এক বাক্যে বললে, 'আপনার ওপর বৃথাই আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, আর আমার কোন দ্বিধা নেই, দিন আপনার কাগজ পত্র, এখুনি সই করে দেব আমি। আমিল আজ থেকে রাণাকেই ফিরিয়ে দিলাম।'

মিবারের কৃষকরা শান্তি-প্রিয়, নিরীহ এবং কঠোর শ্রমসহিষ্ণু। মিবারে কৃষককরাই জমির মালিক। মিবারের জমির সঙ্গে কৃষকের সত্বকে অমর ধবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অমরধব একরকম তৃণ। প্রখর রৌদ্র-তাপ, দারুণ বর্ষা, সব অগ্রাহ্য করে সব ঋতুতেই সে অমর হয়ে জমির নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। কোনভাবেই তাকে পৃথক করা যায় না। জমির সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কও ঠিক এমনি। কোন কারণেই তার সত্ব সে হারাতে পারে না। নিজের জমিকে কৃষকরা 'বাপোতা' বলে থাকে। পৈত্রিক

সত্ব বোঝাবার জন্যে এই 'বাপোতা' শব্দটি ছাড়া অন্য কোন শব্দ যেন তেন ভাবব্যঞ্জক হয় না। যদি কখনও কোন সামন্ত সর্দার এমন কি রাণাও কোন কৃষকের জমি কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছে সে কিন্তু ছাড়ে নি, প্রাণ-পণে আকড়ে ধরে রেখে ভগবান মনুর সংহিতা থেকে উদ্ধার করে বলেছে, 'যে-ব্যক্তি বনজঙ্গল কেটে ক্ষেত্র পরিষ্কার করে সে-ক্ষেত্রের প্রকৃত অধিকারী সে-ই। ···ভোগরা ধন্নী রাজ হো, ভূমরা ধন্নী মাচো।' 'অর্থাৎ রাজা রাজস্বের অধিকারী কিন্তু ভূমির অধিকারী আমি।'

কাটিয়ান, এরিথিয়ান, ডিওডোরস এবং আরও যারা প্রাচীনকালের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করে গেছে তা অনুশীলন করলে বেশ বোঝা যায়, একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত যে সব ছোট ছোট রাজ্য ছিল তারা একমাত্র কর দেওয়া ছাড়া নিজে নিজে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। কর দিত সে, কারণ বাইরের শক্রর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার। রাজস্থানেও ঠিক এই নিয়ম চালু ছিল। রাজস্থানের প্রত্যেক রাজ্যে লক্ষ লক্ষ পল্লী সমিতি ছিল। ঐ সব পল্লীসমাজের শাসনকর্তারা নিজের নিজের এলাকার মধ্যে হর্তাকর্তা বিধাতা। তার কথার ওপর আর কারো কথা চলত না। সার্বভৌম অধিপতিকে তারা উৎপন্ন-শস্যের একাংশ কর দিতে বাধ্য ঠিকই, কিন্তু তার বেশী কিছু না। তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবার অধিকার কারো ছিল না। কর্নেল টড সাহেবের ধারণা, সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থা একেবারে অকর্মন্য হয়ে পড়ায় গ্রামবাসীরা এই পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। গ্রামের শান্তিরক্ষা, বিচার ও শাসনভার দেওয়া হয়েছিল গ্রাম-পঞ্চায়েৎএর ওপর।

পিতৃপিতামহদের অধিকৃত ভূমিকে রাজপুত কৃষকরা 'বাপোতা' বলে থাকে। কিন্তু বাপোতার সত্বাধিকারী যুদ্ধজীবি হলে তাকে ভূমিয়া বলা হয়। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহরা হিন্দু রাজাদের জমিদার জ্ঞান করত। সে-সময়ে যারা জমির প্রকৃত অধিকারী ছিল তাদেরই জমিদার বলাহত।

কৃষকের জমির ওপর অন্য কেউ কোন সত্ব অরোপ করতে পারত না। সে শুধু সার্বভৌম রাজাকে কর দিতে বাধ্য। তার জমি কোন উপায়েই

কেউ আত্মসাৎ করতে পারত না। এই সামান্য কর ছাড়া কৃষকদের কাছে থেকে অন্য কোন উপকার পেত না রাজা। পরোক্ষে ভূমিয়াদের কাছ থেকে রাজ্যরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু বৃটিশ আধিপত্যের সময়ে এই ভূমিয়াবৃত্তি একেবারে তুলে দেওয়া হয়। ভূমিয়ারা সামান্য বেতনে সেনাবাহিনীতে চাকরী পেয়েছিল।

কয়েকটি প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ করলেই বাপোতার ওপর কৃষকদের সত্বের দৃঢ়তা বোঝা যাবে। মুন্দর তখন মারবারের রাজধানী, এক গিহ্লোট রাজপুত্র একদিন কোন মারবার রাজকন্যাকে বিবাহ করতে বেরিয়েছিল। বিবাহ বাসরে জামাতা শশুরের কাছে যা প্রার্থনা করবে শশুরকে তা পূরণ করতে হবে, এ রাজপুত প্রথা। এবং এর ফলে রাজবারায় যে কত অনর্থ ঘটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। গিহ্লোটরাজকুমার সেদিন বিবাহরাত্রে শশুরঠাকুরের কাছে দশ হাজার জাট-কৃষক চেয়ে বসল। এই সব কৃষকদের মিবারে নিয়ে যাওয়া তার উদ্দেশ্য। এমন অদ্ভুত প্রার্থনা শুনে মারবার-রাজ কিছু বিস্মিত হল। কিন্তু জামাইএর প্রার্থনা তাকে পূরণ করতেই হবে। অগত্যা জাট-কৃষদের ওপর আদেশ জারি করল, তাদের মধ্য থেকে দশ হাজার কৃষক স্বদেশ পরিত্যাগ করে মিবারে চলে যেতে হবে। রাজার এই সাংঘাতিক আজ্ঞা শুনে দারুণ ক্ষুব্ধ হল ওরা। সবাই মিলে ঠিক করল, কিছুতেই মাতৃভূমি ছেড়ে যাবে না কেউ। বাধ্য হয়ে রাজা পীড়ন শুরু করল। কিন্তু কৃষকরা তাদের বাপ-ঠাকুরদার বাপোতা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাজি না। তারা বললে, 'আমাদের পুত্র-পৌত্রদের একমাত্র সংস্থান এই বাপোতা। বংশপরম্পরায় আমরা এরই অমৃতে মানুষ হয়েছি, রাজা ইচ্ছে করলে আমাদের সংহার করতে পারেন, যে বাপোতা এতকাল ধরে আমাদের জীবন রক্ষা করে এসেছে আজ না হয় তারই জন্যে আমরা জীবন দেব। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর রাজ-আজ্ঞা আমরা কিছুতেই মানতে পারি না।'

রাজা প্রমাদ গণল। কৃষকরা জীবন দেবে তবু মাতৃভূমি ছাড়বে না, জানত সে। শেষে ঠিক হল, মারবারের দশহাজার কৃষক যে ভূসম্পত্তি

বাপোতা হিসাবে ভোগ দখল করে আসছে সেই বিশাল এলাকা সুদ্ধ মিবার-রাজকে হস্তান্তরিত করা হবে। এবার কৃষকরা বিচলিত হল। যে মারবার রাজ্যে বসবাস করার জন্যে তাদের এই সংগ্রাম তাই যখন বেহাত হয়ে যাচ্ছে তখন শুধু শুধু মাতৃভূমির এক অংশ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে কি লাভ? সবাই এসে সাশ্রু নয়নে রাজাকে জানাল, 'আমরা মিবারেই যাব।' এই সব জাট-কৃষকদের বংশধররা আজও বেরিশ এবং বুনাসের তীরে বসবাস করছে।

মিবারের জিহাজপুর অঞ্চলে রাণার খুব তেমন আধিপত্য ছিল না। তাই সেখানে রাজবিধি যথাযথ আরোপ করা সম্ভব হয় নি। এক শো ছয়টি গ্রাম নিয়ে এই সুবিস্তৃত জিহাজপুর। এর মধ্যে মাত্র তুটুকরো রাণার খাস জমি ছিল। আর সবটাই প্রজাদের দখলে। কোটার জলিমসিংহ যখন জিহাজপুরের শাসনকর্তা সে-সময় বাকী-খাজনার দায়ে ঐ তুখণ্ড জমি নীলাম করে রাজ-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাবেই লোহারিও এবং ইতুণ্ডা নামে তুটি জলাশয় এবং তার আশে-পাশের কিছু জমি রাজার খাস সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। যে ভূমি একদিন ভূমিয়া মীনদের বাপোতা ছিল কালে তার কিছু অংশ এইভাবে রাজার খাস দখলে চলে আসে। এতকালের বাপোতা প্রথায় ভাঙ্গন ধরল। ধীরে ধীরে কৃষকের জমি রাজার হাতে চলে যেতে লাগল।

ভগবান মনু যে পল্লী-সমিতির বিধি তৈরি করে গেছেন, মিবারে তার যথাযথ আরোপ করা হয়েছিল। প্রাচীন কালে যে পাঁচসাত খানা গ্রাম নিয়ে এক একজন গ্রামীন থাকত মিবারেও সেই রকম পঞ্চগ্রামপতি বা সপ্তগ্রামপতির ব্যবস্থা ছিল। এদের বলা হত পেটেল। এই পেটেল থেকে অত্যন্ত দীন কৃষক পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজের নিজের জমির সম্পূর্ণ মালিক ছিল। তারা শুধু তিন বৎসর পর পর একটি কর এবং তুটি যুদ্ধ কর দিয়েই মুক্ত।

অনেকের মনে হতে পারে, ভগবান মনুর নির্দেশিত গ্রামীনের কর্তব্য আর পেটেলের কর্তব্যর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, আসলে কিন্তু তা ঠিক

না। সেকালেও পেটেলদের মত গ্রামীনরা রাজা ও প্রজার মধ্যে যোগা-যোগের একমাত্র সূত্র হিসেবে কাজ করত। প্রজাদের কোন কিছু আবেদন নিবেদন থাকলে পেটেলের মারফতেই তারা তা রাজাকে জানাতে পারত। এজন্যে প্রজারা তাদের উৎপন্ন শস্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পেটেলকে স্বেচ্ছায় প্রদান করত। আবার রাজার কাছ থেকে কিছু অনুগ্রহ পেত পেটেলরা, ঠিক গ্রামীনরা যেমন পেত। মারাঠি দস্যুরা যখন থেকে মিবার তছনছ করতে শুরু করে তখন থেকে পেটেলদের প্রয়োজনীয়তাও বাড়তে থাকে। গ্রামে গ্রামে ঢুকে মারাঠিরা লুঠপাট শুরু করলে পেটেলদের চেষ্টাতেই এই লুঠতরাজ খানিকটা কমত। কিন্তু এতে ঝামেলাও ছিল অনেক। পেটেলদের বন্দী করে নিয়ে যেত ওরা। এবং গ্রামবাসীদের নাম-ধাম অবস্থা জেনে নিয়ে সেই ভাবে কর আদায় করা হত নিরীহ প্রজা-দের কাছে থেকে। যতক্ষণ না যথা-নির্দিষ্ট অর্থ আদায় হত তখন তার মুক্তি নেই। পরে অবশ্য মারাঠিদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতে হত না, তারা এসে পেটেলদের ওপর চাপ দিত, পেটেলদেরই দায় ছিল অর্থ সংগ্রহ করে মারাঠা দস্যুর পেট ভরানো। এর ফলে পেটেলদের ক্ষমতাও অসাধারণ বেড়ে গি.য়েছিল। তখন তারা রাজাকে নামে মাত্রই জানত, আসলে তাদের নৃপতি ছিল পেটেল। ভগবান মনুর নামে দেশে অনাচার চলতে লাগল শেষে। মারাঠি দস্যুর নাম করে এই সব পেটেলরা যখন তখন কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করত। প্রজারা অগতির গতি একমাত্র পেটেলের ওপর নিজের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হত। দেশের রাজা যেখানে অক্ষম সেখানে প্রজাদের এ দুর্গতি ছাড়া আর উপায় কি! এই ভাবে বহু শান্ত নিরীহ প্রজার সর্বস্ব আত্মসাতের উদাহরণও পেটেলরা বহু রেখে গেছে। প্রজারা যে কিছুই বুঝত না তা না। তারা জানত মারাঠিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের সর্বনাশ করতেই পেটেলরা ব্যস্ত, তবু রাজার কানে সে কথা তোলার কোন উপায় ছিল না। যাকে মধ্যস্থ করে তারা রাজার সঙ্গে কথা বলত সেই সর্ষের মধ্যেই যে ভূত! তাছাড়া রাজাকে বলে আরো বিপদ বাড়াবার

কোন মানে হয় না। রক্ষা করার ক্ষমতা নেই যার এক কড়া তাকে বলে কি লাভ! লাভের মধ্যে পেটেলের কোপে পড়ে ভস্ম হয়ে যেতে হবে। এই সব পেটেলদের সঙ্গে উচ্চপদের রাজকর্মচারীদের যোগসাজস ছিল। ফলে দেশের মধ্যে অনাচারের চূড়ান্ত ঘটে যেতে লাগল। রাণা তার কিছুই অনুমান করতে পারল না। কোনকথাই তার কাণে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

বৃটিশের সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পর কর্ণেল টডের অক্লান্ত চেষ্টায় এই সব পেটেলদের অত্যাচার থেকে কৃষকরা রেহাই পেয়েছিল। মিবারের প্রাচীন বিধি নিয়ম অনুশীলন করে দেখা গেল, আগেকার দিনে গ্রামবাসীদের যাকে ভোট দিত সেই হত পেটেল। আবার যখন তারা তার কাজে খুশী হত না তখন অন্য এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে বসা'ত পেটেলের পদে। কিন্তু পরে কালক্রমে এই নির্বাচনের ব্যাপারটা একেবারেই ধামাচাপা পড়ে যায়। পেটেলের বংশধরই পেটেল হবে, এ নিয়ম কায়েম করে নিয়েছিল তারা কৌশলে। পরে অবশ্য রাণারাই এ ব্যাপারে পেটেলদের আধিপত্য পাকা করে দিয়েছিল। পেটেলের পদ বিক্রি করত রাণা। অর্থ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিনে নিতে পারত যে কেউ। কিন্তু এ ব্যবস্থা যে কতটা অনিষ্টকর ছিল তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যারা আগে থেকেই পেটেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিল, সাধারণ প্রজাদের তুলনায় তারা অপেক্ষাকৃত বিত্তবান সন্দেহ নেই, সুতরাং পয়সা দিয়ে কোন আকাঙ্খিত বস্তু কেনার প্রশ্ন উঠলে একমাত্র তারাই যে সমর্থ হবে এ-তে আর দ্বিধা কি! তাই এই পেটেলের পদ বংশপরম্পায় তারাই অধিকার করতে লাগল। শেষে দাঁড়াল, এটা তাদের জন্মগত অধিকার। নিরীহ প্রজা প্রতিবাদ করবে, জো কি। কর্ণেল টডের চেষ্টায় বহুকাল বাদে আবার পেটেলের নির্বাচন হল। আর টাকা দিয়ে মাথা কেনা নয়, মাথা বিকিয়ে দিয়ে এবার প্রজাদের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে লাগল পেটেলরা। মনে শঙ্কা ছিল, এতদিনের এত অত্যাচার কি এরা ভুলে যেতে পারবে সহজে! কিন্তু প্রজারা আর ফাঁদে পা দিল না। ভোটের জোরে তারা নির্বাচন করল

তাদের নিজেদের লোক। পুরোনো পেটেল বরবাদ হয়ে গেল।

কি ভাবে মিবারের রাজস্ব আদায় হত, তাও বলা দরকার। মিবারে দুরকম প্রথা ছিল, সেই প্রথানুসারে সব রকম উৎপন্ন শস্যের ওপর কর সংগ্রহ করা হত। এই দুই প্রথা—কুঙ্কুট এবং ভুট্টাই। সর্ষে, যব গম তুলো, পোস্ত নীল এবং ফুলের বাগানের ওপর প্রতিবিঘায় দুই টাকা থেকে ছয় টাকা পর্যন্ত কর ধার্য করা হত। খেতখামারে যখন শস্যের মরশুম তখন পেটেল, পাটোয়ারী এবং রাজকর্মচারীরা যে কর ধার্য করত তার নাম কুঙ্কুট। ক্ষেত্রস্বামী যদি তা অনায্য বলে মনে করত তা হলে সে ভুট্টাই-এর প্রস্তাব তুলতে পারত। শস্য কেটে মাড়াই করার পর ওজন করে যে অংশ করা হত তাকে ভুট্টাই বলা হত। ভুট্টাই প্রাচীন প্রথা। এতে দুপক্ষই সন্তুষ্ট থাকত। ভুট্টাই হিসেবে রবি শস্যের তিনভাগের এক ভাগ এবং ধানের অর্ধেক রাজাকে দিতে হত। কুঙ্কট প্রথানুসারে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে রাজকর্মচারীরা বেশ কিছুটা অসৎ উপায়ে কিছু রোজগারের সুযোগ পেত। কৃষকরা ঘুষ খাইয়ে শস্যের পরিমান কমিয়ে বলায় কৃষকরা লাভবান পরোক্ষে রাজভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হত। রাজকর্মচারী পেট পুরে পিটান নিলে প্রহরী এসে চোখ রাঙাতে আরম্ভ করে। বাধ্য হয়ে তাকেও খুশী করতে হয়। এই ভাবে কৃষকের লাভের গুড় পিপঁড়েয় খেয়ে যায়।

১৮১৮ সাল থেকে ২২ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে মিবারে যে বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হয়েছিল তার মধ্যে ১৮১৮তে রবিশস্য থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ১৮১৯ সালে ৪৫২২৮১ টাকা ১৮২০ সালে ৭৫৯১৮০ টাকা ১১৮১ য় ১০৪৭৮ টাকা এবং ২২ সালে ৯৩৬৬৪০ টাকা সংগৃহীত হয়। ঐ পাঁচ বৎসরে বাণিজ্যশুল্ক যা আদায় হয়েছিল তার মধ্যে ১৮৮৮তে যৎসামান্য। কিন্তু বাকী তিন বৎসরে যথাক্রমে ৯৬৮৬৮০ টাকা ২২০০০ টাকা এবং ২৩৭০০০ টাকা। এই আয়ের সঙ্গে মিবারের তুলনা করলে বেশ বোঝা যায় যে, ঐ সময়ে মিবারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ছাড়াও মিবারে অনেকগুলো ধাতুর খনি ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেও জবুরা এবং দুবিবার টিনখনি থেকে

বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আয় হত। কিন্তু পরে রাজার অবহেলার জন্যে খনি গুলোর কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বৃটিশদের চেষ্টায় এই সব খনিগুলোতে আবার কাজ শুরু হল। পরের বৎসরের মধ্যেই একটা মোটা টাকা আয় হতে লাগল।

১৭

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে রাজবারায় পুরাণের সমাদর ছিল বেশী। পুরাণের ধর্মই রাজপুত জীবনের মূল-মন্ত্র। রাজপুতরা বেদ জ্ঞানে পুরাণ পূজা করে থাকে। পূর্বপুরুষদের মহৎ কীর্তি কাহিনীর একমাত্র সাক্ষী এই পুরাণ, রাজপুতদের অখণ্ড বিশ্বাস। দেবাদিদেব মহাদেব তাদের পরম আরাধ্য দেবতা। গঙ্গা-যমুনার দুই তীরের অধিবাসীরা নানা রকম পুতুল পূজায় বিশ্বাসী। এবং এই কারণেই রাজস্থানের কোন কোন স্থানে শিব-পূজায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা গেছে। গিহ্লোটরা শিবকে পূর্ণ এবং লিঙ্গ দুই মূর্তিতেই উপাসনা করে থাকে। মিবারে শিব একলিঙ্গ নামে খ্যাত। একলিঙ্গ দেবের অনেকগুলো মন্দির মিবারে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মন্দিরেই দেব বিগ্রহের পুরোভাগে তার প্রিয় বাহন বৃষের ধাতুনির্মিত মূর্তি আছে। মিবারে যতগুলো শিব-মন্দির দেখা যায় তার একটি মন্দিরই সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। উদয়পুরের ছ'মাইল উত্তরে এক পার্বত্য উপত্যকায় মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। একলিঙ্গদেবের পুরোহিতরা আজীবন অকৃতদার। সারা জীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে মৃত্যুকালে পালিত-শিষ্যের হাতে মন্দিরের ভার দিয়ে যায়। এদের গোস্বামী বলা হয়। এরা সবাই চন্দন দিয়ে কপালে অর্ধচন্দ্রের মত তিলক কাটে। মাথায় জটাজুট কেশ, তার মধ্যে একটি বেলপাতা গুঁজে রাখে। সারা দেহে ছাই মেখে পরনে কৌপিন এঁটে থাকে। মৃত্যুর পর এদের দেহ আগুনে পোড়ানো হয় না, পদ্মাসন ভাবে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির ওপরে একটি মাটির স্তূপ তৈরি করা হয়।

কোন কারণে পুরোহিত অনুপস্থিত থাকলে শুদ্ধচারিণী যোগিনীরা দেবতার পূজা সম্পন্ন করতে পারত। মিবারে অনেক গোস্বামী দেখা যায়, যারা অকৃতদার তবে ব্যবসা বাণিজ্য এবং যুদ্ধবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বণিক গোস্বামীরা ভারতের মধ্যে এক সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায়। অস্ত্রধারী গোস্বামীরা মিবারে সংখ্যায় অনেক। রাণার বিশেষ আনুকুল্য ছিল এদের প্রতি। অস্ত্রধারী গোস্বামীরা মিবারের সর্বত্র বিভিন্ন মঠে বা আশ্রমে অবস্থান করত। তাদের কিছু কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। কখনও তারা ভিক্ষা বা পরচর্যা করে জীবন ধারণ করত। এই সব গোস্বামীরা কান ফুটো করে এক রকম শাঁখের বালা পরত।

মিবারে জৈন সম্প্রদায়ের লোকও অনেক। শৈবরা জৈনদের বিদ্বান বলে উপহাস করত। স্বনামখ্যাত জৈন পণ্ডিতসিংহ অলৌকিক ক্ষমতা অমাবস্যার রাত্রে নাকি চন্দ্র প্রকাশ সম্ভব করেছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা জৈনদের এই মহিমার কথা বড় একটা জানত না। তারা শুধু জানে, পৃথিবীতে নগন্য সংখ্যার এক জৈন সম্প্রদায় আছে। জৈনদের ধর্ম এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। একমাত্র ক্ষত্রগাছা শাখার প্রধান পুরোহিতের এগারো হাজার শিষ্য ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এবং অসি নামে যে শাখা, তার একলক্ষ জৈন শুধু রাজস্থানেই বসবাস করছে। ভারতের যতগুলো বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য আছে তার প্রায় অর্ধেকেরও বেশীর মালিকানা এই জৈনদের। জৈন বা বৌদ্ধধর্মের প্রথম অভ্যুদয় রাজস্থান এবং সৌরাষ্ট্রে। জৈনমতে যে পাঁচটি পাহাড় পবিত্র, তার মধ্যে আবু, পানিগাল, গির্ণাই ধর্মযুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি। মিবারের মন্ত্রিসভা এবং রাজস্বর সমস্ত কর্মচারীই জৈন শ্রাবক বংশের। অহিংসাই জৈনদের পরম ধর্ম। জ্ঞাতসারে কখনও তারা প্রাণী হত্যা করে না। তাদের এই ধর্মভীতির জন্যেই তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন একটা সুবিধে করতে পারেনি। আনহলবারাপত্তনের শেষ রাজা কুমারপাল জৈন ধর্মী ছিল। বর্ষাকালে পোকামাকড় বাইরে বেরিয়ে আসে, হাতী ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে তারা প্রাণ হারাবে এই আশঙ্কায় ঐ সময়ে সমরায়োজন

করত না সে। এমন কি প্রজ্বলিত প্রদীপ ছেড়ে জৈনরা সরে যেত না, পাছে কোন পতঙ্গ এসে পুড়ে মরে!

বৌদ্ধ শৈব এবং শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফের বিদ্বেষের ফলে সারা ভারতে দারুণ অনৈক্য উপস্থিত হয়েছিল। ভগবান শঙ্করাচার্যের অবির্ভাবে এর কিছুটা প্রশমিত হয়। অলৌকিক ক্ষমতাবলে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটাতে পেরেছিল সে। এখন আর বৌদ্ধ শৈব শাক্তদের মধ্যে আগেকার মত বিদ্বেষ নেই। যখন জৈন এবং বাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বেধেছিল তখন হাজার হাজার জৈন এবং ব্রাহ্মণ নির্মমভাবে নিহত হয়। সে-সময় বহু নিপীড়িত জৈন এসে আশ্রয় নিয়েছিল মিবারে। মিবারের প্রায়-কোন রাজাই শৈব ধর্ম ত্যাগ করে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু জৈন ধর্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দেখিয়েছে। গিহ্লোটবংশের আদি পুরুষরা জৈনধর্মকেই মুখ্য-ধর্ম বলে মনে করত। চিতোরে পার্শ্বনাথের গগনচুম্বি স্তম্ভটি তারই সাক্ষী হয়ে আছে। এই স্তম্ভটির উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। মধ্যে পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের যে-সব নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকে সহজেই অনুমান হয়, হিন্দুরা এক সময়ে স্থপতি বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। মুসলমানদের দৌরাত্ম্যে যখন ভারতের প্রাচীন পুঁথিপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল সে-সময় জৈনরাই রক্তের বিনিময়ে তার কিছুটা রক্ষা করেছিল। যশল্মীর, প্রাচীন আনহলবারা, কাম্বের এবং অন্যান্য জৈন পীঠের অমূল্য গ্রন্থাগারগুলো আজও অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ। কঠোরতম শাসনব্যবস্থা, নিষ্ঠুরতম উৎপীড়ন এবং শোকাবহ অত্যাচার সহ্য করেও ধর্মপ্রাণ জৈনরা এই সব অমূল্য রত্ন রক্ষা করতে পেরেছিল। তাদের এই ধর্মানুরাগ সত্যিই প্রশংসার।

হিন্দুধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ই মিবারে যথেষ্ট সমাদর পেত। মিবারের রাজা যে শুধু শৈব এবং জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগ দেখাত তা না, বৈষ্ণব ধর্মের রক্ষা এবং উন্নতি সাধনও করে গেছে তারা। মিবারে নাথদ্বার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবের মন্দিরই এর যথেষ্ট প্রমাণ। হিন্দু বিদ্বেষী পাষণ্ড অউরঙ্গজেবের নির্মম অত্যাচারে ব্রজধাম ছেড়ে বৈষ্ণবরা ভারতের নানা

রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল একটু আশ্রয়ের জন্যে, কিন্তু অউরঙ্গজেবের ভয়ে কেউই আশ্রয় দিতে সাহস পায় নি। শেষে উদয়পুরের রাণা দিল্লীর বাদশাহর সব ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তাদের বুকে করে নিয়েছিল। উদয়-পুরের বাইশ মাইল পূর্ব-উত্তরে ঐ মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের সিঁড়ি-গুলো শ্বেত পাথর দিয়ে তৈরি। সেই সিঁড়ির নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে বুনাস নদের প্রবাহ। বৈষ্ণবদের এক প্রধান তীর্থ এই নাথদ্বার। দেব মূর্তি ছাড়া সেখানে দর্শনযোগ্য অন্য কিছু নেই। এই মন্দিরটির গায়ে স্থপতিবিদ্যার কোন নিদর্শন রাখা হয়নি। খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার বছর আগে পুণ্যসলিলা যমুনার তীরে যে কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অনেকের ধারণা, সেই বিগ্রহই নাথদ্বারে এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গয়ার পর্বত কন্দরে, দ্বারকার বিস্তৃত উপকূলে এবং বৃন্দাবনধামে যে সব চিত্তবিনোদনের চিত্র দেখা যায় নাথদ্বারে তার কিছু নেই, তবু প্রতিবৎসর ভারতের নানা জায়গা থেকে অসংখ্য যাত্রী ভীড় করে এই পবিত্র নাথদ্বারে।

পরধর্ম বিদ্বেষী অউরঙ্গজেব ব্রজধাম ছারখার করে দিয়েছিল। তিন হাজার বছর ধরে বৈষ্ণবদের এই পবিত্র তীর্থস্থানটি শ্মশান হয়ে যায়। অউরঙ্গজেবের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে বৈষ্ণবরা দেববিগ্রহকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিল। মহম্মদের অত্যাচারেও শ্রীকৃষ্ণের আসন টলে-ছিল, তবু আবার তাকে তার যথা নির্দিষ্ট মন্দিরে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু অউরঙ্গজেবের অমানুষিক অত্যাচারের আশঙ্কায় আর ব্রজে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি শ্রীকৃষ্ণকে। ভাবলেও অবাক লাগে, এই অউরঙ্গজেবের পূর্বপুরুষ আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিল। অনেকে অনুমান করে, এরা নিজের ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে নতুন এক ধর্মের প্রবর্তনে আগ্রহী ছিল। তাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হলে আজও বাবরের বংশধররাই ভারত শাসন করত, সন্দেহ নেই।

নীতি বিশারদ জাহাঙ্গীর মাতৃকুলে রাজপুত। এই কারণেই হিন্দুদের ওপর তার আকর্ষণ ছিল বেশী। তার পিতার মত সেও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে

ভক্তি নিবেদন করত। কিন্তু তার পুত্র শাহজাহান, পিতার পথ অনুসরণ করেনি। তার অনুরাগ ছিল শৈব-ধর্মে। সিদ্ধরূপ নামে এক সিদ্ধপুরুষ তাকে শৈব-ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল। এই কারণেই তার রাজত্বকালে শৈব ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রাজার বিশেষ অনুগ্রহ পেয়ে শৈবরা বৈষ্ণবদের ওপর পীড়ন শুরু করেছিল। তাদের অসহ অত্যাচারে ব্রজধাম ছেড়ে বৈষ্ণবরা মিবারে গিয়ে উপস্থিত হয়। মিবার রাজের এক কন্যার বিশেষ চেষ্টায় দেব-বিগ্রহকে আবার তার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন তাকে আসনে থাকতে দেয়নি পাষণ্ড অউঙ্গজেব। কালিন্দীর কূল থেকে সে তাকে চিরদিনের জন্যে বিতাড়িত করল সে। সেই থেকে হিন্দুরা অউরঙ্গজেবকে 'কালযবন' বলে ডাকত।

ব্রজধামে কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছে সে তার ইয়ত্তা নেই। তার এই ঘৃণ্যতম আচরণে এবং নারকীয় অত্যাচারে শিশোদিয় রাণা রাজসিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই অপমানে জ্বলে উঠে দিল্লীর বাদশাহর বিরুদ্ধে তরবারি খুলে ধরল সে। রাজসিংহর প্রচণ্ড রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল দিল্লীর মসনদ। দেবতাকে অপবিত্র করার আর সাধ্য হল না তার। রাজপুতরা কোটার মধ্যে দিয়ে রামপুর হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মিবারে নিয়ে এল। রাণার সাধ ছিল, একেবারে উদয়পরে এনেই তকে প্রতিষ্ঠিত করবে, কিন্তু আসার পথে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। মিবারের শিয়ার নামে এক গ্রামের ভিতর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রথ আসছে, এমন সময় হঠাৎ এক জায়গায় রথের চাকা গেল কাদায় পুতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঐ সামান্য-একটু কাদায় আটকে যাওয়া রথের চাকা মহামহা রথীরা এসেও এক চুল নাড়াতে পারল না। এও ভগবানের এক অপার লীলা। পণ্ডিতরা বললে, এখানেই অবস্থান করতে প্রভুর ইচ্ছে, সুতরাং আর কোথাও না নিয়ে যাওয়াই ভাল।

এ কথায় সকলেরই প্রত্যয় হল। রাণা ওখানেই মন্দির তৈরি করার নির্দেশ দিল। শিয়ার গ্রাম মিবারের অন্যতম যোড়শ সর্দার—কৈলবারা ভূমি বৃত্তির অধীনে। কৈলবারা সর্দার সাগ্রহে সেখানে এক সুন্দর মন্দির

তৈরি করিয়ে দিল। এবং দেব-সেবার জন্যে ঐ গ্রামটি উৎসর্গ করা হল। এই সময় থেকে নাথদ্বার বৈষ্ণবদের এক পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র।

নাথদ্বারের দৃশ্য বড় মনোহর। পুবদিকে সমুন্নত পর্বতপ্রাকার, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে বয়ে চলেছে বুনাস নদ। রাজপুতরা বিশ্বাস করে, এখানে একবার এলে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ঘোর অপরাধীও যদি নাথদ্বারে এসে আশ্রয় নেয় তবে রাজা তাকে কোন দণ্ড দিতে পারে না, এই নিয়ম। নাথদ্বার একটি ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে বহু লোকের বাস। যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে পল্লীর নানা স্থানে বিরাট বিরাট অশথ, বট ছায়া মেলে থাকে। বহু নরনারী সংসারের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে এই নাথদ্বারে এসে ইহ জীবনের মত আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তাদের বিশ্বাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করতে পারলে দ্বিতীয়বার আর পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে না।

১৮

মিবারে যে সব পালাপার্বনের উৎসব প্রচলিত আছে তা থেকে মিবার বাসীদের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

বসন্ত পঞ্চমী—মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন বাঙ্গলা দেশে বাণীবন্দনা করা হয়। রাজপুতরা এই দিনটিতে বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব করে থাকে। এই উৎসবে তারা উন্মত্ত হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে নাচগান ও আমোদ প্রমোদ করে। এই দিনটিতে ইতর ভদ্রে কোন বাচবিচার থাকে না। নিচজাতের লোকেরা সিদ্ধি, ভাঙ্গ, গাঁজা, মদ, আফিং প্রভৃতি নানা রকম মাদক দ্রব্য খেয়ে স্থানকালপাত্র ভুলে যার তার সঙ্গে যা তা রকমের আচরণ করে থাকে। যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অন্যসময়ে একটিও অপ্রিয় বাক্য উচ্চারণ করে না, তারাও সম্মান-সম্ভ্রম লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে ঐসব নিচজাতের লোকদের সঙ্গে গাঁজা ভাঙ্গ খেয়ে দলে ভিড়ে যায়। এই

দিনটিতে অনার্য ভীলরাও এসে রাজপুতদের সঙ্গে মিলে স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে।

ভানুসপ্তমী—বসন্তপঞ্চমীর দু'দিন পরেই ভানু সপ্তমী। তারা বিশ্বাস করে ঐ দিনে ভগবান আদিত্যের পুণ্য জন্মতিথি। এই দিনে রাণা সৈন্য-সামন্ত সর্দার ও পারিষদবর্গ সহ চৌগাঁ নামে এক জায়গায় যায়। সেখানে সূর্যদেবের উপাসনা করে সকলে। ভানুসপ্তমীতে জয়পুরে সূর্যপূজার বেশ আড়ম্বর হয়। কুশাবহরাজ সূর্য মন্দিরে প্রবেশ করে সূর্যদেবের আট ঘোড়ার রথটি বাইরে নিয়ে আসে আপামর জনসাধারণ সে-রথ টেনে শহরের চার পাশে পরিভ্রমণ করে।

শিবরাত্রি—মাঘ মাসের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শিবরাত্রির উৎসব হয়। হিন্দুমাত্রেই, বিশেষ করে রাণা এই তিথিকে পরম পবিত্র জ্ঞান করে। পাপিষ্ঠ ব্যাধ সুন্দর সেন এই দিনটিতে নিজের অজান্তে শিবপূজা করে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে কৈলাসে যেতে পেরেছিল। রাণা ভারতে শিবির প্রতিনিধি বলে খ্যাত, সুতরাং এই দিনটিতে সে দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে শিবপূজা করে থাকে। রাজপুতরা এই তিথিটি উপবাসে কাটায়। শৈব মাত্রেই সে-দিন কোন সাংসারিক কাজকর্ম করে না, সারা রাত ধরে ধরে জেগে শিবপূজা করে অতিবাহিত করে।

আহেরিয়া—ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসবটি। আগের দিন রাণা তার সর্দার এবং পরিচারকদের হলুদ রংএর অঙ্গরাখা উপহার দিয়ে থাকে। সেই রাজদত্ত পোষাক পরে সবাই রাজার সঙ্গে মৃগয়া করতে বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য বরাহ শিকার। মৃগয়ায় যদি কোন বন্য বরাহ পাওয়া যায় তবে তা ভগবতী গৌরীর সম্মুখে উৎসর্গ করা হয়। জ্যোতিষ গণনায় মৃগয়ালগ্ন ঠিক হয় বলে এর আর এক নাম মালুরৎকা শিকার। এই মৃগয়া ব্যাপারে রাজপুতরা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে। সে দিন যার লক্ষ্য ব্যর্থ হবে, সারাটা বছর তার খুব খারাপ যাবে, এই আশঙ্কা। এই জন্যে দেহের সমস্ত শক্তি প্রযোগ করে বরাহশিকার

করতে তারা এত উৎসাহী। কেউ কেউ আগে থেকে চর পাঠিয়ে বরাহর আস্তানার সন্ধান নেয়। একটা বরাহ দেখতে পাওয়া মাত্র সবাই এক সঙ্গে আক্রমণ করে থাকে। যার ভাগ্যে থাকে সেই শিকার করতে পারে। এই ব্যাপারে মারাত্মক এক প্রতিযোগিতা হয়। উদয়পুরের পাহাড়ী অঞ্চলে এই সব বরাহ পাওয়া যায়। পর্বত গুহাগুলো ঘিরে ফেলে হৈ হল্লা করতে শুরু করলে নির্জনবাস ছেড়ে বেরিয়ে ছুটে পালাতে থাকে বরাহগুলো। তখন শিকারীরা একেবারে উন্মত্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, বর্শা উঁচিয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করতে থাকে। সকলেরই এক লক্ষ্য। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক দারুণ রেষারেষির ভাব জেগে ওঠে। তার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনর্থ বেধে যায়। শিকারে যারা ব্যর্থ হয় তাদের রক্তে তখন নেশা ধরে। জন্তুজানোয়ার শিকারের অস্ত্র নর শিকারের কাজে লাগে। জানোয়ার আর মানুষের রক্তে লাল হয়ে যায় মাটি। মৃগয়া যাত্রায় রাজ-পাচক সঙ্গে থাকে। ভগবতী পার্বতীর চিরশত্রু বরাহ শিকার করতে পারলে ঐ বনের মধ্যে রান্নারান্নার ব্যবস্থা করা হয়। এবং রাণা পারিষদদের সঙ্গে বসে আহার করে।

ফাগোৎসব—ফাল্গুন মাসের যত দিন যেতে থাকে মিবারবাসীদের উৎকট আমোদ-প্রমোদের মাত্রাও তত বাড়ে। রাজা প্রজা সবাই মিলে মেতে ওঠে হোলী খেলায়। আবীরের ছড়াছড়ি। পিচকারীর রঙএ পথঘাট বিচিত্র হয়ে ওঠে। যারা কখনও অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসে, এই সময় তারা পর্দা ফেলে দিয়ে পথে নেমে এসে চেনা অচেনা সবার সঙ্গেই হোলী খেলে। এরা একে ফাগোৎসব বলে। রাণা এই দিন রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজমহিষী এবং পুরনারীদের সঙ্গে রঙের খেলায় মেতে ওঠে। সে-সময় কোন নারীর কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকে না। সব চেয়ে মজা হয় ঘোড়ার পিঠে চড়ে হোলী খেলায়। সর্দার এবং সামন্তরা আবীর কুমকুম নিয়ে রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গনে ফাগক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়। একজন অশ্ব চালিয়ে আর একজনকে আবীর লেপে দেবার জন্যে তাড়া করে, সেও অদ্ভুত দক্ষতায় তাকে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যায়।

দেখতে বেশ লাগে। হোলীর শেষ দিনে দুর্গ-পাহাড়ের ওপর থেকে অবিরাম নাগরা বাদ্য বাজতে থাকে। সামন্ত সর্দাররা রাণার কাছে এসে উপস্থিত হয়। তখন রাণা তাদের চৌগায় যাত্রা করে। চৌগা রাজপুতদের এক বিখ্যাত রঙ্গভূমি। লীলা যুদ্ধ বা অন্য কোন নতুন কৌশলের মহড়া দেবার সময়ে এরা সে মিলিত হয় এখানে। চৌগায়ে একটি বিশাল প্রাঙ্গন আছে, প্রাঙ্গনের মাঝখানে এক বিরাট স্তম্ভ। এক এই স্তম্ভটি মাথায় ধরে আছে এক প্রকাণ্ড ছাদের ছড়া। চারদিকে কোন প্রাচীর নেই, খোলা। ফাগোৎসবের দিনে রাণা পারিষদদের নিয়ে মাঝখানে বৃত্তাকারে বসে। এবং চারপাশে চলতে থাকে হোলীখেলা, নাচগানের লহরা। এই সব নাচ এবং গান প্রায়ই কুৎসিৎ ধরনের। এর ভাব ভাষা এবং অঙ্গভঙ্গী সংস্কৃতির নামে জঘন্যতম এক নারকীয় ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই কাঁচা আদি রসাত্মক নাচগানের সমান অংশীদার সেদিন রাণা, সর্দার, সৈনিক এবং সাধারণ লোক। উৎসবের শেষে রাণা সর্দারদের খাণ্ডা-নারকেল উপহার দেয়। ঐ সব খাণ্ডা (খাড়া) গুলো সাধারণত কাগজ বা পাতলা কাঠ দিয়ে তৈরি।

চাঁচর পর্ব—শহরের চারদিকে আগুন নিয়ে ভয়ঙ্কর খেলা শুরু হয়। হয়। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সারা দেহে আবীর লেপে আগুনের কুণ্ডের চারদিকে পৈশাচিক ভাবে বীভৎস নৃত্য করে। সারারাত ধরে চলে এই তাণ্ডব নৃত্য। সূর্যদেব মীন রাশিতে গমন করলে সবাই স্নানাদি করে বস্ত্র পরিবর্তন করে। এই দিনটিতে পরিচারকেরা নিজের নিজের প্রভুকে নানারকম সামগ্রী উপহার দিয়ে থাকে।

শীতলা ষষ্ঠী—চৈত্র মাসের শুক্লাষষ্ঠীর দিনে এই উৎসব হয়ে থাকে। রাজপুত মতে শীতলা দেবী শিশুসন্তানদের রক্ষা করে। উদয়পুরের এক পাহাড়ী উপত্যকায় একটি শীতলা মন্দির আছে। রাজপুত মহিলারা ঐ মন্দিরে গিয়ে নিজেদের সন্তানের মঙ্গল কামনা জানিয়ে দেবীর পূজা করে। এই শুক্লা ষষ্ঠীতে রাণা ভীমসিংহর জন্ম হয়েছিল। রাজপুতরা সবাই-

নিজের নিজের জন্মদিনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দেবীর সম্মুখে রাণার কল্যাণ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে মিবারবাসীরা রাজভবনে উপস্থিত হয়। শীতলা ষষ্ঠীর উৎসব অন্তঃপুরে হয়ে থাকে, সুতরাং বাইরের লোকে তা দেখতে পায় না। এই দিনে রাণা নতুন পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়। পুরনারীরা সারাদিন মঙ্গল গান করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানায়।

ফুলদোল—যে দিনে রাজা বিক্রমাদিত্যের চান্দ্রসৌর বর্ষারম্ভ হয় মিবারে সেদিন ফুলদোলের উৎসব। আশ্বিন মাসের নবরাত্রি উৎসবে যে সব বিধি অনুষ্ঠান আচরিত হয় ফুলদোলেও তার বেশীর ভাগই হয়ে থাকে। এর প্রথম অনুষ্ঠান খড়্গ পূজা। রাজভবনে এই পূজার আয়োজন করা হয়। তারপর পুরুষ এবং রমণীরা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে প্রমোদ-বিহারে বেরিয়ে পড়ে। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি রঙের ভারে নুয়ে পড়ে। ফুলে ফুলে ভরে ওঠে চার দিকে। হংসমিথুন উড়ে চলে আকাশে, নিরুদ্দেশের পানে পাড়ি জমায় তারা। ভালবাসার গানে মুখরিত হয়ে ওঠে দশদিক। বসন্তের বাতাস বয়, কামনার উত্তাপে কাতর হয় নরনারী। মদনের পূজায় দেহমন সমর্পন করে সকলে। মনের মানুষ নিয়ে নিভৃত কুঞ্জে বসে প্রেমালাপে অধীর হয়ে ওঠে রাজপুত যুবতীরা। কামনার জোয়ার আসে দেহে। ফুলের মত নিজের সুগন্ধ বিলিয়ে দিতে চায় সে প্রিয়তমকে। গাছের শাখায় ফুল-দোলনা বেঁধে দুজনে দুলতে দুলতে একে অন্যকে দেহ-মন সমর্পন করে। মেয়েরা কেউ রাধা সাজে, কেউবা তার সহচরী হয়, আর যুবকরা কেউ সাজে কৃষ্ণ কেউ সুবল কেউ বলরাম। আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে কুঞ্জ বন। নাচে গানে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস তরুলতা, শিহরণ জাগে যুবকযুবতীর কামনার তন্ত্রীতে। অপূর্ব ছন্দগীতিময় জয়দেবের পদাবলী গান গেয়ে আরও সুন্দর করে তোলে তাদের এই ফুলদোল উৎসব।

অন্নপূর্ণা—ভগবান মরীচিমালী মেষ রাশিতে প্রবেশ করলে রাজপুতরা ভগবতী অন্নপূর্ণার উপাসনা করে। আমাদের দেশে যে ধরনের অন্নপূর্ণা

মূর্তি গড়া হয় রাজস্থানেও ঠিক তেমনি। সিংহাসনের ওপরে আদ্যাশক্তি দ্বিভুজা অন্নদা মূর্তি বাঁ হাতে অন্নপূর্ণা স্বর্ণপাত্র, ডান হাতে রুপোর দণ্ডী, সামনে যোগীশ্বর শিব অন্ন ভিক্ষার্থী হয়ে দণ্ডায়মান। রাজপুতরা হর-পার্বতীর এই যুগলমূর্তির সামনে একটি ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র তৈরি করে বীজ বপন করে। কৃত্রিম উপায়ে একদিনের মধ্যে ঐ সব যব বীজ থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে। তখন রাজপুত রমণীরা পরস্পরে হাত ধরাধরি করে ভগবতী গৌরীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে করতে বৃত্তাকারে প্রতিমা এবং যব ক্ষেতের চারদিকে নৃত্য করতে থাকে। তারপর ঐ সব যবাঙ্কুর নিয়ে প্রিয়জনদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়। পুরুষরা নিজের নিজের উষ্ণীষে ধারণ করে সেগুলো। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত দেবীর পূজা করে থাকে। গৌরী দেবীর পূজা আরম্ভ করার আগে পেশোলা সরোবরে যেতে হয় স্নান করতে। তার আগে রাজপুত বরাঙ্গনারা দেবীকে একবার বরণ করে। বরণডালা হাতে নিয়ে রাজপুত ললনারা দেবীর বন্দনা গান গাইতে গাইতে প্রতিমা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। বরণ শেষ হলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নাগরা ধ্বনি করা হয়। সবাই তখন বুঝতে পারে, এবারে দেবীর নৌকা যাত্রার আয়োজন হবে। নাগরা ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একলিঙ্গদেবের মন্দির থেকে তোপধ্বনি হতে থাকে। এই সময় নানা পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে সবাই এসে উপস্থিত হয় পেশোলার ধারে। এইদিন পেশোলায় রূপের হাট বসে। রাণা সামন্ত-সর্দার পরিবেষ্টিত হয়ে পেশোলার সমুচ্চ চত্বরের চূড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকে। ঢাক ঢোল নাগরা প্রভৃতি বাজাতে বাজাতে দেবীকে নিয়ে আনা হয়, দেবীর নৌকায় আরোহন দেখার জন্যে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়ে পেশোলার ধারে। হাজার হাজার রাজপুত সুন্দরীরা এসে ভীড় করে ঘাটের সিঁড়ির ওপর। নানা রত্নালঙ্কার ও অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আসে সব মেয়েরা। পেশোলার ঘাট সেদিন রূপের লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দেবীর পরণে পীত বাস। সারা দেহ মনি মুক্তা রত্নাভরণে ভূষিত।

প্রতিমার দু পাশে দুজন রাজপুত রমণী চামর ব্যজন করতে থাকে। সামনে রূপোর লাঠি হাতে করে দাঁড়ায় অসংখ্য সুন্দর যুবতী। এক সঙ্গে এক সুরে গান গায় তারা। দেবী প্রতিমা এনে পেশোলার ধারে রত্ন সিংহাসনে বসানো হলে সবাই সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। রাণা দলবল নিয়ে নৌকায় গিয়ে বসে। রাজপুত মেয়েরা হাত ধরাধরি করে অপূর্ব ছন্দ ও তালে নাচগান করতে করতে দেবী-প্রতিমা প্রদক্ষিণ করে। তাদের এই শুদ্ধ তালের নাচ এবং সুমধুর সঙ্গীত অনুষ্ঠানের এক লোভনীয় আকর্ষণ। মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়াত বা নাচগান করত তার ধারে কাছে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। এই পবিত্রানুষ্ঠানে কেউ কোন ব্যাভিচার করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারপর দেবী প্রতিমা পেশোলার জলে নামিয়ে এনে স্নান করানো হয়। এ উৎসবে পেশোলার সব ঘাটেই অসংখ্য প্রতিমার স্নানানুষ্ঠান হয়ে থাকে। রাণা এ সময় নৌকায় বসে ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দর্শন করে। এর পর দেবী-প্রতিমা আবার ফিরে আসে মন্দিরে। সারাদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। রাণা সারাদিনব্যাপী নৌকায় চড়ে পেশোলার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তারপর সন্ধ্যা নেমে আসে। শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের আলো এসে পড়ে পেশোলার নীল জলে। রাণা তখন ফিরে যায় প্রাসাদে। তিনদিন ধরে দেবীর পূজা হয়। চতুর্থ দিনে অগ্নিক্রীড়ার মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

অশোকাষ্টমী—এ তিথি শোকনাশিনী বলে খ্যাত। এই উৎসবে ভগবতী বিশ্বমাতার পূজা করা হয়। রাণা সর্দার-সামন্তদের নিয়ে এইদিন চৌগায় গিয়ে আমোদ প্রমোদের মধ্যে সারাটা দিন কাটায়। প্রত্যেক রাজপুতই সেদিন কুল দেবী ভগবতী শাকম্ভরীর অর্চনা করে।

রামনবমী—অশোকাষ্টমীর পরদিন রামনবমী। এই পুণ্যদিনে পুনর্বসু নক্ষত্রে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিল। রামনবমীতে যুদ্ধাস্ত্র এবং গজাশ্বের পূজা করা হয়। এদিনও রাণা চৌগায় আমোদ প্রমোদের মধ্যে কাটায়। সারাদিনরাত্রি উপবাসী থেকে রাত্রি জাগরণ করে পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

মদন ত্রয়োদশী—চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীতে এ উৎসব হয়। হিন্দুমাত্রেই মদনের চর্চা করে থাকে। এর আগের অথবা পরের দিন, দ্বাদশী বা চতুর্দশীতেও এর অনুষ্ঠান করা যেতে পারে কিন্তু রাজপুতেরা ত্রয়োদশীতেই করে। বসন্ত বিদায় নিচ্ছে। গ্রীষ্মের খর-তাপের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। অসহ উত্তাপে অন্যান্য ফুলদল শুকিয়ে ঝরে পড়ছে, কিন্তু চামেলী তখনও অম্লান। এই সময় রাজপুত যুবতীরা চামেলীর মালা খোঁপায় জড়িয়ে মীনকেতনের পুজো করে। রাজপুত মেয়েরা যেমন ভক্তি সহকারে কামদেবের আরাধনা করে ভারতের অন্য কোথাও তেমনটি দেখা যায় না।

নবগৌরীপূজা—হিন্দুরা বৈশাখ মাসকে পরম পবিত্র মনে করে। এমাসটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। এ মাসে যে কৃষ্ণের আরাধনা করে সে পরলোকে বিষ্ণুর সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু রাজপুতদের মধ্যে এই বৈশাখ মাসে একটি মাত্র উৎসব হয়। তাও আবার তেমন আড়ম্বরের সঙ্গে হয় না। মিবারের ষোলজন প্রধান সর্দার সেদিন রাণার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে পেশোলার ধারে এসে উপস্থিত হয়। রাণার এই যাত্রাকে 'নাগরা-কা আসোয়ার' বলে। এই দিন যথা নিয়মে ভগবতী গৌরীকে স্নানাদি করানোর সময় সবাই আমোদ প্রমোদ করে থাকে। এ উৎসবটির আমদানী হালে। রাণা ভীমসিংহ ১৮১৭ সালে এ পর্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল। অনেকেই একে শাস্ত্র বিরোধী বলে মনে করে। এ উৎসবটি যে বৎসর শুরু হয় সে বৎসর পেশোলার জলোচ্ছ্বাসে দেশের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল, বন্যার ফলে তিনভাগের এক ভাগ জমির ফসলই জলের তলায় ডুবে যায়, এই দিনেই রাণার একটি পুত্রের প্রাণ হানি ঘটে। কিন্তু রাণা কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করেনি। সারাদিন সর্দারদের নৌকার ওপরেই কাটায় রাণা। সর্দাররাই নৌকা চালিয়ে থাকে।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে সাবিত্রীব্রত হয়। যে সব সধবা মেয়েরা সারা দিন উপবাসী থেকে সতীশ্রেষ্ঠা সাবিত্রীর পূজা করে তারা কখনও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না। রাজপুত মেয়েরা এই দিনে

এক বটবৃক্ষের তলায় সমবেত হয়ে সাবিত্রীর পূজা এবং তার পুণ্য কথা শ্রবণ করে।

অরণ্য ষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী দেবীর অর্চনা করা হয়। সন্তানের মঙ্গলার্থে সব মায়েরা বনের মধ্যে এক বটবৃক্ষের মূলে সমবেত হয়ে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে থাকে। এ দিনে কুল নারীরা পুত্র লাভের বাসনাও জানায়।

রথযাত্রা—বৈশাখে চন্দন, জ্যৈষ্ঠে স্নান, আষাঢ়ে রথারোহণ, শ্রাবণে শয়ন, ভাদ্রে পার্শ্বপরিবর্তন, কার্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষে পুণ্যস্নান, মাঘে মাল্য দান, ফাল্গুনে দোল এবং চৈত্রে মদন ভঞ্জিকা-যাত্রা পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ আছে। আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রার উৎসব হয়। রাজপুতরা এ উৎসবে দোল বা ঝুলন এর মত তেমন আড়ম্বর করে না।

পার্বতী তৃতীয়া—শ্রাবণের শুক্লাতৃতীয়াকে পার্বতী তৃতীয়া বলে। কিংবদন্তী আছে গিরিরাজকন্যা গৌরী এই দিনে ভোলানাথের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিল। রাজপুতরা এই ব্রতটি অবশ্য পালনীয় মনে করে। তাদের বিশ্বাস, এই দিনে শুদ্ধাচারে গৌরীর পূজা করলে দেবী প্রসন্ন হয়ে তাকে তার নিজের সহচরী করে নেয়। ভূমি অধিকার বা পরিত্যক্ত গৃহে পুনরাগমনের পক্ষে এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। বৃটিশের সঙ্গে রাণার সন্ধি হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্য থেকে মিবারবাসীরা আবার এই দিনটিতে স্বদেশে ফিরে এসেছিল। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক রাজপুত গাঢ় লাল রঙের পোষাক পরে। জয়পুরের রাজা সর্দারদের মধ্যে রক্তবর্ণের পোষাক উপহার দিয়ে থাকে। উদয়পুরের চেয়ে জয়পুরেই এই উৎসবে জাঁকজমক বেশী হয়ে থাকে। জয়পুরের রাজপুত মেয়েরা ভগবতী গৌরীর মূর্তিকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে কাঁধে বয়ে সমবেত সঙ্গীত গাইতে গাইতে ঘুরে বেড়ায়। রাজা সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের পিছনে পিছনে চলে। সব রাজপুতই নিজের কন্যাকে লালরঙের পোষাক উপহার দেয়।

নাগপঞ্চমী—শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমীকে নাগ পঞ্চমী বলে। অবিরাম

বর্ষণের ফলে মাঠঘাট যখন জলে ভরে যায় তখন সাপ এসে আশ্রয় নেয় লোকালয়ে। ফলে সাপের আধিক্য দেখা যায় গ্রামের মধ্যে। দেবী-মনসা নাগেশ্বরী ও বিষহরী। এই পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা করলে লোকের নাগভয় দূর হয়। এজন্য হিন্দু মাত্রেই দেবীর আরাধনা করে থাকে। উদয়পুরে মনসা পূজার কোন আড়ম্বর নাই।

রাখীপূর্ণিমা—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাই রাখী পূর্ণিমা। এই তিথিতে মিবারবাসীরা মহোৎসব করে থাকে। শাস্ত্রে আছে, শ্রবণা বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে দুর্বাসা মুনির উপদেশ অনুসারে একগাছা বালা ধারণ করেছিল। একেই রাজপুতরা রাখীবলয় বলে। রাজপুতদের মতে পুরো-হিত ও নারীরাই শুধু এই বলয় বিতরণের অধিকারী। তারা ছাড়া অন্য কেউ এ বলয় দিলে কোন শুভ ফল দেয় না। রাজপুত রমণীরা যাকে ভ্রাতৃবন্ধে আবদ্ধ করতে চায় তাকে সহচরী অথবা পুরোহিত মারফত রাখী বলয় পাঠিয়ে থাকে। বাংলা দেশে যেমন ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া উপলক্ষে বোনরা ভাইদের নববস্ত্র পরিয়ে দীর্ঘজীবন কামনা করে তেমনি রাজপুত মেয়েরাও এই রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে নিজের ভাইদের নববস্ত্র উপহার দেয়।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণর জন্ম। রাণা এই মাসের তৃতীয়াতে চৌগায় গমন করে। তৃতীয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত এই ছয়দিন ব্যাপী নানা উপচারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। অষ্টমীর দিন ভোরবেলা থেকে উদয়পুরের প্রত্যেক গৃহে আনন্দ উৎসব চলতে থাকে। হলুদ বস্ত্র পরিধান করে সারাদিন ধরে হরিনাম সংকীর্তনে মেতে থাকে সকলে। এ সময়ে রাণা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পনের দিন ধরে তর্পণ করে। আরা নামে এক জায়গায় রাণার পিতৃপুরুষদের এক একটি সমাধি মন্দির আছে, সেখানে গিয়ে ধূপ, দীপ পুষ্পমাল্য ও নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করা হয়। রাণা ছাড়া সামন্ত সর্দাররাও তর্পণ করে থাকে।

খড়্গ পূজা—রণদেবতার উদ্দেশে এই উৎসব পালন করা হয়। এর অন্য নাম নবরাত্রি। খড়্গ পূজা করাই এ উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। খুব

ভোরবেলা স্নানাদি সমাপন করে পূজায় বসে রাণা। গিহ্লোট বংশের বিখ্যাত অসিখানি বের করা হয় অস্ত্রাগার থেকে। তারপর সামন্ত সর্দারসহ সেই অসি কিষণগোল তোরণদ্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই তোরণ দ্বারের পাশেই অষ্টভূজা দেবীর মন্দির। রাজস্থানে রাজযোগী নামে এক সম্প্রদায় আছে, এরা প্রয়োজন হলে যুদ্ধেও যোগদান করে। ঐ মন্দিরের সামনে মোহন্ত ও অন্যান্য শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে রাজযোগী রাণার হাত থেকে অসিখানি গ্রহণ করে দেবীর সামনে স্থাপন করে। অপরাহ্নে ত্রিদ্বার মঞ্চ থেকে নাগরা ধ্বনি হতে থাকে, এই সময় রাণা মহিষ-শালার দিকে ছুটে যায় এবং একটি মহিষ নিয়ে এসে যুদ্ধাশ্বের উদ্দেশে বলি দেয়। এর পর রাণা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করে রাজযোগীর হাতে দুটি রূপোর মুদ্রা ও একটি নারকেল প্রদান করে থাকে। যথা বিহিত অসির পূজা করে আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মীপূজা—কার্তিকমাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় রাজপুতরা লক্ষ্মীপূজা করে থাকে। এইদিন লক্ষ্মীপূজায় সৌভাগ্য লাভ হয়। বাঙ্গলাদেশে লক্ষ্মীপূজায় যেমন আড়ম্বর হয় মিবারেও ঠিক তেমনি হয়ে থাকে।

দেয়ালী—কোজাগরীর পনের দিন বাদে যে অমাবস্যা, সেদিন দেয়ালীর উৎসব করে এরা। আলোর মালায় সাজানো হয় ঘরবাড়ি, পথঘাট, সারা রাজস্থানেই এ উৎসবের বেশ জঁাকজমক হয়। এই দিন মিবারের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নানা উপাচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে কমলা মন্দিরে উপস্থিত হয়। এই দিনটিতে রাণা প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসে আহার করে। আহারকালে রাণা সারাক্ষণ বাঁ হাত দিয়ে একটি মাটির পিলসুজ ধরে থাকে ; এবং প্রধানমন্ত্রী সেই পিলসুজের প্রদীপের ওপর অনবরত তেল দিতে থাকে। রাণার আত্মীয়স্বজনরাও এই প্রথার অনুকরণ করে। যে পাশাখেলা ভগবান মনু অনিষ্টকর বলে নিষিদ্ধ করে গেছেন, এই তিথিতে রাজপুতরা সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাশাখেলায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বাস সে-দিন যে পাশা খেলায় জিততে পারে সারা বছর তার ভাল যায়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—দেয়ালীর পরে শুক্লাদ্বিতীয়াতে ভাতৃদ্বিতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যকন্যা ঐ দিনে নিজের ভাই যমকে স্বগৃহে ভোজন করিয়েছিল। সে জন্যে এই দিনটি ভ্রাতৃপ্রেমের শ্রেষ্ঠ তিথি বলে গণ্য করা হয়। আর্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, এই দিনে কোন নারী তার ভাইকে চন্দনতাম্বুল দিয়ে অর্চনা করে ভোজন করালে কখনও সে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না। তার ভাইএরও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন রাজপুতরা পৌষ পার্বণের ব্রত করে থাকে। গোধূলি লগ্নে যখন ধেনুদল চতুর্দিক ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন করে গৃহে ফিরে আসে সে সময় রাজপুতরা ভক্তিভরে তাদের পূজো করে থাকে।

অন্নকূট—শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রাজস্থানে যে সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে অন্নকূটই সব চেয়ে বিখ্যাত। নাথদ্বারে এই উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বৈষ্ণব এসে যোগ দেয়। রাজবারার বিভিন্ন নগরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সাতটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এই সময়ে সেগুলো নাথদ্বারে নিয়ে এসে মহা আড়ম্বরে পূজা করা হয়। এই সপ্তমূর্তির সেবার জন্যে নাথদ্বারে স্তূপীকৃত অন্ন-ব্যঞ্জন পাহাড়ের চূড়ার মত করে সাজানো হয়। দেবতার ভোগ শেষ হলে ভক্তরা সে-গুলো আহার করে। এক কালে এই অন্নকূট-উৎসব মহা আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। একবার মিবাররাজ অরিসিংহ, মারবার রাজ জয়সিংহ, বিকানীর রাজ রাজ-সিংহ এবং কিষাণগড়ের রাজা বাহাদুরসিংহ এই উৎসব উপলক্ষে নাথদ্বারে মিলিত হয়ে দেবতার চরণে মণিমাণিক্য উৎসর্গ করে দেব-প্রসাদ-লাভ করে ছিল। রাজা-রাজড়া ছাড়াও সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাও দুহাতে ধনরত্ন ঢেলে দিত এই উৎসবে। শোনা যায়, রাজস্থানের এই চার প্রধান রাজারা যখন নাথদ্বারে এসে মণিরত্ন নিবেদন করেছিল সে সময় সুরাটের এক সামান্য বিধবা তার সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সাত হাজার টাকা মন্দিরে দান করে। নাথদ্বারে সপ্তমূর্তি একত্রিত করেছিল বল্লভাচার্য। বহুকাল যাবৎ একটি মন্দিরেই এই মূর্তিগুলো পূজিত হয়েছিল, পরে বল্লভের পৌত্র তার পুত্রদের মধ্যে এই সপ্তমূর্তি বিভাগ করে দেয়। এদের বংশধররা

আজও এই সপ্তবিগ্রহের মন্দিরে পুরোহিত হয়ে আছে। নাথদ্বারে আছে ননান্দদেব, মথুরানাথ ও বেতালনাথ আছে কৌটায়, কাঙ্কারাওলিতে দ্বারকানাথ, জয়পুরে মদনমোহন ও গোকুলনাথ এবং সুরাটে আছে যদুনাথ।

নোনীত—নাথদ্বারের খুব কাছেই এর মন্দির। একে বাল মুকুন্দও বলে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যমূর্তি, ডানহাতে পেঁড়া ধরে রয়েছে। মুসলমানরা যখন শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ভেঙ্গে চুরমার করে সে সময় থেকে বহুকাল যমুনার জলে নিমগ্ন ছিল দেবতা। অবশেষে বল্লভাচার্য একদিন স্নান করতে গিয়ে এই মূর্তি লাভ করে।

মথুরানাথ—এর সম্বন্ধে তেমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আগে মিবারের কামনার নগরে অধিষ্ঠিত ছিল। পরে তাকে কৌটায় এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

দ্বারকানাথ—বল্লভাচার্যের তৃতীয় প্রপৌত্র বালকৃষ্ণ এই মূর্তি পেয়েছিল। কিংবদন্তী আছে, সত্যযুগে সূর্যবংশের রাজা অমরিক এক বিষ্ণুমূর্তির অর্চনা করত। দ্বারকানাথ সেই বিষ্ণুমূর্তির প্রতিরূপ।

গোকুলনাথ—এর সম্বন্ধেও ঐ ধরনের এক বিচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়। লোকে বলে, এক বিলের জলের নিচে থেকে বল্লভাচার্য মূর্তিটি পেয়ে তার শ্যালককে দিয়েছিল। তারপরে গোকুলপুরীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমানে জয়পুরের মন্দিরে আছে।

যদুনাথ—মথুরার কাছেই মহাবনে অধিষ্ঠিত ছিল। মহম্মদের তাণ্ডব লীলায় মথুরা ধ্বংস হয়ে গেলে তাকে সুরাটে এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বেতালনাথ—এর আর এক নাম পাণ্ডুরঙ্গ। ১৭৫২ সংবতে কাশীর গঙ্গাগর্ভ থেকে একে পাওয়া গেছে।

মদনমোহন—এক চারণী এর অর্চনা করত।

অন্নকূটের দিন রাণা নানা রকম আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে। চৌগাঁতে ঘোড়দৌড়, গজযুদ্ধ এবং অগ্নিক্রীড়ার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অন্নকূট উৎসব শেষ হত।

মকর সংক্রান্তি—কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই উৎসব হয়। সর্দার

এবং সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে রাণা চৌগায় গিয়ে ঘোড়দৌড় ও গোলক ক্রীড়া করে থাকে।

মিত্র সপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এই উৎসব হয়। এতে কোনরকম আড়ম্বর করা হয় না। যেন নিয়ম রক্ষার জন্যেই এখনও টিকে আছে এই উৎসব। এই দিনে সূর্যদেব অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই মিত্র সপ্তমী ছাড়া অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসে আর কোন উৎসব নেই।